কবিতার মাসিক পত্র

সম্পাদক সুশীল রায়

বর্ষ ১ সংখ্যা ১ বৈশাখ ১৩৬৭

"প্রকাশন-বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

মধুর অবকাশ...
চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত সম্মেলন, নৃত্য বা শিল্প
প্রদর্শনী—এসবই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের
অবকাশ মুহূর্তগুলিকে আনন্দে ভরে
তোলে। অতীতের ভাস্করদের অমর কীর্তি কোনারকের
'সুরসুন্দরীদের' অপরূপ পাথরের মূর্তিগুলো
এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক। এরকম আরও
অনেক মহৎ কীর্তি ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে।
অতীতের যে সৌন্দর্যধারায় আজকের ভারতীয় শিল্প
সঞ্জীবিত; তারই নিদর্শন স্বরূপ এইসব
মহৎ কীর্তি দেখে আসুন—আপনার অবকাশ মুহূর্তগুলো
মধুর হয়ে উঠবে।
দক্ষিণ
পূর্ব
রেলওয়ে

বৈশাখ-চৈত্র

১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

১৮৮২-৮৩ শকাব্দ   সম্পাদক : সুশীল রায়

ধ্রুপদী

কবিতার

মাসিকপত্র

ব র্ষ সূ চী

অধীর সরকার
- দ্বিধা ১৩৩
- অশ্রু ২৯৪

অনিরুদ্ধ কর
- ইচ্ছামতী ২৩৭

অনিরুদ্ধ চৌধুরী
- আকাশের আর্তি ২৭০

অবিনাশ রায়
- স্বগত ১৭৬

অমর ষড়ঙ্গী
- এক আকাশ তারা ১৩৪

অমলেন্দু ঘোষ
- ত্রয়ী ১৮০

অমলেশ ভট্টাচার্য
- আর-এক পটভূমি ৪২
- তিমিরান্তক ২৬১

অম্বুজ বসু
- জীবনানন্দের কবিতায় বিকাশের ধারা ২০৭
- আধুনিক কবিতার সপক্ষে ৩৮৫

অরবিন্দ গুহ
- সায়ন্তন ৭৪

অরুণ ভট্টাচার্য
- একটি সংলাপ ৭৬

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
- বধূটি স্বগত ৭
- অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা ৫৫
- হাওয়ার ভিতর ১৬৫
- মধুসূদন ও আধুনিক মন ৩২৫

অসীম সোম
- কুতুবমিনারে কিছুক্ষণ ১৩৮
- পাদপ্রদীপ ২৮৮

আনন্দ বাগচী
- পলাতক ১০
- স্মৃতি ১৬৬
- অমৃতনায়ক ৩৬২

আলোক সরকার
- মেঘের উজ্জ্বল ১০

আলোচনা ৩৭৮

আশিস সান্যাল
- প্রেম ২২৭
- অনুভবের এক ঋতু ৩৯৮

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য
- এসো তবে ২৪০

কণাদ গুপ্ত
- নির্মল সন্ধ্যায় ১৩৫

কমলেশ চক্রবর্তী
- সাঁ জ´ প্যার্স-এর কবিতা অনুবাদ ২৫১
- শোণপাংশু ৩৬৬

কানাই সামন্ত
- জমিদারি ১৫৬

কুমুদ ভট্টাচার্য
- আত্মানুসন্ধান ২৯৭
- কণ্টকের প্রেমী ৪০২

কৃতী সোম
- দ্বৈতরূপ ১৭৭

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ি
- জীবনতপস্যা ১৩৬

গুরুদাস ভট্টাচার্য
- আধুনিক কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব ১২১

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
- সমুদ্রনায়ক ৪০৩

গোপাল ভৌমিক
- দুই মেয়ে ১৫৭
- রাবণ ৩৫১

গোবিন্দ গোস্বামী
পরকীয়া ২৩৬

গোবিন্দ চক্রবর্তী
দিতে পাবে ১৫৮

গোবিন্দ ভট্টাচার্য
প্রথম প্রহর ২৬৫

গোরা
আর-এক আকাশ ২৬৪

গোরাচাঁদ নন্দী
চালশে ২৩২

গৌরী চৌধুরী
চতুরঙ্গ ২৬৭

গৌরীশঙ্কর দে
দুটি কবিতা ১২৮

চিত্ততোষ বাগচী
এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ১৪১

জগন্নাথ চক্রবর্তী
রহস্যময়ী ১৫৯
সাঁ জ পার্স-এর কবিতা অনুবাদ ২৪৯

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রেরণা ১৩৭

তরুণ ঘোষাল
লিপিমালা ৩০০

তরুণ সান্যাল
প্রতিবিম্ব ৩৬৩

তুষার চট্টোপাধ্যায়
দূরের চিঠি ১৭৮

দিব্যেন্দু পালিত
কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে ১১১

দিলীপ রায়
কেন ১০৩
নদী ২২১
ক্ষমা ৩৬৪

দুর্গাদাস সরকার
তুমি না ফোটালে ১০৭
আলাইকেমের কবিতা অনুবাদ ১৯৯
পরিক্রমা ২৫৩

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থপরিচয় ১১৫, ২৪১
কয়েকটি সুপরিচিত কবিতা ১৯২
এলিজাবেথান সনেট অনুবাদ ১৯৩
সাঁ জ পার্স-এর কবিতা অনুবাদ ২৫১
চতুর্দশপদী কবিতাবলীর নেপথ্যে ৩০৯
ওই রাস্তা ধরে কেউ হেঁটে যেত ৩৯১

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মেঘদূত অনুবাদ : পূর্বমেঘ ৬১
মেঘদূত অনুবাদ : উত্তরমেঘ ৯১

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
আধুনিক কবিতার প্রসঙ্গে ১৮৫
আলোচনা ৩০৫

নচিকেতা ভরদ্বাজ
ডিভাইন কমেডি পড়ে দান্তেকে ৭৯
মধুপ্রসঙ্গ :
মাইকেল-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ৩৩০

নন্দদুলাল সরকার
উৎসমুখ ৩৯৬

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
উমা ১৭৪

ন. ব.
কার্ল-স্যাণ্ডবার্গ ৪৬

নমিতা সরকার
আশ্চর্য ১৭

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্যাণ্ডবার্গের কবিতার অনুবাদ ৪৭

নিখিলকুমার নন্দী
অবিস্মরণ ১৪
শিরনাল ৪০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
অন্য-কিছুর অভাবে ৬
অন্ধকার নয় ১৬১
সাঁ জ পার্স-এর কবিতা অনুবাদ ২৫০
চতুর্দশপদী ৩৪৯

পবিত্র মুখোপাধ্যায়
কে তোকে ১৩০

পরিচয় গুপ্ত
সোনা-পাগল ৩৭৬

পিনাকীনন্দন চৌধুরী
স উবাচ ৪০০

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী
আদিজনকৃতি : সাঁওতালি কবিতা ২০০
দুটি ২৯৩

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এ-মল্লার ২৬৯

পৃথ্বীশ ভাদুড়ি
সেই মেয়েটা ১৫

পৃথ্বীশ সরকার
জানলা ২৩৯

প্রতুল চৌধুরী
গ্রন্থপরিচয় ৪১১

প্রফুল্লকুমার দত্ত
অভিনয়ান্তে ২৩৫

প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত
কেন কবিতা ২২

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় ভুবন ৯
ব্যা.বট ব্রাউনিঙের অনুবাদ ১৪১
যেমন ফ্রাঁসোয়া ভিয় ১৬৩
সাঁ জ্যঁ প্যার্স-এর কবিতা অনুবাদ ২৫১

প্রসেনজিৎ সিংহ
শান্তিনিকেতনের কোনো ঘর ১২৭

প্রেমেন্দ্র মিত্র
চকিত ৫
দিনটা ১৫৪

ফণিভূষণ আচার্য
উপমা ৭৫
গ্রন্থপরিচয় ১৪৬, ৩৭৯
আত্মপ্রতিকৃতি ১৭১
রজনীগন্ধা ২২২
অগ্নিহোত্রী কবি এক ৩৪৯

বংশীধারী দাস
আলোর স্বপ্ন ৩৭০

বটকৃষ্ণ দাস
স্বগত ২৫৬

বন্দনা বসু
তুমিও হারাবে ১৭৯

বসুমিত্র দত্ত
অ্যালবাম ১৯৮

বিনয় হাজরা
রাত্রির বয়স ২৬৩

বিনোদ বেরা
ঘুমন্ত ২৬৯

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বপ্ন শকুন্তল ৩৩

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
কাব্যকথা ২৭৭, ৩৫৫

বিষ্ণু দে
তাইতো তোমাতে চাই ৩১
নৈঃশব্দ্য মধুর এত ১৫৫

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
বাস্তিল ৩৯০

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যখন যেদিকে যাই ৩৭৭

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
নাম ২৩৪

ভবতোষ দত্ত
উপমা মধুসূদনস্য ৬০৮

ভানু চট্টোপাধ্যায়
যে মুহূর্তে ২৬৮

ভুজঙ্গভূষণ অধিকারী
কবিতার নবজন্ম ২১৫

মঞ্জুলিকা দাশ
মুছে যাবে ৩৬৯

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
বিজয়িনী ২৩১

মণিভূষণ ভট্টাচার্য
পরস্পর ২৫৭
সন্ধিপত্র ৩৬৭

মণীন্দ্র রায়
আপন স্বভাবে ১৬২

মধুসূদন-রচিত গ্রন্থাবলী ৩৩৬

মলয়শংকর দাশগুপ্ত
স্বগত ২২৬
আশ্চর্য নীলের শেষে ৩৯৫

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
কোনো বন্ধুকে পত্রোত্তর ৪০১

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
সমাধিলিপি ৩৪৮

মানস রায়চৌধুরী
ওগো কানন ৭৮
ছায়াবাজি ১৭২
সিঁড়ি ৩৭৩

মোহিত চক্রবর্তী
এপিসোড ২২৯

মোহিত চট্টোপাধ্যায়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১০৯
বিগত প্রেমিকের ইচ্ছা ১৭০

রবীন্দ্র অধিকারী
অলৌকিক ২৯৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রঘুবংশ অনুবাদ ১
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০৬ক
মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে ৩০৭

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
যন্ত্রণা ২৭১

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
কালবৈশাখী ১৩২

লীলাময় বসু
আপেল ১৮
পরিচয় ১৭৫
এবার বিদায় ২৯৯

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
টবের ফুল ১৩১
স্পর্শ ৩৯২

শান্তি লাহিড়ী
হাসখেশের আয়না ২৩৩

শিপ্রা ঘোষ
অভিজ্ঞান ৩৯৩

শিবশম্ভু পাল
জ্যোৎস্না রাতে অন্ধকার ১২৯
সামান্য ভূমিকা ২২৮
রসাভাস ৩৭১

শোভন সোম
দ্বিজ ২৬৬
ছবি ৩৭২

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কেমন লাগল ৫০

শংকর চট্টোপাধ্যায়
সর্বজনীন ১০৮

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
শেষ বসন্ত ৪৫
নতুন খসড়া ২৯১

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়
মনেতে মেঘের শব্দ ৩৯৭

সতীন্দ্র ভৌমিক
কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৫

সন্তোষ দাস
তুচ্ছ ১৪০

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
এক লক্ষ্যে ১১
নতুন কাব্যগ্রন্থ ২৫
সমাচ্ছন্ন ১০৬
সীমান্ত ১৬৮
সাঁ জঁ পার্স-এর কবিতা অনুবাদ ২৫০
মেঘনাদ ৩৫১

সম্পাদকের কথা ২৯, ৫৯, ৮৯, ১১৯, ১৪৯, ২৪৪, ২৭৬, ৩৫৩, ৩৮৩, ৪১৩

সমীর সেনগুপ্ত
আজও সময় ২৯৫

সরোজ আচার্য
কবিতার অপমৃত্যু ১৫১

সলিল মিত্র
গাড়ি চলে ২৬২

সাগরময় ঘোষ
৬ নম্বর বাড়ী : কীর্তিগৃহ ৩৪

সিদ্ধার্থ সেন
সাঁ জঁ প্যার্স ২৪৫
গ্রন্থপরিচয় ৪০৯

সুকোমল বসু
হঠাৎ কুয়াশা নামে ১৩৭
সুদেষ্ণা সরকার
ফাঁক নেই ২৮৩
সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপ ও স্বরূপ ৮২
এক মার্কিন মহিলা কবি ৩০১
সুনীলকুমার নন্দী
রূপোলি জল ১৩
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
মৃত বাসনা ৮
নিখিলেশ সেনের গল্প ৩৫
গ্রন্থপরিচয় ১১৪
প্রেমের কবিতা ১৬৭
পূর্বপুরুষ ৩৩৭
সুনীল বসু
নিদ্রিতার চিত্র ১২
চেসম্যান : দ্বিতীয় অনুভূতি ৪৪
শীত ১২৬
চিত্রিত যামিনী ১৭৩
চৈত্রের প্রার্থনা ৪১৬
সুশান্ত বসু
অরুণিমা ২৯০
কবি ৩৯৪
সুশীল রায়
দম্পতি ২০
সবুজ পাখি ১৮১
শ্রীমধুসূদন ৩৫২
খ্যাতি ৪০৭
স্বদেশরঞ্জন দত্ত
আর-এক নির্ভীক ৮১
শৈশব ৩৬৫
স্বভাব কবি ২৭২
হরনাথ পাল
মধুসূদনের হরপার্বতী ৩১৭
হরপ্রসাদ মিত্র
বক্তব্য ১০১
হরেন ঘোষ
শোলেম আলাইকেম ১৯৭
হেনা হালদার
কে বলে ২৮৯
শুধু পটে লিখা ৪০৫

চিত্র

আলোকচিত্র
অক্ষয়কুমার বড়াল ২১
দান্তের জন্মোৎসবে মধুসূদন
প্রেরিত কবিতার প্রতিলিপি ৩৪৯
মধুসূদনের সমাধিলিপি ৩৪৮
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০৬ক
রবীন্দ্রনাথসহ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬১
দুর্গাপট : বাঁকুড়া ১৫১
মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
যক্ষপত্নী : রঙিন ৯১
রবি বর্মা
অজবিলাপ ১
রামকিঙ্কর বেইজ
সাঁওতাল দম্পতি ২০০

অজবিলাপ

রবি বর্মা অঙ্কিত তৈলচিত্রের প্রতিলিপি থেকে

অনুবাদ

কালিদাসের রঘুবংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম সর্গ

বাক্য আর অর্থ সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে
বাগর্থসিদ্ধির তরে বন্দনা করিনু নতশিরে। ১

কোথা সূর্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন,
ভেলায় দুস্তর সিন্ধু তরিবারে বৃথা আকিঞ্চন। ২

বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ডালে,
মন্দ কবিযশ চায়— সেই দশা তাহারো কপালে। ৩

কিম্বা পূর্ব পূর্ব কবি রচি গেলা যেথা বাক্যদ্বার
বজ্রবিদ্ধ মণি-মধ্যে সূত্রসম প্রবেশ আমার। ৪

আজন্ম যাহারা শুদ্ধ, কর্ম যারা নিয়ে যান ফলে,
সসাগরা রাজ্যেশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে। ৫

যথাবিধি-হোমযাগ, যথাকামঅতিথি-অর্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত। ৬

দান-হেতু ধনার্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ-আশে দিগ্বিজয়, পুত্র-লাগি কলত্রবরণ। ৭

শৈশবে বিদ্যার চর্চা, যৌবনে বিষয়-অভিলাষ,
বার্ধক্যে মুনির ব্রত, যোগবলে অন্তে দেহ-নাশ। ৮

এ হেন বংশের কীর্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চঞ্চল। ৯

পণ্ডিতে শুনিবে কথা ভালমন্দ-বিচারে নিপুণ,
সোনা খাঁটি কিম্বা ঝুঁটা সে-পরীক্ষা করিবে আগুন। ১০

অষ্টম সর্গ

অজবিলাপ

আকাশবিহারী নারদেব বীণাযন্ত্র থেকে বিচ্যুত
দিব্যমালিকার আঘাতে পত্নী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে
রঘু-তনয় অজের বিলাপ

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর
ভুলেও কখনো কর নাই অনাদর,
তবু কেন আজ কোনো অপরাধ বিনা
মোর প্রতি তুমি রয়েছ বাক্যহীনা। ৪৮

মনেও জানিনি তব অপ্রিয় কভু,
মোরে ফেলে কেন চলে গেলে তুমি তবু!
পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,
তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি। ৫২

কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে
মন্দ পবন কাঁপায় যখন এসে,
হে সুতনু, তব প্রাণ ফিরে এল ব'লে
থেকে থেকে মোর দুরাশায় হিয়া দোলে। ৫৩

হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা
জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা!
রজনী আসিলে হিমাচল-গুহাতলে
আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জ্বলে। ৫৪

ও মুখে অলক দোলে যে মারুতভরে,
তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে;
যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে
অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে। ৫৫

শর্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে,
চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদ পরে,
বিরহ তাহারা মিলনের আশে সহে,
চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে। ৫৬

শয়ন রচিত হত পল্লবে নব
তবু দুখ পেত কোমল অঙ্গ তব।
আজ সেই তনু চিতা-আরোহণ, আহা,
কেমনে সহিবে, কেমনে সহিব তাহা। ৫৭

এ মেখলা তব প্রথমা রহঃসখী
গতিহারা দেহে নিক্কণ হারালো কি।
মনে হয যেন সেও বুঝি তব শোকে
তোমারি সঙ্গে গিয়েছে মৃত্যুলোকে। ৫৮

সমদুখসুখ তব সঙ্গিনীজন,
প্রতিপদ-চাঁদ তব আত্মজধন,
তব রস মোর জীবনে করেছি সার,
নিঠুর, তবুও এ কি তব ব্যবহার! ৬৫

ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
আভরণে মোর প্রয়োজন হল গত,
শয়ন শূন্য চিরদিবসের মত। ৬৬

গৃহিণী সচিব রহস্যসখী মম,
ললিতকলায ছিলে যে শিষ্যাসম,
করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিযে
বল গো আমার কি না সে হরিল, প্রিয়ে। ৬৭

বৈশাখ ১৩৬৭

তোমা বিনা অজ রাজসম্পদধনে
সুখ বলি' আজ গণ্য না করে মনে।
কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে,
আমার যা-কিছু তোমারে জড়ায়ে আছে। ৬৮

অষ্টম সর্গের ৫২ থেকে ৫৬ ও ৬৫ থেকে ৬৮ সংখ্যক শ্লোকের এই অনুবাদ বঙ্গদর্শন ১৩১২ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত নবরত্নমালা (১৩১৪) গ্রন্থে প্রথম সর্গের ১ থেকে ১০ সংখ্যক শ্লোক সহ মুদ্রিত; অন্যান্য শ্লোকের অনুবাদ বৈজয়ন্তী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বেদ উপনিষৎ ধম্মপদ কালিদাস জয়দেব তুকারাম ইত্যাদি থেকে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের পরিমাণ সামান্য নয়। সমস্ত একত্র করে বিশ্বভারতী একটি গ্রন্থ প্রকাশ করছেন, নাম রূ পা ন্ত র।

বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে এখানে মুদ্রিত রঘুবংশের অনুবাদ উক্ত গ্রন্থের অংশ।

চকিত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যেথা করি দৃক্‌পাত
উদ্ধত ইস্পাত
মনে হয় ভেঙে দেয় প্রকৃতির ছন্দ,
নদী-বন-পাহাড়ের মাধুরীর সাথে যেন
জ্যামিতিক প্রলাপের দ্বন্দ্ব।

জানে না অবোধ কবি ভ্রান্ত
বিবাদী যা তারই মিল ধেয়ায় যুগান্ত

চাই না কিছুই বলি না তাও
বলি না সকলি দাও।
সেই মন সাধি বাসায় থেকেও
পাখির মত উধাও।
টানা-পোড়েনের মজার নকশা
খেই খুঁজে খুঁজে সারা ;
যে যত ডরায় ততই জড়ায়
নিজেই নিজের কারা।

—

হৃদয়ে অঙ্গার নিয়ে
রুক্ষ মাটি হবে ভাবে একান্ত বাস্তব,
পলাশের লাস্যে তবু
অতর্কিতে বার বার মানে পরাভব।

বৈশাখ ১৩৬৭

অন্যকিছুর অভাবে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আর কিছু নয়,
সুন্দর একটি সূর্যাস্ত তোমাকে দেখাতে পারতাম।
তুমি দেখলে না।

আর কিছু নয়,
অশ্রুমুখী একটি নদীর গান তোমাকে শোনাতে পারতাম।
তুমি শুনলে না।

আর কিছু নয়,
বিষণ্ণ একটি বিস্ময়ের কথা তোমাকে জানাতে পারতাম।
তুমি জানলে না।

কেননা,
সূর্যাস্তে তোমার রুচি নেই,
নদীর দুঃখে তোমার আগ্রহ নেই,
বিস্ময়কে তুমি দূরে রাখতে চাও।

আমিও তাই দূরে সরে আছি।

বধূটি স্বগত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কখন আসবে ঠিক বলতে পারি না,
সাঁঝের আগেই ফিরবে কি না
তাও তো জানি না। যেই মিলাবে রোদ্দুর,
ঘোমটার আড়াল হবে ইব্রাহিমপুর,
ঘোমটা খুলে দেবে তা'র হাত
এইটুকু জানি।
এখন নিজেকে ভাবে বড়ো সাবধানী,
আগের চেয়েও তাই আস্তে আসে পথ দেখে-দেখে,
আখমাড়াইয়ের কল থেকে
ইব্রাহিমপুর অব্দি বড়জোর দুই-তিন ক্রোশ—
আসার পথে সে কেন আমার কলস
পুরুষ হয়েও ভ'রে আনে? জানি, জল ভরতে জানে,
কিন্তু পথে সব জল পড়ে যায় যেখানে-সেখানে!

বৈশাখ ১৩৬৭

মৃত বাসনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আবেগে তোমার মুখ কেঁপে উঠছে, এই দৃশ্য দেখতে সাধ হয়
বড় ঠাণ্ডা হয়ে আছি শীতে কিংবা ঘুমে কিংবা জটিল নেশায়।
তোমাকে উল্লাস দেব একবার, আশ্চর্যের তীব্র নীল আলো
এমন সংগতি নেই, বড় ঠাণ্ডা হয়ে আছি আমি
শীতে কিংবা ঘুমে কিংবা জটিল নেশায়।

যুবকের দৃপ্ত গ্রীবা পৃথিবীতে কোথাও দেখি না
চৈত্রের বৃক্ষের মত কৃশ আকাঙ্ক্ষায়—
বাসনায়, অন্বেষণে, স্বপ্নে, লোভে, শৃঙ্গার-প্রয়াসে
এমন রোগার্ত মূর্তি আর কতদিন দেখে যাব!

তোমারও রক্তের মধ্যে ঈগলের ভীষণ নখের মত ভয়
সর্বক্ষণ আঁকড়ে আছে, তোমারও জীবনে কোনো অকস্মাৎ নেই
'কবে তুমি মাইনে পাবে? এ মাস কি দীর্ঘ, অকরুণ'
—এ কথা যখন বললে ক্লিষ্ট হেসে তুমি
তখনও তোমার ওষ্ঠে চুম্বনের দাগ লেগে ছিল।

দ্বিতীয় ভুবন

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

স্থিরকেন্দ্রে রেখো না আমাকে।

আমাকে জড়াও তুমি তোমার আপন কক্ষপথে—
আহ্নিকগতির পাকে পাকে।
উঠুক উঠুক কেঁপে জড়তার গুরুভার শিলা,
রুপা-গলা স্রোত অন্তঃশীলা
উৎসমুখ খুলে গিয়ে সহসা পড়ুক ঝরে ঝরে
শতধা নির্ঝরে।

যুগল পাষাণ যেন, চিরন্তন সেই কোনারকে
প্রণয়ী মিথুন হয়ে পরস্পর চেয়ে থাকি চোখে।

যে আনন্দ আবর্তিত বিশ্বের নিয়মে
যে আনন্দে নাচে পরমাণু,
সে আনন্দে একবার স্পর্শ করো আমার রক্তকে—
মুক্তি পাক প্রস্তরিত স্থাণু।
মধু ক্ষরে যে-আনন্দে মধুমূলে, ভোরের বায়ুতে,
তেমনি সহজ রঙ্গে তোমাকে চেয়েছি আমি ছুঁতে।

আমাকে বিস্তার দাও তোমার মেরুতে— নীলাকাশে
করো এক মন্ত্রমুগ্ধ তারা,
আলোকস্তম্ভের মত ধ্রুবতারাহীন অন্ধকারে
আমাকে দোলাও ক্লান্তিহারা।

স্থিরকেন্দ্রে রেখো না আমাকে
বুকে রাখো বুকের স্পন্দন ;
সৌরমণ্ডলের তালে বেঁধে দাও, আমার সত্তাকে
করো তুমি দ্বিতীয় ভুবন।

বৈশাখ ১৩৬৭

মেঘের উজ্জ্বল

আলোক সরকার

সে দিন বিকেলবেলা মেঘের উজ্জ্বল যেন তোমার মুখের।
আমি খুব আলো জেলে দেখি
সার্থক বাড়িটা স্পষ্ট উপস্থিতি আকাশ-বৈশাখী স্পষ্ট উপস্থিতি।
সমাপিত বৃষ্টির শীতল সিক্ত পাতার করুণ। সব ভুলবে কি
বড় ঘরটার ফুলদানি চার দেযালের হীরা ?
আমি সমারোহ আঁকি কিশোর শিশির রৌদ্র প্রীতি।

বৃষ্টি, বহুদিন আগে প্রথম আষাঢ়। আজ জোনাকিরা
জ্বলছে নীরক্ত। আমি শিখা ঘন ক'রে রাখি।
হাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদে শব্দ যেন ঝঞ্ঝা বটগাছ
স্থির অনুশীলিত আকাশ স্থির ছায়া অন্যায় একাকী।
লাল রঙ প্রসন্ন জ্যোৎস্নার রঙ প্রিয়ছবি জ্বলে
সার্থক বাড়িটা শুভ্র তোমার মুখের অবকাশ।

নীল হাওয়া সম্পূর্ণ অশত্থগাছ রক্তের প্রখর, তোমার দুহাত
ভোরবেলা জানালা খুলবার পরে আলো।
দু-জনে তুলেছি ফুল, ফুলগুলো রাখো নি আঁচলে ?
এখানে গোলাপ ওই বকুলের পারুল-চাঁপার নম্র রাত
আমি খুব আলো জেলে দেখি
নীরক্ত জোনাকি এক মুহূর্তেই গোলাপ-পারুল-চাঁপা জ্বলে।

এক লক্ষ্যে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শর্তহীন সন্ধি, দেখ, চতুর্দিকে আলেখ্য মরণ ;
কে তুমি বিষাদ, কেন চুরমার ভাঙো সব দুর্গম উৎসাহ !
সাফল্যের সঙ্গী যারা, যারা আলো অর্থহীন জ্বেলে
দূরবীনে দেখে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, নক্ষত্রপ্রবাহ—
কোথায় নির্মিত হবে এক লক্ষ্যে সুস্থ কোনো দুর্লভ তোরণ।

হয়তো তোমার বুকে স্পর্শ নিলে, মনে হবে আয়ু
শিল্পের সুগন্ধ নিয়ে আজো শুদ্ধ শব্দ হতে চায়,
তোমার চোখের কাছে নিসর্গের বৎসল সততা
বসন্ত-শরৎ-গ্রীষ্মে চিত্রকর তোমাকে সাজায়
তবে তুমি গর্বে স্ফীত — তবু, সে কি শব্দের রম্যতা ?
অথচ অমোঘ জানি একশো-দুশো আগামী বছরে
নতুন উপমা এনে অনাগত দীপ্ত কোনো কবি
দেখাবে কালের কণ্ঠে ব্যবহৃত রং, ভাষ্য, ছবি
কি করুণ ঝরে যায় ; এবং অবাক, অবসরে
ভূমিষ্ঠ আরেক ব্যাপ্তি কিংবদন্তী নীলিমার এককে দশকে।

শিল্প তাই শর্তহীন ; চতুর্দিক আলেখ্য মরণে
কে তবু দাম্ভিক তুমি একা চাও আকাশ সাজাতে !
তোমার চোখের কাছে সাবিত্রী-দুঃখের অভিষেক
যত তীব্র হোক তবু জেনে রাখো পারি নি জানাতে,
কোথায় অলক্ষ্য জাগে অনির্বাণ শব্দের দেবতা।

কে কার নির্মাণ ভাবো ; প্রেম, শিল্প, শব্দ— অমরতা ॥

নিদ্রিতার চিত্র

সুনীল বসু

কান্নার পরে ঘুমিয়ে পড়েছে
ঠাণ্ডা শরীর পালঙ্কে রাখা,
গোপনে ত্রস্তে ঘরে ঢুকলাম
শরীরে ঘুমের নীল আংরাখা।
লোভী চোখ দিয়ে শরীর ছুঁলাম
উঁচু-নীচু এক প্রাকৃত ভূগোল—
মৌসুমী হাওয়া ক্রিসেন্থিমাম
পাপড়ি ছিঁড়েছে ছড়িয়ে আঁচল।

মনে এলো উড়ে গোলাপ-বাগান
পদ্মপাতায় রূপের শিশির ;
ঘন ঘুম দিয়ে গড়া উদ্যান
ভিতরে শিথিল রেখাটি নদীর।
মোমবাতিটাও অল্প শিখায়
তাসের মিনারে গল্প বানায়,
নৈঃশব্দ কি ছিঁড়ছে ঝিঁঝিরা
রাত্রি কি তামা অথবা সোনায়।
দর্পণে দেখি শুয়ে আছে এক
প্রাচীন কালের অপ্সরী নারী,
আঙুলে ইচ্ছা আগুন ছড়ায়
সরে গেছে নীল আলোছায়া শাড়ি।
মুহূর্তগুলি থেমে থেমে চলে
জমে আসে যেন রক্ত শিরায়।
আমার মনের গিরিগুহাতলে
কামনারা জ্বলে রত্নে-হীরায়॥

রুপোলি জল

সুনীলকুমার নন্দী

নীলান্ত রাত্রির শীর্ণ-ম্লান জ্যোৎস্নায় মাখা নির্জন শিয়রে
মুঠো মুঠো বৃষ্টি ঝরে—
বৃষ্টির সুরে সুরে মায়াবী সময়
পাথরে বাঁধানো তীর ভেঙে ভেঙে বয়ে চলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কল্লোলিনী হয়।

দিনের বিমর্ষ ক্লান্তি মুছে ফেলে, গান গেয়ে আকাঙ্ক্ষার তরী
পাল তোলে। যোজন যোজন ছাওয়া সবুজ কাশের বন, ধানের মঞ্জরী
আনমনে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হঠাৎ কখন
হয়তো ছুঁতেও পার মমতার মত স্নিগ্ধ দূর পাড়াগাঁর এক স্মৃতি-ভেজা মন—
যে-মন উজ্জ্বল করে, যে-মন পবিত্র করে বিষণ্ণ দুপুর
স্বপ্নের কোরক-গন্ধে। বিমুগ্ধ কলাপী ওই বৃষ্টির নূপুর
সমস্ত রাত্রির কানে অবিরাম একই নাম ঘুরে ঘুরে বলে।
তবু এত আয়োজন
সব বুঝি ব্যর্থ হল। বৃষ্টি শেষ। রাত্রি ভোর। কোথায় সে মন!
ধীরে ধীরে সূর্য জ্বলে। সমুদ্রের রোল ওঠে গলির কোণায়
গ্রাম-ছায়া মন-মায়া ভুলে গিয়ে নদীর রুপোলি রেখা সমুদ্রে মিলায়।
তার পর রূঢ় রৌদ্রে ব্যস্ত কোলাহল।
চোখ ছেপে নামে ওকি?— চুপ চুপ কিছু নয়, দুই ফোঁটা জল!

অবিস্মরণ

নিখিলকুমার নন্দী

উপেক্ষা করেছি আমি ? মিছে অনুযোগ, সখি, মিছে
বন্ধুতার অভিমানে থাকতে চেয়েছি শুধু নীচে।
স্বাভাবিক স্বাধিকারে অনিচ্ছুক অপ্রমত্ত কেন
ভুলে যেতে চাই আজ। নীলতারা অন্ধকারে যেন
চিরকাল জ্বলে যায়, সূর্যালোকে তার মৃদু কাঁপা
অর্থহীন। অনাদ্যন্ত আকর্ষণ কথা দিয়ে মাপা
কখনো কি যায় ? তাই তাকে আর এনো না বাহিরে
দুহাতে হৃদয় চেপে যে চলেছে ভিতরের তীরে।
মূল্যবোধে স্থিত মন অনায়াসে নির্মম কঠিন
প্রতিভাত তথ্যগুলি সত্য নয়, উপলব্ধিহীন
নয় সে বলেই তার বন্দনাবিলাসে অভিরুচি
যতক্ষণ ছিল সে যে তিলে তিলে হয়েছে অশুচি
তুচ্ছতম অদর্শনে বুঝেছে ভোলার তলে তলে
অশ্রুজলের খেলা ছিল তাই যাই নি বিফলে।

সেই মেয়েটা

পৃথ্বীশ ভাদুড়ি

মেয়েটার চাওয়া দেখে আমার আশ্চর্য লেগেছিল।
চোখের তারাও শান্ত, মুখে নেই একটি কথাও।
মেয়েটার চাওয়া দেখে আমি চাওয়া শিখব ভাবতাম।

গায়ে ছোট ফ্রক, তার বোতামের ঘরগুলো ছেঁড়া,
হাতে ছোট বাটি।
দরজায় দাঁড়াত, কিছু বলত না, বুঝতাম তবুও
কি তার প্রার্থনা। তার প্রার্থনা পূরণ মাঝে মাঝে
হয়তো হয়েছে, মনে নেই।

সেই মেয়ে আজ ছেঁড়া ধুতি প'রে আসে—
বয়স গিয়েছে বদ্‌লে। কিন্তু তার প্রার্থনা এখনো
আগেরই মতন। এসে দাঁড়ায় দরজায় চুপ করে!

বয়স গিয়েছে বদ্‌লে, হায় হায়, বয়স বদলায়!

মেয়েটা হঠাৎ আসে, সঙ্গে আসে আরো দুটি মেয়ে।—
'এরা, বাবু, বোন আমার।'

ওরা তিনজন আসে, ওরা তিনজন যায়
রোদ-জল করে না কেয়ার।
তিনটি রোদের ছায়া পিছন-পিছন হেঁটে চলে।

আরো বড় হবে ও যে! আমারই ভীষণ ভয় করে
পিছন-পিছন তবে আরো ছায়া হাঁটবে হয়তো।
লজ্জা কাকে বলে, লজ্জা পেতে হয় কেন, তা এখনো
শিখতে পারেনি— আছে নির্বিকার। অথচ এমন
নিরাসক্ত মানুষের সংখ্যা সামান্য যে।

নিজেকে যে বাঁচাবার পুরোশক্তি এখনো পেল না,
সে পেয়ে গিয়েছে পোষ্য।
'এরা, বাবু, বোন আমার।'

আমার পায়ের সঙ্গে হেঁটে চলে ছায়া গুটিগুটি।
ফিরে চাই, দেখি ছায়া সংখ্যায় অনেক।
কানের ভিতরে বাজে ওই শব্দ 'বোন আমার, বাবু।'

হায় হায়, বয়স বদলায়।

আশ্চর্য

নমিতা সরকার

এমন আশ্চর্য শান্তি এবং সান্ত্বনা—
সে তো জানত না।
আমারই কি জানা ছিল, আমি কি জানতাম?
এই দু হাতের মধ্যে আছে তার আত্মার আরাম।

হঠাৎ সেদিন তার চোখে দেখে সূর্যের আগুন
আমার জীবন ভ'রে দেখা দিল বসন্তফাল্গুন।
কুঁড়িতে সুগন্ধ এল, পাপড়িতে রং,
শিরায় শিকড়ে এল কী অণুরণন!

যে-আমি ছিলাম একা নিজেকে না চিনে—
সে-আমি চিনলাম কেন নিজেকে, জানিনে।
না-চেনাই ছিল ভালো বুঝি
চেনার আকাঙ্ক্ষা ছিল জীবনের অফুরন্ত পুঁজি।

আজ খুঁজে পেয়েছি আমাকে—
হয়েছি সান্ত্বনা শান্তি; অজস্র বিপাকে
হয়তো সহায়ও; কিন্তু তার পরিণাম?
অচেনা আমাকে যদি আবার পেতাম!

আপেল

লীলাময় বসু

অলস স্তব্ধ দুপুর, আলোয় জলজলে
সময়ের ঢালুপথে চলে গড়িয়ে গড়িয়ে
গলিত মুহূর্ত বিলোল আবেশে,
জানলায় বারান্দায় আলোর ফেনিল জোয়ার।
আতপ্ত আবহাওয়ায় স্বপ্নের আনাগোনা বন্ধ,
পিয়ানোর ভেসে-আসা গীতিহীন হাহাকার
শুনি আমার নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে,
পাশে পড়ে থাকে বিস্বাদ রুশোপন্যাস।

অদূরে টিপয়ে ডিশের উপর লাল আপেল একটি
কত-না রোদের কিরণে হয়েছে রক্তিম,
লাল আবরণে ঢেকে ফেলা নয় নিজেকে
এই লাল-হয়ে-ওঠার পিছনে জমা কত ইতিহাস,
সেখানে সাক্ষ্য দেয় সূর্যের রাঙা সোহাগ
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এ আমার মনের আবিষ্কার।

শুভ মুহূর্তে নেমে এল আমার দৃষ্টিপথে
চোখের রঞ্জনরশ্মিতে হল প্রতিফলিত
তোমার শরীরের সবুজ হিজিবিজি যত।
চোখের আলোর তরলতায়
ছায়া পড়ল যৌবনসম্পূর্ণা এক নারীর,
অন্যের রচিত লাবণ্য গায়ে জড়িয়ে
নিজেকে ঢেকে রাখার বিপুল প্রচেষ্টায়।

তোমার এই যৌবন গড়ে ওঠার পথে
নিরিবিলি আমার দৃষ্টির আছে সহায়তা।

গাছের ফুলে-ফুলে ফেটে পড়ার মতন •
যৌবনের আত্ম-প্রসারণ এ নয় তোমার।
এর কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ না থাক্
আঁধার দৃষ্টির আছে উষ্ণতার ঐশ্বর্য বিকিরণ
ইন্দ্রিয়মুগ্ধ আমার মন কল্পনা করেছে
তোমার এ রম্যমূর্তি আমারি রচনা।

দাম্পত্য

সুশীল রায়

চঞ্চল চড়ুই ঘরে সারাদিন অফুরন্ত ওড়ে—
একটার গলা কালো, অন্যটার চিত্রিত ধূসরে।
ওড়ার বিরাম নেই : নেই ক্লান্তি যেন ও-ডানায
পৃথিবীর অধিবাসী যেন শুধু ওরা দু-জনায—
ওড়ার ধরণ আর আচরণ দেখে মনে হয।
পাখায রেখেছে বেঁধে পৃথিবীর সমস্ত সময।
চঞ্চল চড়ুই ঘরে সারাদিন অফুরন্ত ওড়ে—
একটার গলা কালো, অন্যটার চিত্রিত ধূসরে।

ধূসর কালোর সঙ্গে কথা বলে বিচিত্র ভাষায,
অকস্মাৎ চলে যায ঘুলঘুলিতে—ওদের বাসায।

মঞ্জুলা বলল, "শোনো, ওরা বেশ নিশ্চিন্ত দম্পতি
কেমন আনন্দে আছে।"
বললাম, "হয়তো সম্প্রতি
হয়েছে বিবাহ।"
শুনে হাসল না, মুখ করে ভার
বলল, "বুঝেছি মনে কী যে গ্লানি জমেছে তোমার।"
চঞ্চল চড়ুই ওড়ে, ক্লান্তি নেই, ওড়ে অবিশ্রাম,
কে জানে পাখায় মেখে রেখেছে কিসের পরিণাম।

অকস্মাৎ এ কী হল ? *ঠোঁটে-ঠোঁটে কেন ঠোকাঠুকি ?*
মঞ্জুলা অনড়, তার কানের কিনার দিয়ে উঁকি
দিই, বলি, "ছিল ভাব, হায হায়, চটেছে প্রণয়।"
মঞ্জুলা তাকাল ফিরে, চোখে ওটা ভয়, না, বিস্ময় ?

স্টেজের স্বগত উক্তি যেমন, তেমনি গলা ছেড়ে
বলে উঠি— যেন কেউ শুনছে না— বলি মাথা নেড়ে,
"দরকার মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি— স্ফুলিঙ্গ, আগুন!"
মঞ্জুলা তাকায় তেতে, অকস্মাৎ হেসে হল খুন।

কেন কবিতা

প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত

আলংকারিকেরা কাব্যের কি অর্থ করেছেন সে-বিষয়ে আমরা বর্তমানে আলোচনা করছি নে। আমাদের প্রথম জিজ্ঞাসাই এই যে, মানুষে কবিতা লেখে কেন ; এভাবে সময়ের অপচয়ের মানে কি।

যাঁরা কবিতা-রচনার কাজকে অকাজ বলে মনে করেন, আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত। আমরাও অনেক সময় ভেবে দেখেছি এভাবে সময় হত্যা করার কোনো মানে হয় না। আকাশে রামধনু দেখা দিলেই সেই সাত রঙের বিচিত্র লীলা দেখে মুগ্ধ হতে হবে কেন। ধরা গেল, মানুষের মনের উপর যখন কারো হাত নেই তখন মন নাহয় মুগ্ধ হল, তাকে বাধা দেওয়া গেল না। কিন্তু মনের সেই অসংগত ভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে আবার হাত চালানো কেন ; কেন কতকগুলো কথা পাশাপাশি বসিয়ে ঐ সপ্তবর্ণা অলীক ছায়াটাকে নিয়ে মায়াখেলা। মানুষের হাতের উপর মানুষের হাত যখন আছে, তখন ঐ হাতকে দিয়ে অন্য কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। যে কাজ করলে সমাজের ও সংসারের প্রত্যক্ষ মঙ্গলসাধন হতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের এই মত গ্রাহ্য না করে যুগের পর যুগ ধরে কবিরা কবিতা রচনা করে চলেছেন। ঠিক কবে কবিতার জন্ম তার সঠিক তারিখ বলা যাচ্ছেনা। নানা গবেষক নানাপ্রকার তারিখের কথা বলেছেন। ভারতবর্ষে এই কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে নাকি বৈদিক যুগে, ঋগ্বেদ নাকি ভারতবর্ষের আদি কাব্য ; আর, ও-দেশের আদি কাব্য হোমরের ইলিয়ড। তার পরে কতকাল কেটে গিয়েছে, কত উত্থানপতন ঘটেছে এই পৃথিবীতে, কত ট্রয় ধ্বংস হয়েছে, কত মহেঞ্জোদড়ো ভূগর্ভে লীন হয়েছে, কত রাজা গিয়েছে, কত রাজ্যও গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথাই বলতে হবে যে, এত উলটপালট এত বিপর্যয় ও উপদ্রবের মধ্যে দিয়ে মানুষকে যাত্রা করে চলতে হয়েছে, কিন্তু তবুও তার ঐ কাব্যরচনার ঝোঁকটা কিছুতে ধ্বংস হল না। তাই এখনো কবিরা কবিতা রচনা করেন, এবং এখনো তাঁরা আদি কাব্যের প্রতি কান পেতেও থাকেন—

> মৃত্যু দিয়ে জন্ম কিনে দেহটারে দিয়ে যাব বেচি,
> আমাকে বিলুপ্ত ক'রে রেখে যাব মোর পরিচয়—

হোমার, তোমার গান কান পেতে নিত্য শুনিতেছি,

ধ্বংস লভিয়াছে সত্য, চক্ষে তবু ভাসিতেছে ট্রয়।

কবিদের এই কথা শুনে বোঝা যায় যে তাঁরা একটা দল বেঁধেছেন। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের কাজের তারিফ ক'রে ও কথার প্রশংসা ক'রে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বেশ তৎপর।

তা না হলে, কবে ট্রয় ধ্বংস হল, কবে পেনিলোপির সজল চক্ষে দেখা দিল দুটো মুক্তো— সে কথা জেনেই বা লাভ কি, সে ঘটনা স্মরণ করে বেদনার্ত হয়ে শোকের বিলাসেই-বা দরকার কি। এ'কে তো বেদনার ব্যভিচার বলাই সংগত।

যাঁরা এসব পছন্দ করেন না, আমরা তাঁদের দলে। বাক্য জিনিসটা বাক্যই থাক্-না, তার উপর নানাবিধ কারিকুরি করে তাকে কাব্য করে দরকার কি।

আমরা এ কথা শুনেছি যে, বাক্যের মধ্যে যদি একটা বাড়তি জিনিস— যাকে নাকি বলে ধ্বনি, তা— আরোপ করতে পারলেই বাক্য নাকি কাব্য হয়। পৃথিবীতে বিস্তর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আছে, সেই কোলাহলের মধ্যে নতুন একটা ধ্বনি আমদানি করে কলরবের মাত্রা বাড়িয়ে লাভটা কি। লাভের মধ্যে তো এই যে, গণ্ডগোল আরো একটু বাড়ল। এইজন্যে এ ব্যাপারটা আমাদেরও বড় বাড়াবাড়ি ঠেকে।

কিন্তু যাঁরা কবিতারচনা করেন, কাব্যচর্চা করেন, কিংবা কাব্যোপভোগ করেন তাঁরা কিন্তু কবিতার গুণব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ। নিজেদের এই অকাজে রত রেখে সময়ের অপচয় করাটা অপরাধ বলে জেনেছেন বলেই তাঁরা এর গুণকীর্তন করে নিজেদের মুখরক্ষা করতে চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা কিন্তু বড় গুরুতর।

তাঁরা বলেন, বাক্য বাক্যই। তাকে কাব্য করতে পারা নাকি সহজ না। ও-কাজ করতে হলে সৃষ্টি করার শক্তি নাকি চাই। হায় জগদীশ্বর! কবিরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা বলে আখ্যাত ক'রে জগদীশ্বরের সগোত্র বলে নিজেদের ঘোষণা করছেন। মাত্রাটা কতদূর গিয়েছে ভাবলে মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাঁরা বলেন, সকলে নাকি পারে না ও কাজ করতে, যে পারে সে নাকি আপনিই পারে। কী পারে? না, ফুল ফোটাতে।

বৈজ্ঞানিকরা জগদীশ্বর নন, এইজন্যে তাঁরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও নাকি মানুষ নামক জীব তৈরি করতে পারবেন না। তাঁদের যদি মানুষ তৈরি করতে বলা হয়, তা হলে তাঁরা হাত পা মাথা শরীর বিশিষ্ট মানুষের আকৃতির একটি বস্তু তৈরি করতে পারেন, কিন্তু তা দেখে যখন বলা হবে—'কই, সবই তো হল ; কিন্তু এ তো বলেও না, চলেও না।' সে কথা শুনে হয়তো যান্ত্রিক উপায়ে সেই বস্তুটিকে চলানোও হল, তাকে দিয়ে বলানোও হল কথা। কিন্তু তবু নাকি সেটা ঠিক মানুষ হল না, কেননা, একটা জিনিসের তবু অভাব রয়ে গেছে। সে জিনিসটির নাম নাকি মন। রক্ত মাংস হাত পা চলা বলা— সব সত্ত্বেও মনের অভাবে ঐ বস্তুটি মানুষ হল না।

কাব্যের বেলাতেও নাকি তাই। বাক্যের মধ্যে রক্ত মাংস হাত পা সবই আছে, নেই নাকি মন। বাক্যে ঐ মন আরোপ করলেই তা হল কাব্য। বাক্যকে পুরোপুরি মানুষ করতে হলে তার মধ্যে নাকি আরোপ করা চাই ঐ জিনিস— মন। যেমন, তাঁরা বলেন, একটা ঘটনার বিবরণ এইভাবে দেওয়া যেতে পারে—

> বেগুন পুড়াইয়া তুমি একি কাণ্ডকারখানা করিলে ?
> সারা ঘরময় ছড়াইয়া দিয়াছে যে !

এটা নেহাতই একটা বাক্য। এ কথা শুনে একে নাকি কাব্য বলা যাবে না। কিন্তু যখনই বলা হবে—

> পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
> বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

অমনি নাকি তা কাব্য হয়ে উঠল। কেন ? ওর মধ্যে নাকি সঞ্চারিত হয়েছে সেই মন, উপস্থিত হয়েছে নাকি ধ্বনি।

কিছু বুঝলাম না। যুক্তির মাথামুণ্ডু পেলাম না। তাই কেবল তাঁদের ধন্যধন্য করলাম! আমাদের এই ধন্য-ধ্বনির মধ্যে তাঁদের কল্পিত সেই ধ্বনি সঞ্চারিত হল কি না জানি নে।

কেবল এইটুকু জানি যে, ওঁদের সঙ্গে পারা যাবে না। শত বাধা শত নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরা কবিতা লিখবেনই। ওটা ওঁদের কাজ নয়— নেশা।

নতুন কাব্যগ্রন্থ

তেপান্তর। শ্রীআনন্দ বাগচী। আর্ট ইউনিয়ন। দুই টাকা

দ্বিতীয় সন্ধি। শ্রীদুর্গাদাস সরকার। এম সি. সরকার। দেড় টাকা

বিষুবরেখা। শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। কবিতামেলা। দুই টাকা

অতীতের ধ্যান নিয়ে বর্তমান ধারণার যে-কোনো বিচারই অসম্পূর্ণ। এবং যেহেতু অদ্যাবধি শিল্প বা সাহিত্যের কোনো যথার্থ সংজ্ঞা অনাবিষ্কৃত, সেহেতু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বপ্রকার পথনির্দেশও এক হিসাবে অর্থহীন। আজ যাঁরা আধুনিক কবিতার প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাসের জোয়ারকে যথেচ্ছাচার বলে অভিহিত করেছেন তাঁদের বক্তব্যের দিকে এক কান পেতে অন্য কান মহাকালের দিকে মেলে রেখে বলতে পারা যায়, এই যৌবনজোয়ারের সঙ্গে প্রাণ-পলিমাটির অবিচ্ছেদ্য সহ-অবস্থানও অবশ্যলক্ষ্য। আজকের কবিতা জটিল ও প্রধানত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, তার কারণ কবিদের স্পর্শপ্রবণ মনের দর্পণে বিশ্বের বহুবিচিত্র সমস্যাবলী প্রতিনিয়ত এসে ছায়া ফেলছে। বাংলাদেশ বিশ্ববহির্ভূত কোনো স্বতন্ত্র গ্রহ নয় ব'লে বাংলা কবিতায়ও তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। কবিরা জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে লিখুন কিংবা প্রেমে উচ্ছ্বসিত হোন— কিছুই যায় আসে না। রচনা কবিতা হচ্ছে কি না, সেটাই প্রধান বিচার্যবিষয় হওয়া উচিত। তা ছাড়া যদি মনে রাখি, যাঁরা কবিতা রচনা করেন তাঁরা সকলেই প্রকৃত অর্থে কবি নন—কেউ কেউ কবি, তাহলে প্রকাশিত প্রত্যেক কবিতাকেই আধুনিক কবিতার নিশ্চিত নিরিখ ধরে গোত্রবিচারে ভুল করবার সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রধান কথাটি অনেকে স্মরণ রাখেন না বলেই আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু অপটু পদ্য পাঠে শেষ হয়। শেষ হয় না শুধু সৎ কবিতার আয়ু, মহৎ প্রেরণার ক্লান্তিহীন শ্রম।

আমরা আনন্দিত যে বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য তিনজন কবি আমাদের নিরাশ করেন নি। বিশেষ করে, আনন্দ বাগচীর 'তেপান্তর' আমাদের খুশি করেছে। বেশ কয়েক বছর আগে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বগতসন্ধ্যা' প্রকাশিত হয় তখন তা অভাবনীয় সমাদর লাভ করেছিল। নিত্য নতুন চিত্রকল্পের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে, শব্দের সংগীত-চেতনায় তিনি এমন-এক সম্মোহন

সৃষ্টি করেছিলেন, অনেক প্রথিতযশা তরুণ কবিও তৎকালে তাঁর প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তাঁর বর্তমান কাব্যগ্রন্থ সে তুলনায় কতখানি গভীর হয়েছে, উপলব্ধির গভীরতায় আলোচ্য কবিতাগুলো প্রেরণাশুদ্ধ কি না—ইত্যাকার জটিল বিচারের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, আনন্দ বাগচী এখনো এমন-একজন কবি যাঁকে পৃথক করে চিনে নিতে পাঠকের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। নিজের কবিতার সীমা স্পষ্ট করে জানেন বলেই তিনি লিখতে পারেন—

আকাশে চৈত্রের চোখ, জানালায় মাধবীলতার
স্নেহ, আর ঘড়ি-কণ্ঠ অদূর গীর্জার মৃত ধ্বনি,
ভাঙা-কবরের গান, মাঝে মাঝে এলোচুল-হাওয়া
ফুলদানী ছুঁয়ে যায় ; ঘনপাতা বইয়ের ভিতর
দুচোখ ডুবিয়ে তুমি সামুদ্রিক ঝিনুকের মত
রামধনুকের ঘুমে অচেতন। —ঝরাপাতার গান

একদা প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি যে দুর্লভ গতিবেগসম্পন্ন কবিতাবলী রচনা করেছিলেন, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থেও তার কিছু কিছু চিহ্ন বর্তমান—

ছায়াভীরু সিঁড়িটার স্তব্ধ বুকে পা ফেলে পা ফেলে
কোথায় পালাবে তুমি অন্ধকারে, বুকের ইজেলে
লুকিয়ে পুরোনো ছবি, বেদনার পরমায়ু, সুর ?
কালের পুতুল তুমি, পায়ে বাঁধা মৃত্যুর নূপুর।

এবং

ভালোবাসা দুঃখময়, তোমার ভেজানো দরজা ঠেলে
কেউ আসবে না, বোকা, কেউ কি নিজের কাজ ফেলে
খেয়ালের কথা রাখে ? শুধু তোর পথে কাঁদে ধূলি,
ঘাসের চপ্পলে লাগে বিকেলের রোদ্দুরের তুলি ! —ভীরু

এ ধরণের আবেগশুদ্ধ কবিতা আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে আরও আছে। কবিতা-নির্বাচনে পূর্ববর্তী গ্রন্থটির তুলনায় এই গ্রন্থটিতেও কিছু অমনোযোগ লক্ষ্য করা গেল। এই অমনোযোগ তাঁর কবিতা-রচনার ক্ষেত্রেও ইদানীং দেখা যাচ্ছে। আর, যে কুশল শব্দব্যবহার একদা তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানে তার ভারসাম্যহীন ব্যবহারে অনেক ভালো ভালো কবিতার আবেদনও রজ্জুবিনীত হয়েছে। যেমন 'পূর্বগামিনী' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

অন্যমনে, বুক বেঁধে সূক্ষ্মতম একটি আলপিন

ফুলের গন্ধের ;

ফুলের গন্ধের সঙ্গে আলপিন-সূক্ষ্মতার এই উপমাকে আমরা কি করে তাঁর সুনামের সঙ্গে মেলাবো! অথবা 'আত্মবিলাপ' কবিতায়—

নিক্ষিপ্ত উল্লাসে জ্বলছে কলহান্তরিতা নিধুবন

এখানে 'নিধুবন' স্পষ্টতই ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরণের ব্যবহার ও বহুব্যবহৃত পদান্ত মিল এই গ্রন্থটিতে কিছু কিছু থেকে গেছে যা তাঁর পক্ষে অনায়াসেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। গ্রন্থের সর্বপেক্ষা দীর্ঘ কবিতাটি 'স্যানিটোরিয়ামের চিঠি' একটি সুন্দর ও সবল রচনা। কিন্তু এখানেও তাঁর নিজস্ব পুরোনো চিত্রকল্প ফিরে এসেছে। এই সম্পর্কে কবি মনোযোগী না হলে একদা যে-বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যচরিত্রের প্রধান সম্পদ ও আকর্ষণ ছিল, তাই তাঁর সর্বপ্রধান দুর্বলতা বলে পরিগণিত হবে। এই দু-একটি বর্জনসাপেক্ষ ত্রুটি বাদ দিলে 'তেপান্তর' যে আমাদের অত্যন্ত তৃপ্তি দিয়েছে তা জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

'দ্বিতীয় সন্ধি'—কবি দুর্গাদাস সরকারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ! দুর্গাদাসবাবু অনেক দিন ধরে কবিতা লিখছেন এবং তাঁর নাম পাঠকমহলে বিশেষ পরিচিত। তাঁর প্রত্যেক লেখার মধ্যেই একটি সহজ সরল স্নিগ্ধ ভাব থাকে যা সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করার পক্ষে বিশিষ্ট গুণ। জীবনের গভীরতর ব্যক্তিগত সমস্যাবলীর মধ্যে চিন্তিত না হয়ে, প্রাত্যহিক জীবনের অতিপরিচিত অভিজ্ঞতাগুলিকেই তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তনের সর্বশেষ ধারা সম্পর্কে তাঁর যতটা আগ্রহ তার অনেক বেশি আকর্ষণ মানুষের সুখদুঃখ ও বেঁচে থাকার দাবির প্রতি। যে ব্যর্থতায় আজকের ক্লান্ত মানুষ তার নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তার একটি সুন্দর ও সার্থক রূপ আমরা পাই 'বোধি' কবিতায়—

প্রগল্‌ভ সংবাদ পাঠে চায়ের দোকানে ঐকতান,
কেউ চায় পথে ভিক্ষা, কেউ চায় সভায় সম্মান।
কারো হাতে রুদ্রাক্ষের মালা,
গোলাপ গন্ধের মোহে খোঁজে কেউ একান্ত নিরালা।
ব্যর্থতায় তবুও তা শুধু পলায়ন,

সনেটের সীমায় ছোটগল্পের বক্তব্য রাখা দুর্গাদাসের আর-একটি প্রিয় অভ্যাস। রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকেই এই চেষ্টা পূর্বে করেছেন। কিন্তু বক্তব্য যতখানি ব্যক্তিগত আবেগে শুদ্ধ ও সংহত হলে এ ধরণের চেষ্টায় সাফল্যলাভ সম্ভব, দ্বিতীয় সন্ধির কবি সব সময় তা দেখাতে পারেন নি। ফলে কোনো কোনো সনেট প্রাণহীন মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে কবি এ বিষয়ে সচেতন হবেন আশা করি।

'বিষুবরেখা'র অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসাধনা বেশি দিনের নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে তাঁর নাম লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আলোচ্য-গ্রন্থটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এ কথা স্মরণ রাখলে তিনি যে আমাদের হতাশ করেন নি এ কথা স্বীকার করতেই হয়। আধুনিকতার সংকেতবাহী সমস্ত কাব্যলক্ষণই তাঁর মধ্যে প্রকট, হয়তো একটু অতিরিক্ত ভাবেই প্রকট। তবু এই গ্রন্থে এমন-কিছু ইঙ্গিত, কবির কিছু লক্ষণ, তুলে ধরতে তিনি পেরেছেন যা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা জাগায়। স্বাভাবিক কারণে পূর্বসূরী অনেক কবিই তাঁর মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন, যে-কোনো সতর্ক পাঠক তা সহজেই আবিষ্কার করতে পারবেন। কিন্তু তিনি অচিরেই নিজস্ব একটি সুরে তাঁর কবিতাকে বাজাতে পারবেন বলে ধারণা।

যে কবি 'নস্টালজিয়া' 'শালবনের সনেট' 'নদীর থেকে পাঁচটি কবিতা' লিখেছেন তাঁর কাছে বিশ্বাস গচ্ছিত না রেখে আমাদের উপায় নেই। সহজ ও সহজিয়া সুরের কবিতাগুলিতেই তাঁর আন্তরিক পরিচয় যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে —

> কে আনে বঞ্চিত মাটি পরিশ্রুত লাল মেঘে মেঘে
> সহজিয়া স্রোত চলে পাথুরে কঠিন অস্থিরতা।
> জীবনে আবেগ জানো, সেও আছে শালবনে জেগে
> মূর্ছিত আলোর লগ্ন। অতঃপর বিকেলের কথা
> বাজায় মাঠের সূর্য, সবুজ ধানের করতাল। —শালবনের সনেট

এ প্রার্থনা তাঁর কবিজীবনে সত্য হোক।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রথমেই জানিয়ে রাখি, এই পত্রিকা প্রকাশ ব্যাপারে আমরা একটি ষড়যন্ত্র করেছি— তিন জন প্রবীণ ও তিন জন নবীন কবিকে নিয়ে সম্পাদনা-সমিতি গঠন করেছি। পত্রিকা-পরিচালনা ও রচনা-নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেবেন এই কমিটি অব সিক্স।

একজনের অভিরুচির উপর নির্ভর না করে আরও পাঁচ জনের রুচির উপর নির্ভর করা শ্রেয় মনে করেছি। বিশেষত এইজন্যে যে, এর দ্বারা বিভিন্ন ধরণের রচনা পরিবেশন করা সহজ হবে। মানুষের মুখের আকৃতি যেমন মানুষে মানুষে ভিন্ন, মানুষের মনের প্রকৃতিও সেই রকম। কবিতা অনেকটা মনের প্রকৃতিরই প্রতিধ্বনি বলে আমাদের ধারণা। সুতরাং কবিতার রূপ ও কল্পও ভিন্ন ভিন্ন কবির কলমে ভিন্ন ভিন্ন হবে। আবার, যাঁরা কবিতা পাঠ করেন তাঁদের মধ্যেও রুচির অনুরূপ ভেদ আছে, তাঁদের কাছে যাতে নানা রূপকল্পের কবিতা পৌঁছে দেওয়া যায় সেইজন্যেও আমাদের এই ষড়যন্ত্র।

এই সমিতিতে আরও বেশি সদস্য নেওয়া যেত, কিন্তু সংখ্যার আধিক্য ঘটিয়ে গাজন নষ্ট করার ইচ্ছে আমাদের নেই। এইজন্যে আমরা মাত্র ছয় জনে একত্র হয়েছি।

এইসঙ্গে একটি চক্রান্তের কথাও বলে নেওয়া ভালো। বর্তমান কালের বিদেশী কবিদের সকলেই আমাদের বর্তমান কালের দেশী কবিদের চেয়ে শ্রেয়, এমন কথা আমরা যে স্বীকার করি নে আমরা তা অকপটে স্বীকার করব। হরফের দ্বারা আমরা অভিভূত হব না, আমরা কাব্যবস্তুর অনুসন্ধান করব। মানুষের চেহারার চাকচিক্যে মুগ্ধ না হয়ে আমরা যেমন তার মনুষ্যত্ব খুঁজি, খুঁজি তার মন, এবং সেই মনের পুঁজি দিয়েই তাকে যাচাই করি, কবিতার ক্ষেত্রেও আমরা সেই নিয়ম মানব, আমরা তার বাহ্যিক চেহারায় আকৃষ্ট না হয়ে খুঁজব তার মন— আলংকারিকেরা যার নাম দিয়েছেন ধ্বনি। হরফটি রোমান হলেই অন্য বিচার বাদ দিয়ে তাকে আমরা প্রণাম করতে পারব না। বঙ্গাক্ষর দেখলেই তেমনি তাকে অনুরূপভাবে অবহেলা করতে অপারগ হব। যে-কোনো একটি বাংলা কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিলেই তৎক্ষণাৎ তা প্রথমশ্রেণীর কবিতা বলে ঠেকে। হোক-না সে অনুবাদ যতই দুর্বল। এটা হরফের জাদুও বটে, এটা আমাদের

মনের দৈন্যও। আমরা এইরূপ হীন দৈন্যকে সম্মান করতে অস্বীকার করব। গড়নের চেয়ে আরো বড় জিনিস হচ্ছে আমাদের চাহিদা। আমরা চাই লাবণ্য। ঝাল-লঙ্কা-তেল-ঘীর ব্যঞ্জনে চাই লবণ। আলুনিতে আমাদের কোনো রুচি নেই।

প্রতি সংখ্যায় মৌলিক রচনার সঙ্গে অনুবাদ রচনা প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের আছে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত কালিদাসের অনুবাদ প্রকাশ করা হল। পরে ক্রমে ক্রমে অবঙ্গীয় ও অভারতীয় কবিদের রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হবে। সেইসঙ্গে বাংলা কবিতার ইংরেজি তর্জমাও মুদ্রিত হবে— আমাদের দেশের কবিতার ভাষার সঙ্গে না হলেও তার গতির ও তার প্রকৃতির এবং তার ধ্বনির সঙ্গে বিদেশীরা যাতে পরিচিত হতে পারেন এইজন্যেই এই পরিকল্পনা।

কবিতার পত্রিকা আছে। কিন্তু মাসিক পত্রিকা হয়তো নেই। আমরা কবিতার মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলাম। বাংলাদেশে কবিতার মাসিক পত্রিকা ক্র প দী প্রথম, এমন কথা বলি নে। বাল্যলীলা আখ্যা না দিয়ে তাকে নবযৌবনলীলা বলা যায়, বছর কয়েক আগে (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) কবিতার মাসিক পত্রিকা বের করেছিলাম— জী বা ণু, বছর-দুই চলেছিল।

সুশীল রায়

তাই তো তোমাতে চাই

বিষ্ণু দে

একটিই ছবি দেখি, রঙের রেখার দুর্নিবার একটি বিস্তার
মুগ্ধ হয়ে দেখি এই কয় দিন, অথচ যামিনীদার
প্রত্যহের আসনের এ শুধু একটি নির্মাণ একটি প্রকাশ,
হাজার হাজার রূপধ্যানের মালার একটি পলক
যেখানে সন্তত গোটা দেশ আর কাল, একখানি আবির্ভাব
স্বয়ম্বশ স্বতন্ত্র স্বাধীন, অথচ রঙের প্রতি ঢেউএ ঢেউএ
দোলা দেয় পঞ্চাশ বছর, নিত্যকর্মী সমগ্র শিল্পীর জাগ্রত জীবন,
শুধু কি শিল্পীর, তাঁর নিজের ঘরের বংশের, দেশের
আধভোলা ভোলা চৈতন্যের রক্তের প্রভাব
সারা পৃথিবীর ছায়া, রৌদ্রে জলে রেখা রঙে
একটি ছবিতে উজ্জীবন প্রায় প্রত্যাভাস
যেমনটি সাগরসঙ্গমে এসে অলকনন্দার উৎস মেতে ওঠে
জটায় জটিল কপিলের দীর্ঘ ইতিহাস
সামুদ্রিক বন্যা হয়ে ভাগীরথী-মোহনায়।

আর কেউ এ বুঝুক না-বুঝুক, তুমি জানো, কারণ তোমায়
দেখি আর মুগ্ধ হই প্রাকৃত রূপের তীব্র আবেদন
সঞ্চারিত শিরায় শিরায়, দেখি তুমি অনন্যাসুন্দরী
অনেক মায়ের ঠাকুমার বহু লক্ষ্মী উর্বশীর জেরে
মানবিক এবং জৈবিক সব প্রেরণার ছবিতে ভাস্কর্যে মূর্ত
পদাবলী ভাটিয়ালী বাউলের তুলসীমঞ্জরী।
তাই তো তোমার রূপে দেহে মুখে প্রতিটি বিভাবে
তুমিও তো স্বদেশ-আত্মার এক প্রাণমূর্তি, শুধু কি স্বদেশ!

বাদীতে অনন্তা তুমি, প্রতিবাদী-বিবাদীতে সাধারণ্যে তুমি ইতিহাস,
সীমায় অসীম, তাই বিশেষ ও নির্বিশেষ একটি মুহূর্তে,
লয়-স্রোতে আন্দোলনে মৃদঙ্গের তালে ঢেউএ চর জাগে পূরবীবিভাস
গোধূলিলগনে এই বিবাহের রঙে
তাই তো তোমাতে চাই
দিনরাত্রি হোক গুঞ্জামালা
অথবা রুদ্রাক্ষে বাঁধা পরম্পরা উভয়ত একক প্রচ্ছন্ন
অথচ সম্পৃক্ত কর্মে, প্রকাশ্যের জনপদে পথেঘাটে নিত্য পূর্তে,
জটায় আবিষ্ট সেই গঙ্গার মতন, চাঁদের আগুনে ঢালা ॥

স্বপ্ন-শকুন্তল

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

শকুন্তলা। সহি অণুসূএ! অদি পিনদ্ধেণ বক্কলেন পিঅংবদাএ নিয়ন্তিদম্হি, সিটিলেহি দাবণং।

প্রিয়ংবদা। এত্থ পওহর বিত্থারইত্তঅং অত্তনো জোব্বণং উবালহ।

মালিনীর তীরে ছবি জাগে
কত শতাব্দী-সীমায় ঐ
প্রিয়ংবদা লো অনুরাগে
বুকের বাকল বাঁধলি কই?
আল্গা একটু রাখিস সই,
হলা প্রিয় সহি, বাজে ব্যথা!
—কণ্ব-কন্যা বলে কথা।

গূঢ়-শ্রোতা কেউ আছে আগে?
স্বপ্নের তরু-আড়ে যে রই,
কে ও যেন চেনা-চেনা লাগে?
কেউ নয়, দুষ্যন্ত বই!
শোনো— অনঙ্গ হাঁকে, মাভৈ!
সহকারে খোঁজে বনলতা।
—কণ্ব-কন্যা বলে কথা।

বন-জোসিনীর প্রেমরাগে
সহকার বলে— ধন্য হই।
মধুকর দেখে ভয় লাগে—
শকুন্তলা সে ভিতু এতই:
'বনরক্ষক নৃপতি কই?'

° মধুমাখা ভীরু অধীরতা,
—কণ্ব-কন্যা বলে কথা।

সেচ কোথা তরু-আলবালে
উষর সে-মাটি দেখি হালে ;
লতা আজো খোঁজে সাথী তরু,
প্রেম ম'রে বুকে হল মরু !
কাল-শঠতার ঘুঁটি-চালে।

এই রচনাটি চসরীয় বালাদে ছন্দোবন্ধানুসারে লিখিত। উক্ত প্রকার বালাদে সাত লাইনের তিনটি স্তবক থাকে এবং প্রত্যেক স্তবকের শেষ লাইনটি রিফ্রেন বা ধুয়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাত্র তিনটি মিলের হেরফেরে এই তিনটি স্তবক রচনা করা হয়ে থাকে। এবং শেষে পাচ লাইনের একটি envoy যোগ করা এবং তার মধ্যে নতুন মিল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর মিলবন্ধ যথাক্রমে— ক খ ক খ খ গ গ, ক খ ক খ খ গ গ, ক খ ক খ খ গ গ, ঘ ঘ ঙ ঙ ঘ।
তুলনীয়: THE COMPLEINT cf Chaucer to his Empty Purse

নিখিলেশ সেনের গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

"কখনও আকাশ দেখে অভিভূত পুরুষের চোখ
অরণ্যের আড়ালে কোনো আত্মসমাহিত
প্রকৃতির প্রেমপ্রার্থী সত্যকার অভিন্ন হৃদয় আমি দেখিনি জীবনে—
আমি কবিতায় শুধু মিথ্যাবাদ মুগ্ধ ভাবে লিখি।
শৈশবের কোনো স্মৃতি নেই, আমি নিশ্চিত কোনোদিন
বিশাল মাঠের মধ্যে গভীর সায়াহ্ন, অন্ধকার,
অথবা চাঁদের রক্ত, দেবদারু বৃক্ষের হিমছায়া
আসক্তিতে স্পর্শ করিনি :
পদ্মার ঢেউএর শব্দ আমার রক্তের মধ্যে বাজে
এ কথা মিথ্যে লিখেছিলাম !
যদিও আশ্চর্য দেখি, খ্যাতিবৃদ্ধ, শ্বেতগুম্ফ, প্রতিটি লেখক
নকল শৈশব-স্মৃতি নেড়েচেড়ে নিত্য খেলা করে !

আমার শৈশব গেছে নিরুত্তাপ, মধুস্পর্শ
পেশাদারী সুন্দরের উজ্জ্বল ছায়ায়।
তবুও আমার বুকে স্মৃতির বিষাক্ত ছবি নেই !
শুধু মনে পড়ে এক নির্জন দুপুরে
উঠোনের দক্ষিণ কোণে, তিনবার চোর সেজে লুকোচুরি খেলায়
খড়ের ভিতর শুয়ে, চতুর্দশী এক বালিকাকে
প্রথম স্পর্শ করি, অসীম রৌদ্রের তাপে পুড়ে
তার স্তনে মুখ রেখে
অসীম রৌদ্রের তাপে পুড়ে
শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে, ওষ্ঠের কমলরসে ওষ্ঠ সিক্ত করে
মালতী, মালতী, বলে কয়েকবার ডেকে
লক্ষ কেয়াফুলের মতন আমি কৈশোরের মূর্তি দেখেছিলাম।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

স্মৃতি, দুঃস্বপ্ন নয়, স্পষ্ট মনে পড়ে
বিশাল মেঘের শব্দ ঠিক একবার
সেই অপরাহ্ণে যেন বেজে উঠেছিল
আকাশের একদিক থেকে অন্যপ্রান্ত চিরে
বিদ্যুতের ছুরি সেই উপলব্ধি লিখে রেখেছিল।

সমুদ্র, প্রান্তর, নদী, অরণ্য, আকাশ—
এরা কি স্বর্গের ছায়া, নিরুক্ত নিসর্গ?
ঝিলম নদীর পারে একবার মুগ্ধ হতে পারব ভেবেছিলাম,
পর্বত-শিখরে রৌদ্র দেখে তৎক্ষণাৎ
বুলেটে আহত এক হরিয়ালের বেঁচে থাকার শেষ ডাক শুনে
অভিভূত হবার ঠিক আগের মুহূর্তে
মালতীর রক্তিম ওষ্ঠ, শুভ্র বুক, মনে পড়ল হঠাৎ।
মালতীর ভ্রূ-সন্ধিচ্ছায়া, দৃঢ় উরুযুগ,
উদাস খড়ের গন্ধ, কেয়াফুল : কিছু পরে দীর্ঘ মেঘনাদ—
মালতী, মালতী বলে বারবার শব্দ করে ডেকে
আবার ভেঙে দিলাম ঝিলম নদীর নিস্তব্ধতা।

যৌবন সমস্ত পাপ কণ্ঠে ধরে রাখে
হাতের মুঠোয় বাঁধে বিদ্যুতের মালা,
আমি সেই সহস্রাক্ষ যৌবনের প্রান্তে এসে, প্রান্তে এসে,
সহস্রাক্ষ যৌবনের, আমি সেই সহস্রাক্ষ প্রান্তে
এসে আমি সেই…”

উপরে নিখিলেশ সেনের অসমাপ্ত ডায়েরি তুলে দিলাম,
কালরাত্রে নিখিলেশ হাতের ধমনী ছিঁড়ে ফেলে
দম্‌কা হাসির মত পুঞ্জ পুঞ্জ লাল রক্তে ভেসে শুয়ে ছিল।
উদ্ধত যুবার ওষ্ঠ ছুঁয়েছিল সময়ের বিশুদ্ধ কৌতুক।

আমি তার ফ্ল্যাটে এসে, সহিষ্ণু ভঙ্গীতে
জানলাগুলি খুলে দিই, জানলার ওপারে শূন্য মাঠ—
সেখানকার এক ঝলক হাওয়া এসে নিখিলের অবিন্যস্ত চুল
আচম্‌কা উড়িয়ে দিল, তার বাম চোখের পল্লবে
একটি পিঁপড়ে ঘুরছে, তবু তার দৃষ্টি মৃত, তবু তার নেত্রপাত নেই।

বৃষ্টি হয়েছিল, জল সহস্র ধারায়
ভাসিয়েছে তার ঘর, তবে কি মৃত্যুর আগে নিখিলেশ
গোপন নির্জনে
বর্ষার মাধুরী দেখে মুগ্ধ হয়েছিল ?
বারান্দায় শূন্য চেয়ার, দগ্ধ সিগারের টুকরো চারদিকে ছড়ানো।
তুমি কি বৃষ্টি ভালবাস না, নিখিলেশ ! একদিন প্রশ্ন করেছিলাম
—না।
না-মেঘ, না-বৃষ্টি, জ্যোৎস্না, সময়ের নিভৃত লাবণ্য
আমার কিছুই নেই, না নির্জনতার তৃপ্তি
বন্ধু-সম্মিলনে কিছু উল্লসিত মুখ
আমি সব-কিছু থেকে দূরে আছি স্বেচ্ছা-নির্বাসনে।

ভালবাসা, দ্বিধাহীন, সূচিমুখ, একাগ্র, নির্মম
হৃদয়কে বহুধাদীর্ণ কখনও কোরোনা
যে জ্যোৎস্না মমতা আনে আরক্ত নিশীথে
সে আমার ঈপ্সিতার দু চক্ষের ছায়া,
যে আবাস অবিরল মমতা ছড়ায়
সেও এক রমণীর ত্বকের চিক্কণ মসৃণতা।
মানুষের যা-কিছু প্রেয়, সব আমি বরণ করেছি
এক রমণীর মধ্যে, আমার অমোঘ ভালবাসা
রৌদ্রাভ খড়ের গন্ধে, মালতীর ভীত ভ্রূ-পল্লবে
প্রতিদিন স্বপ্নে ভ্রমে সে আমার সুধা হাতে নিভৃত বসুধা।

নিখিলের ঘরময় কবিতার পাণ্ডুলিপি উড়ছে হাওয়ায়
দু একটা ভিজেছে জলে, লালরঙা মেঝের উপরে
দু হাত ছড়িয়ে শুয়ে ভূতপূর্ব নিখিলেশ সেন ;
সদ্য-বয়ঃসন্ধি-অতিক্রান্ত এই উদ্‌ভ্রান্ত যুবার
রমণীর চেয়ে কেন মৃত্যুকে অধিক প্রিয় মনে হল কাল !
সন্ধেবেলা বারান্দায় বৃষ্টি তাকে কী কথা বলেছে,
অথবা এক টুকরো রোদ অকস্মাৎ মেঘ ভেদ করে
তার দিকে তীব্র দৃষ্টি তুলে ধরেছিল ?
একটি অন্ধ যেমন অন্তর্বর্তী পরম অন্ধকে
কদাচিৎ দেখে নেয়, কাল সন্ধেবেলা নিখিলেশ
কোন্ দৃশ্য দেখে তুই নিজের ধমনী কেটেছিস ?
'মর্গে কি হৃদয় জুড়োবে ?   মর্গে, গুমোটে ?
থ্যাঁতা ইঁদুরের মত রক্তমাখা ঠোঁটে ?'

থানায় ফোন করব নাকি, কিংবা হিন্দু সৎকার সমিতি ?
এই সময় পদশব্দ, মালতী ঢুকল এসে ঘরে ।
'জানতাম মরে যাবে', দাঁড়াল সে নিখিলের কাছে
মৃত পুরুষের পাশে শাশ্বত রমণী ।
'আপনি কখন এলেন ?' একবার আমার দিকে দীপ্ত চোখে চেয়ে
হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল উন্মুক্ত মাটিতে
'জানতাম মরে যাবে । মৃত্যুর নির্দিষ্ট অভিমান
ছিল তার বুকে পোষা, মৃত্যুর নির্দিষ্ট অভিমান
সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর রেখে যেত প্রতিদিন
সরল আলোয় কিংবা নির্বাক আলোর সরলতায় ।
কখনও ভালবাসনি কাউকে, এই অপ্রেমের অন্ধকার
তোমার পরিচ্ছদ হয়ে রইল, শোন নিখিলেশ !'

ও যে গেল, সঙ্গে কিছু পাথেয় রইল না,
কোথায়, কী করে যাবে, এই নিঃস্ব, অসহায়, সামান্য বালক !

টেবিলের উপরে কিছু মধু রাখা ছিল,
একটি কাঁচের শিশিতে
তার থেকে এক ফোঁটা মালতী ছুঁইয়ে দিল তার শুক্‌নো ঠোঁটে-
এই নাও ভালবাসা, রমণীর শরীরের মোহ,
এই নাও মেঘ-রৌদ্র, আরেক ফোঁটা মধু
নদীর স্রোতের শব্দ, কেয়াফুল, অরণ্যের ছায়া,
রাত্রিতে হঠাৎ-ডাকা পাখির চিৎকার—
সব তুমি নিয়ে যাও, অন্তিম ভ্রমণে।

জীবন অনেক ছোট, কয়েকটি গুনে-রাখা নিশ্বাসের মত
তবু বড় প্রিয় এই দীপ্ত বেঁচে থাকা!
একটি পিঁপড়ের ডাকে আরো কয়েক লক্ষ ক্ষুদ্র কীট
নিখিলের চারপাশে নিঃশব্দে জমেছে,
মালতী সবটুকু মধু সহাস্যে তাদের পরিবেশন
করে চেয়ে রইল সেইদিকে
কয়েক লক্ষ টুক্‌রো প্রাণ, মেতে উঠল মধু-পানোৎসবে।

শিবনীল

নিখিলকুমার নন্দী

'Its poison, my poison, lit me with its knowing'. —Valery.

'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুবসখা
যাতনা শুধুই যাতনা সুচিরসাথী।' — সুধীন্দ্রনাথ

এ তোমার রাজগৃহ নালন্দা নয়
ইতিহাসের চূর্ণ ধুলোয় বিকীর্ণ
যেখানে তুমি, সুব্রত। অতীতের সৌন্দর্যের কারুকাজে আজ বিমুগ্ধ ;
আর আমি নির্বান্ধব তৃণশয্যালীন
ঐতিহ্যবিহীন এই গণ্ডগ্রামে, মেদিনীপুর-গিধনিতে, বাংলায়।

দিগন্তবিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ ক্ষেতের
শালমহুয়ার বনে আকাশের ওপারে আকাশে
বনতুলসীমঞ্জরীর লেবুগন্ধে।
সকাল থেকে দুপুর বিকেল মেঘভাঙা রোদ্দুরে
ঝিঁঝিঁ জোনাকের ঢের সনাতন স্বাক্ষর থেকে দুরন্তুরন্ত আঁধারে
অথচ সংসারতরণী সঙ্গে এখানেও, সর্বত্র সমান তাই :
মানুষের চিবুকের জ্যা আর মানুষীর ভ্রূযুগের ধনু
সশস্ত্র পাহারা।
ভয়-লাগা রাত্তিরে জ্যোৎস্নার বুকে কপাট আছড়িয়ে
অন্ধকার যুগল শয্যায় আমরা এখানেও নিয়মতান্ত্রিক
স্নায়ুশিরা রাত্রিজাগর।

কখনো বা সংসারে ক্ষান্তি দিয়ে চৈতন্যসাগরে শান্তি খুঁজি
যেহেতু আমি শাশ্বত বুঝেও ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদি আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে-সংসারও।

হানা দেয় ডলুংয়ের বাঁক
বনে বনে মাঠে মাঠে তালগাছে হাওয়াদের হাঁক
সাঁওতালী বাঁশিতে ক্ষ্যাপা মাদলে মাতাল
কোজাগরী পূর্ণিমার ভরাকোটাল রাত যায়, সমুদ্রেই যায়।

নদীর স্বভাবী হতে পেয়েও সরসী হয়ে বাঁচো
নিষ্ফল শাশ্বত খুঁজি তোমার ক্ষণিক উন্মাদনে
ইডেন উদ্যান হতে ভ্রষ্ট আমি সংসারসীমার কাছে যাই
শেষ হোক মুগ্ধতার অমা।

তন্ময়তা চাই
বিহার চৈত্যের আলো নিরালোক বাংলা সবাই
ক্রূর সন্তাপনে খড়্গ হও
ভীষণ মহিমই অন্ধকার দীর্ঘ করো।

সংসার নিয়ত সঙ্গী।
কেউ সুখী অসুখী বা কেউ
শরীর তুলেছে ঢেউ কারো, কেউ ভেঙে গেল নিঃশব্দ দেহমন।
জীবনের লাবণ্যের ততটুকু হাসি প্রয়োজন
ততটুকু আলো
রেখার মমতা যার রাজগৃহী ঐশ্বর্য আর গিধনির দারিদ্র্যকে বেঁধেছে অখণ্ড
জনতায়।

মাঝে আমি চিরন্তন স্বস্তিহীন পথিক একাই
পদলগ্ন প্রেমার্দ্র বঙ্গীয় মাটি,
শিবনীল আকাশ রঙ্গিনী,
ডলুং জলাঙ্গী গঙ্গা মানসসঙ্গিনী।

আর-এক পটভূমি

অমলেশ ভট্টাচার্য

প্রেতলোকের প্রাচীর ভাঙবে ব'লে
একদল অন্ধকার মানুষ
অচিন নদীর পথ ধ'রে
চিহ্নহীন পথে পদচিহ্ন এঁকে
অস্পষ্ট ছায়ার মত এগিয়ে চলেছে।

পিছনে প'ড়ে রইল ঘর-সংসার,
মৃত সন্তানের কবর,
ভ্রূক্ষেপ নেই।
নরকের শ্মশানের শোক ভুলে
এবার তারা বীতশোক হবে।

এখানে আকাশ নেই
মাটি নেই—
নিষ্ঠুর প্রাণের মৃগয়া,
অশুচি রক্তের উতরোল।

অন্ধকার মানুষগুলো এবার নদী পার হবে।
সে নদীর জল রক্তের মত গাঢ়,
কান্নার মত ভারী।
হাড়ের বাঁশি বাজিয়ে
মহাকাল চলেছে পথ দেখিয়ে।
গভীর ঘুমের ছায়া অন্ধকার মৃত্তিকার বুকে,
চারিদিকে ঘরবাড়ি, ভাঙা সাঁকো, গ্রামের শ্মশান—

নিমগ্ন সুখের পরে উদাসীন মৃত্যুতে বিলীন,
চেতনা ঘুমিয়ে আছে অতীতের শিলালিপি হয়ে
মানুষগুলো এবার নদীপার হবে।
সে-নদীর জল অশ্রুর মত স্বচ্ছ,
মৃত্যুর মত শীতল।
পটভূমি দ্রুত সরিয়ে
অন্ধকার মানুষগুলো এবার উজ্জ্বল হবে।

চেসম্যান : দ্বিতীয় অনুভূতি

সুনীল বসু

জাফরান আলো, রূপ বেড়াতে এসেছে এ বাগানে
শুয়ে আছি নম্র তৃণে, সন্ধ্যা হল, নক্ষত্রের স্তনে
মেঘেরা ছোঁয়াল হাত, গুপ্ত মন্ত্র ঝরে কানে কানে
মহিলা যুবতী বটে, দেখ দেহ, ঢাকা নাইলনে।

অসহ্য বর্বর ইচ্ছা, যাকে দেখা আলোয় বারণ
তারা আসে মজলিশে করোটির এ-পান্থশালায়,
হৃৎপিণ্ডে অগ্নিকাণ্ড ঘটে কেন আজ অকারণ
ওষ্ঠাধরে রক্তচুল্লি চুম্বনের রন্ধন জ্বালায়।

রাত্রি হল, তাজা আলো রক্ত, ভদ্রমহিলা এখন
নীহারিকা দৃষ্টিপথে, নারীহরণের মিষ্ট স্বাদ
ছেয়ে গেল মনে, বালুচর কান্না, স্বর্গ-দ্বীপান্তরে
অবশেষে অপগত হবে কোনো লম্পট জীবন—
তবু নেব দেহকোষে যুবতীর ত্বকের আহ্লাদ
তার পর হব সুধা নিয়তির নীল ওষ্ঠাধরে॥

শেষ বসন্ত

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিরস বসন্তে দূরে শেষপ্রান্ত হাতছানি দেয় আর ডাকে—
ধুলোয় মলিন পাতা, রক্তবন্ধ শিরা-উপশিরা,
সুন্দর স্বপ্নের মত আচার-বিচার কত অনুষ্ঠান, ক্রিয়া কোন্ ফাঁকে
উবে গেছে, প্রীত গন্ধ অপগত, ম্লান দীপ্ত হীরা।
আর কি নির্মম এই নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা, মৃত পশু পাল,
ভাঙা বাঁশী টুকরো টুকরো, গতজ্যোৎস্না স্মৃতির গোপনে,
সমস্ত বিপন্ন চিহ্ন, কোনোখানে নেই কারো একটু আড়াল
পাখীরা পাথর হয়ে গেছে অভিশাপে এই পাতাঝরা বনে
মুকুরে এমন দৃষ্টি একলার, একাকার, কে যাবে মেলায়
হাতের কড়িটা নেই, বুকের ভিতর শুধু স্তব্ধতা কঠিন,
কাচের দুচোখ, গলা কাঠের এবং—কি'বা ভূতুড়ে খেলায়
কঙ্কালের হাটে একি শূন্যতার হাটে একি দিন হল দিন!

বিরস বসন্তে দূরে শেষপ্রান্তে সেই যাবে একা
অন্তহীন স্রোতধারা মনে মনে ফুটে উঠছে রক্ত, রক্তলেখা।

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি ইলিনয়ে গেলস্‌বার্গে কার্ল স্যাণ্ডবার্গের জন্ম। তাঁর পিতামাতা সুইডেন থেকে আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তেরো বছর বয়সে স্যাণ্ডবার্গ দুধের গাড়ি চালাতেন; এর পরে এক নাপিতের দোকানে কিছুদিন কাজ করেন, তার পরে এক থিয়েটারের সীন টানার কাজেও লেগেছিলেন; একটা ইঁটখোলার লরি-ড্রাইভারও হয়েছিলেন। সতেরো বছর বয়সে প্রথম তিনি দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং নানা রকম উদ্‌ভট কাজ করে জীবিকানির্বাহ করেন। তার পরে একসময়ে দেশে ফিরে এসে স্থির করেন তিনি হাউস-পেণ্টার হবেন। ঠিক এই সময়েই স্পেন আর অমেরিকায যুদ্ধ বাধে এবং তিনি ষষ্ঠ ইলিনয ভলেন্টিয়াসএ যোগ দেন।

সৈন্যদলের কোনো-একজন বন্ধুর প্রভাবে অতঃপর তিনি মনস্থ করেন ইলিনয়ে গেলস্‌বার্গের লোমবার্ড কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করবেন। সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর তিনি সমস্ত দেশ ভালো করে ঘুরে বেড়ালেন এবং তার পরে মিলওয়াকিতে বসতি স্থাপন করলেন।

তিনি এই সময়ে সংবাদপত্রের সংশ্রবে আসেন। প্রথমে স্টকহলমের সংবাদদাতা হিসাবে 'নিউজ পেপার এন্‌টারপ্রাইজ অ্যাসোসিয়েটস'এ যোগ দেন, পরে 'শিকাগো ডেইলী নিউজ'এর সম্পাদকমণ্ডলীতে।

কলেজে অধ্যয়ন করবার সময়েই স্যাণ্ডবার্গ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। শিকাগোতে ব'সে লেখা তাঁর কবিতাগুলি যখন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হল তখন যথার্থ কাব্যরসিকেরা তাঁর কবিতার মধ্যে শ্রমিকদের মুখের কথাগুলির অপূর্ব প্রয়োগনৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হলেন। এর পর তাঁর দুটি কব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'কর্ন-হাস্‌কার্স' (১৯১৮) 'স্মোক অ্যাণ্ড স্টীল' (১৯২০)। তাঁর কাব্যের চরম উৎকর্ষ দেখা গেল ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি পিপ্‌ল, ইয়েস' কাব্যগ্রন্থে।

অতঃপর স্যাণ্ডবার্গ মিচিগানে হারবার্টে বসবাস করতে থাকেন। সেইখানে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'আব্রাহম লিংকন'এর ছয় খণ্ড জীবনী রচনা করেন।

ন. ব.

স্যাণ্ডবার্গের কবিতার অনুবাদ

HATS

Hats, where do you belong ?
what is under you ?
On the rim of a skyscraper's forehead
I looked down and saw : hats : fifty thousand hats
Swarming with a noise of bees and sheep,
Cattle and waterfalls,
Stopping with a silence of sea grass,
a silence of prairie corn.
Hats : tell me your high hopes.

টুপী, তুমি কাদের ?
তোমার তলায় কারা আছে বলো তো ?
খুব উঁচু— প্রায় গগনস্পর্শী একটা বাড়ির থেকে
আমি নীচের দিকে তাকালাম।
আর দেখলাম, টুপী, টুপী— পঞ্চাশ হাজার
টুপী !
ঠিক যেন মৌমাছির মত তারা গুন্‌গুন্
করছে,
ঠিক যেন ভেড়ার পালের মত তারা
নড়ছে !
ঠিক যেন জলপ্রপাতের মত তারা
ছড়িয়ে পড়ছে !

টুপী টুপী, তোমার তলায় কারা আছে
বলো তো ?
হঠাৎ চেয়ে দেখি, সেখানে সমুদ্রশৈবালের মত
নিথর স্তব্ধতা,
ঠিক যেন প্রেইরী শস্যক্ষেত্রের বিশাল নীরবতা !

টুপী টুপী, তোমার জীবনের সব থেকে
বড় আশা কি বলো তো ?

BABY TOES

There ia a blue star, Janet,
Fifteen years' ride from us,
If we ride a hundred miles an hour.

There is a white star, Janet,
Forty years' ride from us,
If we ride a hundred miles an hour.

Shall we ride
To the blue star
Or the white star ?

দুই তারা

জ্যানেট, আমাদের পৃথিবীতে দুটি
তারা আছে,
তার মধ্যে একটি হচ্ছে নীল,
যদি আমরা ঘণ্টায় এক শো মাইল বেগে যাই
তা হলে সেখানে পোঁছতে পনেরো বছর
সময় লাগবে !

এ ছাড়া আরও একটি তারা আছে
জ্যানেট ।
যদি আমরা ঘণ্টায় এক শো মাইল
বেগে যাই,
তা হলে সেখানে পৌছতে চল্লিশ বছর
সময় লাগবে !

বলো জ্যানেট, আমরা নীল তারায় যাব,
না, সাদা তারায় ?

GLIMMER

Let down your braids of hair, lady.
Cross your legs and sit before the
looking-glass.
And gaze long on lines under your eyes.
Life writes ; men dance.
And you know how men pay women.

হিসেব

তোমার দীর্ঘ অলকদামকে ছড়িয়ে দাও
শ্রীমতী,
তার পরে আয়নার সামনে এসে বসো।
আর তার পরে তোমার চোখের নীচে
যে-রেখাগুলি পড়েছে তাদের দিকে তাকাও!
ছাখো, জীবন লিখে চলেছে,
মানুষেরা নাচছে,
আর সেই সঙ্গে আর-একবার হিসেব করো
কেমন করে মেয়েদের মূল্য দিচ্ছে
পুরুষেরা।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

কেমন লাগল

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কখনও কবিতা শুনিয়ে কিংবা হাতে ছাপা পত্রিকা ধরিয়ে দিয়ে পাশে বসে থেকে কবিবন্ধু এ কথা জিজ্ঞেস করে থাকেন— কেমন লাগল ? মানে, কবিতাটি কেমন হয়েছে। অনেকে কিছু না বলে মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করেন— 'দেখি শ্রোতা কি বলেন, তার কেমন লাগল।'

একটা গল্প শুনে তখুনি কিছু বলা যায়। বিরাট সামিয়ানা পুজো-পার্বণে টানাতে হলে ধীরে সুস্থে বড় ছুচ দিয়ে সেলাই করা যায়। কিন্তু কবিতাকে নিয়ে মুশকিল। শুনেই কিংবা পড়েই কিছু ঠিক বলা যায় না। যাঁরা বলতে পারেন তাঁরা কৃতকর্ম শ্রোতা।

একটা কবিতা শুনলাম— তার মধ্যে ছবি থাকলে মনে মনে সাজিয়ে মিলিয়ে নিলাম, দুটি-একটি বিষাদ-ক্লিষ্ট অনুষঙ্গ কিংবা সাদামাঠা শব্দের অভাবনীয় মিল ঘটানো হলে তা নিয়ে মনে মনে স্বাদিষ্ট খাদ্যের মত চারিয়ে নিলাম— সব মিলে. একটা ঘন মানসিক অবস্থা হল। তখন একা একা কবিতাটি ভোগ করছি। কোনো বিশেষ ঘটনা নিজের জীবন থেকে তুলে নিয়ে ওই কবিতার কোনো কোনো চরণ দিয়ে সেই ঘটনার মানে খুঁজছি। নিজেও যে সবটুকু অর্থ বুঝেছি তা নয়; তবু খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছি এবং প্রায় মানে পেয়ে গেছি, ভয়ে ভয়ে বলতে পারছি না— কবি যা ভেবে লিখেছেন তার সঙ্গে যদি না মেলে।

সেই অবস্থায় যদি শুনতে হয়— 'কেমন লাগল ?' 'লাগল' মানে লাগা হয়ে গেছে। ভোগ সম্পূর্ণ— এখন স্মৃতি। কিন্তু আমার তো এখনও লাগবে। কবি যদি অস্থির না হতেন তা হলে আরও খানিকক্ষণ লাগত।

এ ধরণের প্রশ্ন শুনে শ্রোতা বিমূঢ় হন। কবিতার প্রতি অশ্রদ্ধা থাকলে চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিমিশ্র প্রশংসা সন্দেহজনক বলে তিনি দোষগুণ মিলিয়ে যা বলেন তার সঙ্গে অসংলগ্নতার তুলনা চলতে পারে কেবল ঠোঙার কাগজের উপরে ছাপা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যেটুকু মিল ততটুকুর সঙ্গে। তাঁরা অনেকটা এইভাবে বলেন—

"হু। ভাবটা বুঝলাম। বলতেই হবে, চিন্তায় যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছেন। বিশেষ করে ঐ জায়গাটা— আঃ, কি যেন লিখেছেন— দুর, মনে পড়ছে না। বড় ভাল হয়েছে। তবে দেখুন, শব্দচয়নে আর-একটু মনোযোগী হতে পারেন। আর, এই ইমেজ কেমন পুরনো হয়ে গেছে। তবু, তবু বলব আগের চেয়ে আপনার মধ্যে তত্ত্বের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল কবিতা।"

আর, শ্রোতার যদি হাতে সময়ের অভাব থাকে কিংবা বাইরে দারুণ গ্রীষ্ম অথবা তিনি যদি মুখের উপর সত্য কথা বলে অপ্রিয়ভাজন না হতে চান তা হলে তিনি সাধারণত দুটি জিনিস করে থাকেন ; হয় বলেন—

ক. একটা কবিতা শুনে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পর পর কতকগুলো কবিতা শুনলে আপনার লেখার trendএর সঙ্গে পরিচিত হতে পারব। তা হলে আমার পক্ষেও বিচার করা সুবিধে হবে। আপনার কবিতা সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কি বলেন ?

না হয়—

খ. কী লিখেছেন ? উঃ ! তুলনা হয় না। আপনি বড় নিষ্ঠুর ! মানুষের ব্যথাবেদনাকে দূর থেকে দেখে গায়ে না মেখে এমন ভাবে কি করে লিখলেন ? আশ্চর্য। আশ্চর্য শব্দগ্রন্থন ! না না, আমি আর শুনব না। লিখে যান। সময় নষ্ট করবেন না। শুনে আপনার সময় নষ্ট করব না।

কবিতা মোক্ষম জিনিস।

যিনি লেখেন তিনি না লিখে পারেন না। কিছু-একটা দাগ দিল মনে। মনের মধ্যে খুব কেমন একটা যন্ত্রণা। সারাদিন বুকের মধ্যে বিড়াল আঁচড়াচ্ছে। ব্যাপারটা লেখা হয়ে গেল। মাথার চিন্তা-শ্লেষ্মা মুক্ত হল। শরীর হালকা হল। পরিচ্ছন্ন হয়ে পথে বেরোতে ইচ্ছে করল। যাকে শোনাব সে যেন সবটুকু মন দিয়ে শোনে— আশেপাশে কেউ যেন গোলমাল না করে। কিংবা যিনি আমার কবিতা পড়বেন তিনি যেন যথেষ্ট নির্জনে পড়বার সুযোগ পান।

তা হলে পাঠক আর কবির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার। জীবিকা,

সময়, গ্রীষ্মের শারীরিক অস্বস্তি এবং পাঠকের কণ্ঠস্বর সব নিয়ে কবিতা মনে এক রূপ নিয়ে পৌঁছয়। সুতরাং এসব কথা চিন্তা যখন করি এবং কবি যখন জিজ্ঞেস করেন 'কেমন লাগল' তখন মনে হয় শ্রোতা কি খুব সুবিধায় পড়েন ?

শ্রোতা যদি সৎ হন তবে তাঁর উত্তর এরকমও হতে পারে—

ক. কিচ্ছু হয় নি, অতিশয় বাজে জিনিস।

খ. এসব মাথামুণ্ডু লিখে কেনই বা সময় নষ্ট করা, কেনই বা কাগজ নষ্ট করা।

গ. চাকরীবাকরি পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঘ. ভাল লাগল— আর একবার পড়ুন।

ঙ. এমন আইডিয়ার সঙ্গে আগেও পরিচিত হয়েছি— নতুন কিছু পেলাম না।

চ. মাঝেমাঝে বুঝতে পারছি— আবার হারিয়ে ফেলছি ; একসঙ্গে সবটুকু দাঁড় করিয়েও কোনো অর্থ পাচ্ছি না।

ছ. অদ্ভুত ভাল লাগল— ঠিক কিরকম ভাল লাগল তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করবেন না— আমাকে নিজের মত করে ভাল লাগতে দিন।

জ. আপনি কি রবীন্দ্রনাথের মত লিখতে পারবেন ? না পারলে লেখেন কেন ?

স্বীকার করছি, ভাল জিনিসের স্বাদ নিতে হলে সজ্ঞান মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। যে কবিতা কঠিন লাগছে তা পড়তে পড়তে জলও হতে পারে। কিন্তু কিছু কবিতা আছে যা অন্তত পড়ে বা শুনেই মানে বলতে আটকায়— নিজেও মনে মনে বোঝা যায় না।

যেমন, আমি যদি লিখি—

১. অনিকেতনী ? কোথা যাও বিশ্ব মাড়িয়ে সম্মার্জনী বেপথু বেগে—

২. ভলগা তোমার আলগা কেশের বলকা দেওয়া কৈশোরে—

৩. গার্গী, উঠোনে তোমার উপনিষদের পাতা
লাস্যে ভাষ্যে ওড়ে শুধু মনুসংহিতা।

৪. বিজীগিষা, চতুর্বর্ণে অবিশ্বাসী, অথচ
মীড় গমক মূর্ছনা ইত্যাকার বৈষয়িক
সচেতনী। ওয়ি নীলাম্বরী, ওইখানে মর
কবর বিবর তব আবরি নিঃসীম। যগুপি
দুর্জয় লিঙ্গ সাধনে বিমনা, কিংবা
বিলাসিনী সুহাসিনী অণুর বৈপরীত্যে...

আগে, কেমন লাগল বলা সোজা ছিল। আগেকার কবিতা জীবনের বড় সত্য নিয়ে লেখা হত। সন্ধ্যার রূপ, কুমারীর লজ্জা, মাতৃস্নেহ, পূর্বরাগ, দেশপ্রেম, বীরত্ব ইত্যাদি দাগা দাগা বিষয় নিয়ে লেখা হত। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের অমিল ছিল ট্র্যাজিডির প্রধান কারণ।

দুই যুদ্ধ, স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অসাম্য, পৃথিবীব্যাপী সক্রিয় অসংলগ্নতার ঢেউ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আত্মহননকারী অবিশ্বাস, যৌনজীবন সম্পর্কে অযথা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাবের যুক্তিবাদী আবরণ উন্মোচন এবং সর্বোপরি দেহ সম্পর্কে কখনও পলায়নী কখনও অতিলগ্ন ভাব— এইসব নিয়ে আমাদের জীবন আধুনিক জীবনের সব আনন্দ সব যন্ত্রণা সব পীড়ন ও বিস্তার নিয়ে পূর্ণ। কবির জীবনও তাই এসব নিয়ে যুক্ত। তাঁর কবিতা তাই আমরা শুনেই বা পড়েই কেমন লাগল বলতে পারি না। কেননা, জীবনে আমরা এইসব নিয়ে ভুগছি। আমরাই মুক্ত না। কবি মাঝেমাঝে মাথা ঠেলে উপরে উঠে নিশ্বাস নিচ্ছেন— আমাদের খবর দিচ্ছেন। আমরাই কবিতার বিষয়, আমরাই কবিতায় বাস করছি। তাই যখন আধুনিক কবি ঈশ্বরের সঙ্গে তুই-তোকারি সম্পর্ক পাতিয়ে কবিতা লেখেন তখন আমরা তাকে ব্লাসফেমি বলি না সত্যি, আবার এও মনে করতে পারি না, যশোদা-কৃষ্ণের পারিবারিক সম্পর্কের মত কবি নিকটসম্পর্ক পাততে পেরেছেন। যখন কেউ বলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে সকাল দশটার বাসে দেখা হল; তখন অবাক হই এবং পরিপাক করে নিতে সময়ও লাগে যথেষ্ট।

আমাদের কাছে জীবন এখন খুব লাগছে— বেশ লাগছে— কষ্ট হচ্ছে— আনন্দ হচ্ছে। যেমন আর-কি সব যুগে সব মানুষের লাগে। সব যুগেই

সব মানুষের কাছে তার নিজের যুগ 'সন্ধিক্ষণ'। কবি এই সন্ধিক্ষণের সমীক্ষক। তিনি যেন অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস না করেন 'কেমন লাগল'। আমাদের তো সর্বক্ষণ লাগছে। কবি আমাদের সময় দিন। আমরা তাঁর কবিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। তিনি আমাদের জন্য প্রস্তুত হোন। অস্থির হবেন না।

আর-একটা জিনিস। সব কবিতাই কেমন লাগল বলা কঠিন। অনেক অনুভব আছে যা কিনা অনুভবের সঙ্গে যন্ত্রণা ও আনন্দ নিয়ে আসে। তা শুধু একা একা অনুভব করা যায়— মুখে ঠিক সে অনুভবের কথা বলা যায় না। বললে ভারমুক্ত হওয়া যায় সত্যি, কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি বোধ হয় সম্ভব নয়।

আর, 'কেমন লাগল' সে কথা তখুনি তখুনি বলা কি ঠিক? কবিতার কথা কাজে-কর্মে ভুলে যাব। তার পর হঠাৎ কাজে-কর্মে মনে পড়বে। জীবনের সঙ্গে লেগে থাকবে কবিতা। হঠাৎ বলব, 'সত্যি! কি ভাল লিখেছিলেন'। হঠাৎ মনে পড়বে। স্মৃতির মত। মন্থর গ্রীষ্মে শীতকালের কোনো বেদনাদায়ক বিচ্ছেদস্মৃতির মত।

অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র লিরিকের প্রতিশব্দ হিসেবে গীতিকাব্য শব্দটিকে নির্দিষ্ট ক'রে উদাহরণ হিসেবে হেমচন্দ্রকে, এমনকি অবকাশরঞ্জিনীর নবীনচন্দ্রকে, উপস্থিত করেছিলেন। 'এমনকি' কথাটা আমরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি। তার কারণ, বিহারীলাল আর বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম মৃত্যু আর জীবিতকাল এত কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও 'আদর্শ' লিরিকের পংক্তিতে প্রথমোক্ত জন যে কেন অপাংক্তেয় হলেন, বলা কঠিন। ঈর্ষা? অতদূর অবরোহণ না ক'রে এটুকু বলা সম্ভব, 'যেটুকু অব্যক্ত থাকে সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী', এ কথা যতই কবুল করুন, একটা কোনো কার্যসূচী, একটু কোনো সমাজসম্পর্কিত বাচ্যার্থ না পেলে লিরিক কবিতাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া, বরণ করে নেওয়া, বঙ্কিমের পক্ষে দুরূহ ছিল। অথচ, বিহারীলাল তো স্পষ্টই বলেছেন, 'আমি কোনো উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।'

'শিল্প,' কোনো একজন বরের ঘরের মাতৃষ্বসা এবং কনের ঘরের পিতৃষ্বসা বলেছিলেন, 'যুগ্ম উৎস থেকে এসেছে : শিল্পের পিতা ব্যবহারিক, মাতা সুন্দরী'। বিহারীলাল শুধু মাত্র এই সুন্দরী জননীকেই সাধের আসন পেতে দিয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার বড়াল সেই আসনের পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, বিহারীলালকে সোজাসুজি শিল্পগুরু নির্বাচন ক'রে নিযেছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বড়ালকে সেদিনকার বিপিনচন্দ্র পাল অথবা সুরেশ সমাজপতিরা যে মেনে নিয়েছেন, তার কারণ কী? যে-সুরেশ সমাজপতি বলেছিলেন, 'জাতীয়-জীবনের উন্নতি সাহিত্যসাপেক্ষ এ কথা সর্ববাদিসম্মত। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যদি সেই জাতীয়-জীবন গঠনের জন্য প্রাণপাত না করেন, তবে আর কে করিবে?' সেই একই ব্যক্তি কি ক'রে অক্ষয়কুমারের লিরিক সম্বন্ধে উদ্বেল হয়ে বলেন, 'খণ্ড-কবিতায় ভাবকে পূর্ণাবয়বে অভিব্যক্ত করিবার

চেষ্টা নাই। তাহা যতটুকু প্রকাশ করে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আভাসে ফুটিযা উঠে।..কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতম। অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ কবিতা এই বঞ্জনায় সমৃদ্ধ।' এখানে একটা কথা সহজগ্রাহ্য। বিহারীলালের 'ব্যঞ্জনা' আর অক্ষয়কুমারের 'ব্যঞ্জনা'— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কাদম্বরী দেবী বা একজন দ্বিজেন্দ্রনাথ বিহারীলালকে বুঝতে পেরেছিলেন, এবং আর ক'জনমাত্র দূরদর্শী গভীরগামী কবি। অক্ষয়কুমারের শ্রোতার সংখ্যা ছিল আরো অনেক বড। তার প্রথম হেতু, তিনি মানুষের জগতে দাঁড়িয়ে মানুষের কথা বলেছেন। দুই, তিনি ভাবকে রূপের মধ্যে বেঁধেছেন, ভাষা দিয়েছেন; বিহারীলালের মত অরূপের আভাস তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

দ্বিতীয হেতুটি থেকেই এগোনো যেতে পারে। 'প্রদীপে'র দ্বিতীয সংস্করণে অক্ষয়কুমার বলছেন, 'প্রথম সংস্করণের সাত-আটটি কবিতা রাখিলাম। তাহাও আমূল পরিশোধিত। এমনকি, নূতন কবিতাও বলা যায়।' অথবা 'কনকাঞ্জলি'র দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর উক্তি, 'এই দ্বিতীয সংস্করণের অর্ধাধিক কবিতা নূতন এবং গ্রন্থিসম্বদ্ধ।' এই রকম উক্তি যিনি করেছিলেন, আজকের পাঠক তাঁরই মধ্যে যদি শ্লথকথন অথবা অগোছালো ধরণ দেখতে পান, অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু সেই সম্ভাব্য বিস্ময়, জীবনানন্দকে মনে রাখলে, মীমাংসিত হওযা সম্ভব। জীবনানন্দও একাধিকবার পরিমার্জনার পর এমন একটি বাক্য হয়তো দাঁড় করাতেন, যার মুখে শ্রমের সাক্ষ্যমাত্র নেই, অথচ কেমন যেন ঢিলেঢালা ছাড়া-ছাড়া ভাবভঙ্গি।

রূপের চেতনা অক্ষয়কুমারের কবিতার একটি লক্ষণ, যে-নারীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন তাঁর রূপ এবং কবিতায় সেই নারীর রূপভেদ। এখানেও জীবনানন্দকে মনে রাখলে অক্ষয়কুমারকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব। জীবনানন্দ রূপ থেকে রূপাতীতে, দেহ থেকে দ্যুতিতে, মানুষী থেকে মানসীতে যাত্রা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার সম্পর্কে ঠিক এই সাধর্ম্যসূত্র অক্ষরে-অক্ষরে প্রযোজ্য। মোহিতলাল এটি তাঁর নিজের অনুরূপ মনন থেকেই ধরতে পেরেছিলেন, 'তাঁহার সেই অতি উর্ধ্বগ ভাবসর্বস্ব কামনাতেও দেহের ক্ষুধা বর্তমান।'

জীবিকা হিসেবে জীবন-বীমা ব্যাপারটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই নিশ্চয় নয়, স্বভাবের দরুন, অক্ষয়কুমার জীবনের সঙ্গে মৃত্যুকে যুক্ত দেখেছিলেন। এবং পরিত্রাণ হিসেবে তাই কি শিল্পের কাছে তাঁকে যেতে হয়েছিল? তা যদি না হবে তবে 'প্রদীপ' খুললেই 'Art is long, But life is short' উক্তিটি কেন উৎকীর্ণ দেখতে পাব? মৃত্যু-আক্রান্ত জীবনকে শিল্পে রাখতে হবে, এই কথাটা অক্ষয়কুমারের মত উনিশ শতকে আর কে এত জোর দিয়ে বলেছেন, জানি না। তাই

চিত্র-অবশেষে সজল নয়নে
চিত্রকর শূন্যে চায়—
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে
জীবন বৃথায় যায়!

এ কথা বলেই পরক্ষণে তাঁকে বলতে হয়েছে

প্রিয়ারে সন্তাষে বিহ্বল প্রেমিক
একি অদৃষ্টের ছলা।

এই 'অদৃষ্টের ছলা' অক্ষয়কুমারের কবিতার মূল সুর। 'অদৃষ্ট' শব্দটাকে তিনি ভালোবেসেছেন, তাঁর কবিতায় সেই ভালোবাসা স্বাক্ষরিত। কোনো প্রারব্ধ বিশ্বাসে তিনি আশ্রয় চান নি, বরং অব্যর্থ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন

একি রোগ, কোথা মূল? একি জন্মান্তর ভুল!
এ পাপের নাহি প্রশমন?

এই কাতর জিজ্ঞাসার পাশে বিহারীলালের

এ ভুল প্রাণের ভুল
মর্মে বিজড়িত মূল
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী

অথবা 'জীবনের কি অসুখ' ইত্যাদি সুতৃপ্ত শ্লোকাংশ রাখলেই অক্ষয়কুমারের আধুনিক মনটিকে কাছে পাব।

মধুসূদনের কবিতার মানুষও আর স্কট-বাইরন-মুরের পুনরুক্তি করে না, কীট্সীয় বেদনা এক-একবার স্পর্শ করে। এবং মধুসূদনের মানুষেরাও অদৃষ্টপীড়িত, দৈবদীর্ণ। কিন্তু যুক্তি দিয়ে তিনি সেই মানবিক হৃদয়দহনকে

নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তাই 'রেখো মা দাসেরে মনে'র মত বিবৃত বিধুর আতুর পংক্তি তাঁর মধ্যে আর ক'টি পাব? চতুর্দশপদী, যেখানে তিনি বিশ্রাম নিলেন, সেই সংবৃত মানবিকতার যুক্তিবাদ। অন্যদিকে অক্ষয়কুমার যিনি 'গীতিকবিতা'র ছন্দোময় সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন, 'নিটোল শিশিরকণা', যাঁর নিজেরই অধিকাংশ কবিতা শিশিরের মত মিতায়ত, তাঁর মানবিকতা যুক্তিকে শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাসকেই যুক্তির উপরে স্থাপন করে, আর উত্তেজনায় থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে—

অবস্থার শিখরে উঠিয়া,
অবস্থার গহ্বরে লুটিয়া
বুঝিযাছি আমি যাহা, তর্কে কি বুঝাব তাহা
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি—
বুঝাইব কেমনে তোমারে ?
জীবন নহে তো সমভূমি—
দেখিয়া লইবে একেবারে।

পড়তে-পড়তে কি মনে হয না জীবনানন্দ পড়ছি !

এই নিবন্ধের কয়েকটি উপকরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব গবেষণা থেকে গৃহীত। এই সূত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

মাইকেল মধুসূদন পুত্রশোকাতুর রাবণের মুখ দিয়ে যে আক্ষেপ উচ্চারণ করিয়েছিলেন, সেই আক্ষেপের কথাগুলি আজ আমাদেরও উচ্চারণ করতে হচ্ছে— 'একে একে নিভিছে দেউটি'।

গত ১৪ বৈশাখ ১৩৬৭, ২৭ এপ্রিল ১৯৬০, বুধবার দ্বিপ্রহরে রাজশেখর বসু লোকান্তরিত হয়েছেন। পরিণতবয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তবুও তাঁর মৃত্যুতে আক্ষেপ এইজন্যে যে, বাংলা সাহিত্যের অভিভাবক-আসনটি শূন্য হয়ে গেল। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যেজন্যে মিলটনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন England hath need of thee, আমরা অবিকল ঐ কারণেই রাজশেখরের উদ্দেশ্যে বলি—thou shouldst be living at this hour— বাংলাদেশে তাঁর উপস্থিতি দরকার ছিল।

বঙ্গসাহিত্যে রাজশেখরের আবির্ভাব পরশুরামের বেশে, কিন্তু বিশ্ব নিঃক্ষত্রিয় করার জন্যে হাতে কঠোর কুঠার নিয়ে তিনি আবির্ভূত হন নি। এসেছিলেন যেন একটা গুপ্তি হাতে ক'রে— বাইরে থেকে সেটা দেখতে নিরীহ লাঠি মাত্র, কিন্তু তার অভ্যন্তরে ছিল শাণিত শাসন। পরিহাসের সঙ্গে প্রহারের অদ্ভুত কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড তৈরি করেছিলেন তিনি তাঁর রচনায়।

তিনি কেবল অভিভাবকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উদাহরণ। সময়ের সদ্ব্যবহার কিভাবে করতে হয় তার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। বেয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি সাহিত্যকর্ম আরম্ভ করেন, তবুও কর্মের পরিমাণ সামান্য রেখে যান নি। ৮০ বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন, কিন্তু আমাদের এক সাহিত্যিক বন্ধু মন্তব্য করেছেন, "রাজশেখর ঐ বয়সের মধ্যে ১৬০ বছরের কাজ করে গিয়েছেন।" আমরা তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে একমত।

রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন ও উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। দেশে ও বিদেশে। বিদেশে কে কি করছেন সে সম্বন্ধে আমাদের তেমন আগ্রহ নেই— বৈদেশিক উৎসব অনেকটা রাজনীতির সঙ্গে মেশানো সুতরাং তাকে

ভেজালহীন শ্রদ্ধা বলে মনে করা কঠিন। আমাদের আগ্রহ দেশের অভ্যন্তরের উৎসবেই। এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক পরিচয় হোক, এই আমাদের কামনা। দেশের লোকে সম্যক্‌ভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তিতে নিজেদের উদ্দীপিত করে তুলতে পারলে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি, বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এক বছরের বড়, অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)। তাঁর কথা আজ আমরা যে ভুলিনি তার প্রমাণ তাঁর শতবার্ষিক উৎসব পালিত হয়েছে কয়েকটি সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানে। এই উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর সম্বন্ধে এই সংখ্যায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করলাম।

সুশীল রায়

অক্ষয়কুমার বড়ালের চিত্রের ব্লক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত

অনুবাদ

কালিদাসের মেঘদূত

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্বমেঘ

কুবেরের অনুচর কোনো যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
"বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ!"
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি।
রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে[১]।
ভাবনায় শুষে তার অঙ্গ সমুদায়,
হস্ত হ'তে খসে পড়ে স্বর্ণের বলয়।
আষাঢ়ের আগমনে দেখা দিল পরে
দিব্য এক মেঘ উঠি পর্বত উপরে;
দেখিতে হইল আর মেঘের আকার—
করী যেন ভুঁয়ে করে দশন প্রহার।
নব ঘন দেখি মন টলয়ে ঋষির,
কত না যাতনা হবে একা বিদেশীর।
হইল তাহার মনে—প্রেয়সীর ঠাঁই
কুশল সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই?
মেঘে দিয়া হেন কার্য করিব সাধন
এতেক করিতে মনে আইল শ্রাবণ।

১ এই পর্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎকাল বসতি করিয়াছিলেন।

নানা জাতি পুষ্প আনি অর্ঘ বিরচিয়া,
অতঃপর জলধরে কহে সম্ভাষিয়া—
অচেতন মেঘে সে চেতন করি মানে,
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে।—
হে মেঘ। তোমায় আমি জানি সবিশেষ,
পুষ্কর বংশেতে জাত খ্যাত সর্বদেশ।
বিধির বিপাক হেতু পড়েছি সঙ্কটে,
আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে।
মহতের যাচ্ঞা যদি নিরর্থক হয়,
সেও ভাল, তথাপি অধমে কভু নয়।
তাপিতের তাপ হর স্বভাব তোমার—
ধরাকে তাপিতা দেখি ত্যজ বারিধার;
সারা হলো মনস্তাপে প্রেয়সী আমার,
বাঁচাও হে তারে মোর দিয়ে সমাচার।
যে স্থানে অলকাপুরী থাকে যক্ষগণ,
যাইতে হইবে তব সেই নিকেতন।
বাহির-উদ্যানে বসি বিরাজেন হর,
ভাল-শশী আলো করে যত বাড়ীঘর।
বায়ুপৃষ্ঠে করি ভর আঁধারিয়া দিক
হইবে যখন তুমি আকাশ পথিক,
প্রাণেশ আসিবে দেশে এ আশ্বাসে ভুলি[২]
বিরহিনী তোমায় দেখিবে আঁখি তুলি।
তোমা দৃষ্টে বাঁচে কেবা না দেখি প্রিয়ায়,
পরাধীন আমি তাই আছি এ দশায়!
হিল্লোল দিতেছে দেখ বায়ু অনুকূল,
চাতক তোমার সাথে যাইতে ব্যাকুল;

২ পূর্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে, গৃহস্থ বিদেশীরা বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিত।

আকাশে বেঁধেছে মালা বলাকার দল,
মনোমত সঙ্গী তব ইহারা সকল।
দেখিবে নিশ্চয় গিয়া প্রেয়সীর স্থানে
দিবস গণনা করি বেঁচে আছে প্রাণে।
কেননা, কুসুম-সম অবলার মন—
আশা বৃন্তে করি ভর না হয় পতন।
মানস-সরসী-বাসী যত হংসকুল
শুনিয়া গর্জন তব হইবে ব্যাকুল,
ছাড়িয়া সকলে আর মানস-জলধি
সহযাত্রী হবে তব কৈলাস অবধি:
অনেক দিনের সখা কৈলাস তোমার,
শ্রীরামের পদচিহ্ন কটিতে যাহার;
গিয়া আলিঙ্গন দিবে তারে যে সময়,
উথলিবে পরস্পর সুখের প্রণয়।
প্রেমাশ্রু ঝরিবে তব নববৃষ্টি-জলে,
বাষ্পের উদ্রেক আর হইবে অচলে।
কোথা কোথা হয়ে যাবে পূর্বে শুন বলি,
গিয়া কি কহিবে, পরে বলিব সকলি।
কোন্ কোন্ নদীর তুলিয়া লবে নীর,
অতিথি হইবে পথে কোন্ বা গিরির,
অনায়াসে পাবে যাতে সকল সন্ধান
কহিতেছি তোমায় করহ অবধান।
এ স্থান হইতে তুমি করিয়ে উত্থান,
উত্তরমুখীন হয়ে করিবে প্রয়াণ।
"একি ঝড়! মা গো মা গো দেখে লাগে ডর,
উড়াইয়া ফেলিল বা গিরির শিখর।"
হেন বলি সিদ্ধা যত চমকিয়া প্রাণে
বারেক দিবেক আঁখি তোমা দেহ পানে

দেখা দিবে তখন সমুখে ইন্দ্রধনু—
নানারত্ন-আভায় শোভয়ে যার তনু ;
ফুটিবে তাহাতে তব রূপের মাধুরী ;
ময়ূর-পুচ্ছেতে যেন শোভয়ে শ্রীহরি।
মালক্ষেত্রে অনন্তর হবে উপনীত,
জল পেয়ে ধরা হবে সৌরভে পূরিত।
পি'বে গো তোমায় আঁখি কৃষক-বধূর—
জানে না বাঁকাতে ভুরু, কিন্তু কি মধুর!
দূরে গিয়া হবে যবে শ্রম-নিমগন
আম্রকূট শিখরীর পাবে দরশন।
দাবাগ্নি থামিবে তার তব বরিষনে,
শিরে করি লইবে তোমায় সে কারণে
চূড়ায় আছহ তুমি শ্যামল-বরণ,
নিম্নদেশ আম্রফলে পাণ্ডু-দরশন।
দেখিবেন দেবগণ পরম কৌতুকে,—
স্তনের উন্মেষ যেন ধরণীর বুকে।
নানাস্থানে নিকুঞ্জ শোভয়ে মনোহর,
বিহার করয়ে যথা নাগরী নাগর।
রেবা নদী দেখিবারে হয় যদি মন,
কিয়ৎ বিশ্রাম করি করিবে গমন।
নদীরে দেখিতে পাবে ক্ষণেকের পর
বিন্ধ্যপদে শোভে যার শীর্ণ কলেবর ;
পাষাণরাশির মাঝে শুভ্র ধারা ঝরে,
মালাছড়া শোভে যেন করি-কলেবরে ;
শাখাপত্রফল-ভরে স্রোত মুখে পড়ি
জামের কানন যত যায় গড়াগড়ি।
চঞ্চুপুটে চাতক লইছে বিন্দু জল,
দেখিছে কিন্নরীগণ, চিত্তে কুতূহল।

সারি গাঁথি বকগুলি যাইছে উড়িয়া,
তাহাদেরে একে একে দেখিছে গুণিয়া,
ছাড়িবে এমনি বেলা ধ্বনি একবার,
থমকিবে দিক্ যত ধমকে তাহার।
অমনি কিন্নরী সবে সারা হয়ে ত্রাসে
আঁকড়িয়া ধরিবে যে যারে ভালবাসে।
সংকল্প যদিও তব সত্বর গমন,
দেখিতেছি তবু কাল-বিলম্ব-কারণ।
গিরিরাজি রহে সাজি নানাবর্ণ ফুলে,
নড়িতে না চাবে তুমি সুগন্ধেতে ভুলে।
ময়ূরেরা ডাকিতে ডাকিতে কেকারবে
অগ্রে আসি দাঁড়াইলে, গা তুলিবে তবে।
আগু বাড়াইয়া দিবে তাহারা তোমায়,
তখন গিরির কাছে হইবে বিদায়।
উত্তরিবে যবে তুমি দশার্ণয় গিয়া,
সৌরভে পূরিবে বন কেতক ফুটিয়া।
বড় বড় বৃক্ষ যত পল্লবে নিবিড়,
দেখা দিবে সমুদয়ে বায়সের নীড়।
পাকিয়া উঠিয়া আর যত জম্বু ফলে
শ্যাম শোভা ধরাইবে বনান্ত সকলে।
দেখিয়া তোমার এবে মনোরম ঘটা,
কিছু দিন রবে হেথা হংস যত কটা।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বিদিশা রাজধানী,
কি কব তাহার আমি অপূর্ব বাখানি—
বেত্রবতী নদী তথা অপরূপ শোভে,
মাতিবে দেখিছি তুমি পড়ি তার লোভে।
তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গে সাজে জলময় মুখ,
চুম্বি তারে তোমার কত-না হবে সুখ!

শর-শর শব্দ হয় তীরদেশে তার,
কামিনী প্রকাশে যেন মনের বিকার।
গিরি এক আছে তথা; নীচ তার নাম
তদুপরি ক্ষণকাল করিবে বিশ্রাম।
গিরির কদম্ব যত হবে বিকশিত—
তোমায় পাইয়া যেন পুলকে পূরিত।
জুঁয়ের কানন যত দেখিবে তথায়,
শীতল করিয়ো সবে বৃষ্টি দিয়া গায়।
মালিনী বেড়ায় কত ফুল তুলে তুলে
কর্ণে গোঁজা পদ্মফুল পড়ে ঢুলে ঢুলে।
রবি-তাপে তারা অতি হইবে আতুর,
তুমি গিয়া ছায়া দিয়া কর তাহা দূর।
যদিও পথের ফেরে পড় বৃথা দায়ে,
উজ্জয়িনী যাইতে লয়ো না কিছু গায়ে।
পৌরাঙ্গনা সেথা যত শীঘ্র সবাকার
চমক খাইবে আঁখি তড়িতে তোমার।
সেসব আঁখির ঠারে না মজিলে যদি
বঞ্চিত হইলে বড় জীবন অবধি।
নির্বিন্ধ্যা নদীর স্থানে গিয়া অতঃপর
সুখরস আস্বাদিতে পাবে বহুতর।
পরিধান বস্ত্র তার খসে স্রোত-ছলে,
হংসমালা চন্দ্রহার কিবা বোল বলে,
নাভি তার ঘূর্ণাজলে রহে প্রকটিত
দেখাইবে হায় ভাব কতই সরিত।
যেহেতু জানিও স্থির নারী সবাকার
প্রথম প্রণয়—ভাষ বিভ্রম বিকার।
যাইবে তাহার পর সিন্ধু নদী কাছে,
সূক্ষ্ম জলধার হয়ে বেণী যার আছে;

জীর্ণ লতাপাতা সব হইয়া পতন
দেহ আর হইয়াছে পাণ্ডুর বরণ।
বিরহের অনুরূপ এসব লক্ষণ
দেখাইতে সে তোমায় করিবে যতন।
অবন্তী হইয়া যাবে উজ্জয়িনী পুরী,
বর্ণনে যাহার পুরে কাব্য ভূরি ভূরি।
স্বর্গবাসী কেহ যেন শেষ পুণ্য বলে
স্বর্গখণ্ড আনি এক রেখেছে ভূতলে।
শিপ্রার বাতাস পেয়ে সারসেরা সব
ছাড়িবে মত্ততাবশে পটু উচ্চরব।
পদ্মের সৌরভ আর আনি সে পবন,
কামিনীর দেহজ্বালা করিবে হরণ!
কিবা মনোহর সাজে অট্টালিকা সব
ঘরময় ব্যাপি রয় ফুলের সৌরভ।
কামিনীর পায়ের আলতার রাঙা দাগ
স্থানে স্থানে শোভে যেন অরুণের রাগ।
এসব সুন্দর স্থানে শ্রম কোরো দূর,
তোমা পানে লক্ষ্য করি নাচিবে ময়ূর।
গবাক্ষ হইতে উঠি মাতাঘসা চূর
মিশিবে তোমার গায়ে প্রচুর প্রচুর।
অনন্তর যাবে তুমি শঙ্করের ধাম,
পুণ্যলাভ হেতু যদি থাকে মনস্কাম;
শোভে তার চারি পার্শ্ব উদ্যান-কাননে,
হেরিতেছে তরুগণ সুগন্ধ পবনে!
প্রভুর কণ্ঠের আভা তব কলেবরে,
ভূতগণ সে কারণ দেখিবে সাদরে।
দেবপ্রভু মহাকাল আছেন সেখানে,
যাবে তুমি একবার তাঁর বিদ্যমানে।

যাবত তপন দেব না যান সরিয়া,
তাবৎ থাকিবে তুমি ধৈরজ ধরিয়া !
অতঃপর সন্ধ্যা পূজা হলে উপনীত,
গর্জনে করিবে সিদ্ধ বাদ্য মনোনীত।
চামর হেলায় তাঁরে বেশ্যা যত যুটি,
ক্ষণে ক্ষণে নূপুরের উঠে বোল ফুটি।
নখক্ষতে তারা সবে পেয়ে বৃষ্টিজল,
ছাড়িবে তোমার পানে কটাক্ষ তরল।
সন্ধ্যারাগে ঘুচি তব দেহের কালিমা
হইবে জবার মত লোহিত প্রতিমা।
বিরাজ করিবে ইথে আকাশ উপর,
নৃত্যে মাতিবেন যবে দেব মহেশ্বর।
রক্তমাখা হস্তি-ছাল তাঁর বড় প্রিয়,
মিটাইয়া হেন সাধ তুমি দেখা দিয়ো।
ভবানী কিঞ্চিৎ তাহে হৃদে ত্রাস পেয়ে,
দেখিবেন একদৃষ্টে তোমা পানে চেয়ে।
পথঘাট ঢাকা দিবে যবে অন্ধকার—
সূচেতে বুঝি-বা বিঁধে এমনি আকার,
যাইবে কামিনীগণ প্রিয়-নিকেতনে,
তাদেরে দিয়ো না ত্রাস ভীষণ গর্জনে।
পাথরে সোনার ঘসা দেখিতে যেমন
বিদ্যুতের আলো দিবে তেমনি মতন।
সে রাত্রি কোথাও কোনো অট্টালিকা-ছাতে
যাপন করিবে সুখে তড়িতের সাথে।
খেলাইয়া খেলাইয়া সারাটি রজনী
সারা হবে তোমার চপলা সুবদনী !
ভানু শেষে দেখা দিবে আকাশে যখন,
বিলম্ব না করি আর করিবে গমন।

হেনকালে খণ্ডিতা কামিনী সবাকার
প্রিয়েরা পুঁছিয়া দিবে নেত্রবারিধার।
অতএব, তপনের পথ এ সময়
আটক কোরো না যেন হইয়া নির্দয়।
যে নলিনী সারারাত হতেছিল সারা
বরষিয়া ক্রমাগত শিশিরাশ্রু-ধারা,
খুলি তার দলময় মুখের ঘোমটা,
স্বকরে পুঁছিবে রবি যত অশ্রু-ফোঁটা।
এ সময়ে যদি তার করো কর-রোধ,
সামান্য হবে না তবে তোমা 'পরে ক্রোধ।
প্রসন্ন মানসরূপী গম্ভীরার জলে
প্রবিষ্ট হইবে পরে প্রতিবিম্ব ছলে—
সফরী খেলিছে তথা সদাই চঞ্চল,
নদীর জানিবে তাহা দৃষ্টি নিরমল।
বৃষ্টিজলে উচ্ছ্বসিত ক্ষিতির সৌরভে
সুশীতল সমীরণ পরিপূর্ণ হবে।
শীতল বাতাস পেয়ে অমনি সত্বর
পাকিয়া উঠিবে যত কানন ডুম্বর।
দেবগিরি যাইবারে সাজিবে যখন,
তোমায় সে শীত বায়ু করিবে ব্যজন
তথা গিয়া স্কন্দদেবে দেখিয়া সাক্ষাৎ
মস্তকে করিবে তাঁর পুষ্পবৃষ্টিপাত।
দেবসৈন্য ভয়শূন্য তাঁহারি রক্ষণে,
বিলসে প্রতাপ তাঁর জিনিয়া তপনে।
গিরি 'পরে দ্বিগুণ হইবে তব নাদ,
ময়ুর নাচিবে তায় পাইয়া আহ্লাদ;
পুচ্ছখণ্ড লয়ে যার উমা মৃদু হাসি
কর্ণেতে রাখেন সদা পুত্রে ভালবাসি।

কার্তিকেয় দেবতার করি আরাধন,
তদুত্তর যাইবে গোমতী-নিকেতন।
জল লাগি বীণা-তন্ত্রী পাছে হয় শ্লথ,
সিদ্ধ দ্বন্দ্ব[৩] তোমায় ছাড়িয়া দিবে পথ।
প্রতিমা পড়িলে তব গোমতীর জলে
গন্ধর্বে দেখিবে শোভা দিব্য কুতূহলে।
নদীরে দেখিবে তারা, যেন মুক্তাহার,
ইন্দ্রনীল-মণি তুমি মধ্যদেশে তার।
হেতা হতে যাবে যবে হইয়া বিদায়
দশপুর বধূগণ দেখিবে তোমায়।
ভূরুর ভঙ্গিমা কিবা চাহনি সময়ে,
কৃষ্ণ-সার প্রভা কিব চক্ষে প্রকাশয়ে।
চঞ্চল কুসুমে যথা ঘুরে ফিরে অলি,
নয়নে তেমনি ভাবে শোভে তারাগুলি।
ব্রহ্মাবর্তে অতঃপর হয়ে উপনীত
কুরুক্ষেত্র-দরশনে হবে চমকিত।
কত ক্ষত্রিয়ের মুখে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
হয়েছিল পদ্ম যথা তব ধারাপাতে।
প্রতিবিম্বে পরশিয়া সরস্বতী-জল
বর্ণমাত্রে রবে কালো, অন্তরে নির্মল।
যে হালা-মদের তরে পাগল পরান,
কান্তা সাথে ছাড়ি তাহা এক পাত্রে পান,
পূর্বে বলরামদেব আসি শুষ্ক গলে
মিটাতেন যত সাধ হেন নদীজলে।
কনখল সন্নিধানে দেখিবেক গিয়া
পড়িছেন গঙ্গাদেবী হিমাদ্রি বাহিয়া,

৩ সিদ্ধ নামে একপ্রকার অলৌকিক পুরুষ অনেকানেক কাব্যে উল্লিখিত আছে; ইহারা গন্ধর্ব কিন্নর অপ্সরা প্রভৃতির দলভুক্ত।

গৌরীর ভ্রূকুটি দেখি হাঁসি ফেন-ছলে
উর্মি-হস্ত দেন যিনি শিবের কুন্তলে।
জাহ্নবীতে ছায়া নিজ করিবে নিধান,
যমুনা মিশিল যেন হবে অনুমান।
বিশ্রাম করিবে পরে হিমাদ্রি উপর,
মৃগনাভে সুগন্ধি যাহার পরিসর।
ধবল অটল হিমে শিখর সকলে
সুখে আছে হরিণেরা বসি শিলাতলে।
হেনকালে বায়ু যদি হইয়া প্রবল
সরল তরুর কাঁধে জ্বালায় অনল,
দাবানলে গিরি হবে যন্ত্রণায় সারা,
ঘুচাইও তুমি তাহা ত্যজি বারিধারা।
পরদুঃখ যাহাতে না হয় প্রশমন
এমন সম্পদে কিবা আছে প্রয়োজন,
তোমারে দেখিবে যেই সরভ সকল
তাড়াইয়া ধরিবারে প্রকাশিবে বল ;
শিলাবৃষ্টি বরষিয়া খরতর ধারে
ছিন্নভিন্ন করিবে তাদের সবাকারে।
শঙ্করের পদচিহ্ন প্রস্তরে নিহিত
তথাকার একস্থানে আছে প্রকাশিত।
দেখিবা মাত্রেতে হয় পাপ তার ক্ষয়,
পরিণামে মুক্তিলাভ নাহিক সংশয়
গিয়া তথা ভক্তিভরে হইয়া প্রণত
প্রদক্ষিণ কোরো যেন তারে বিধিমত।
বংশে বংশে পবন ফুকরে মনোহর,
ত্রিপুরবিজয় গায় মাতিয়া কিন্নর।
মৃদঙ্গ সমান তাহে তোমার বিরাব,
সংগীতের কোন অঙ্গ হবে না অভাব।

অনন্তর ঊর্ধ্ব দিকে হইয়া উত্থিত
কৈলাস গিরির তুমি হইবে অতিথ।
যার প্রস্থ সমুদয় রাবণের বলে
ভাঙিয়া খসিয়া সব রহে মূল স্থলে;
তুষারে অম্লান শোভে চূড়া শত শত,
মুখ দেখে তদুপরি বিদ্যাধরী যত।
শোভা আর পাইতেছে শুভ্র হিমরাশি,
রাশীকৃত রহে হেন শঙ্করের হাসি।
তুষারে তোমার দেহ পাইবে প্রকাশ,
বলরাম-স্কন্ধে যেন কালো-বর্ণ বাস।
কণ্ঠেতে শিবের হাত, সর্প এবে নাই,
পায়চালি করিবেন গৌরী হেন ঠাঁই।
সোপান রূপেতে তুমি থাকিবে সামনে,
অন্তরের জলরাশি রাখিয়া দমনে।
বালার হীরায় তব অঙ্গে করি ক্ষত,
জল-যন্ত্র বিরচিবে দেবকন্যা যত।
জল দিতে তুমি যদি হও অনিচ্ছুক
গর্জন ছাড়িবে এক রাঙাইয়া মুখ:
অমনি খেলায় মত্ত দেবাঙ্গনা যত
অসঙ্গত পেয়ে ভয় হৈবে থত-মত।
ত্রিভুবনে নাহি স্থান কৈলাস সমান,
নানা লীলা সহকারে কোরো অধিষ্ঠান।
মানস-সরসী হতে কভু লবে জল,
ফুটিয়া আছয়ে যথা সোনার কমল।
ঐরাবত-মুখে কভু হবে পট্টবাস
কল্পতরু 'পরে কভু দিবেক বাতাস।
কৈলাস গিরির কোলে প্রণয়িনী সমা
শোভয়ে অলকাপুরী ;—নাহিক উপমা;

গঙ্গা তার পরুন শাড়ীর শোভা ধরে,
খসিয়া প'ড়েছে যেন সুখ-রস-ভরে।
তোমা সম জলধর কতই সেথায়,
অপরূপ শোভা করে হর্ম্যেরে মাথায়।
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল পলকে পলকে,
মুকুতা ঝলকে যেন কামিনী-অলকে।

পূর্বমেঘ সমাপ্ত

আগামী সংখ্যায় উত্তরমেঘ

'সম্পাদকের কথা' দ্রষ্টব্য

সায়ন্তন•

অরবিন্দ গুহ

নদী দেখো। নদীতে মেঘের ছায়া ফোটাও, ভাসাও।
যাও, তুমি দ্রুত চলে যাও।
মেঘ আনতে পারো না? তাহলে তুমি নদীর গভীরে
নিজেই উদার ছায়া হয়ে শুয়ে থাকো সশরীরে।

না, আমি নদীতে নিজে থাকি না। তোমাকে
কিন্তু আমি নদীর আশ্রয়ে থাকতে বলি।
জলের সংসার থেকে যে তোমাকে নিরন্তর ডাকে,
সে আমার ভালোবাসা, হৃদয়ের রক্তের কাকলি।

প্রতি রাত্রে চোখে পড়ে নক্ষত্রের সকরুণ ভাষা;
নদীর হৃদয়ে ক্ষুধা, শরীরে পিপাসা।
ঝিনুক, কয়েকটি নৌকো, স্টিমারের বাঁশি, মাছ, বালি;
চিরকাল দুই তটে শিশুরা বাজায় করতালি।
সমুদ্রে নদীর গতাগতি;
এবং আমার প্রেম জানে তার নদীতে বসতি।

মেঘ আনতে পারো না? তাহলে তুমি নদীর গভীরে
নিজেই উদার ছায়া হয়ে শুয়ে থাকো সশরীরে।

উপমা

ফণিভূষণ আচার্য

তোমার অনেক আছে, হে সুন্দরীতমা
দুর্লভ ঐশ্বর্য বহু। দুটি চোখ থেকে একটু নীলাকাশ
দিতে পারো নাকি
তোমাকে সাজাবো বসে খুঁজি তাই তোমারই উপমা
পারবে না তুলে দিতে তোমার সুযোগ্যতম উপমার
একটি কণা কি ?

তাই দাও। আমি কালবৈশাখীর ঝড় থেকে ছিঁড়ে
বিদ্যুতের জরি আনি, তুমি খুলে দাও কালো চুল,
অন্ধকারে ঝরে পড়ে মুঠো মুঠো নক্ষত্রের হীরে
ফাল্গুন শরীরে মেখে ভালোবেসে তুমি হও রোমাঞ্চিত
হাওয়ার মুকুল।

সাজাতেও ভয় হয় উপমায় ভেঙে পড়বে বুঝি
নরম রোদের কুঁড়ি হাতে নিয়ে কিশলয়-ভোর
ফিরেছে বিষণ্ণ মুখে, দুপুরের যত গলিঘুঁজি
শেষ হলে বিকেলের গায়ে ঝরে ঝরে পড়বে সায়াহ্নের
হাওয়ার আদর।

তোমাকে সাজাবো কিসে ? না, আমার কিছুই যে নেই
তার চেয়ে দিতে পারো এক টুক্‌রো নীলাকাশ, হে সুন্দরীতমা,
পৃথিবীর অলিগলি ঘুরে আমি ফিরে আসি তোমার চোখেই
সেই দুঃখে জলবো, নিববো। অন্য কোথা পাবো আর ?
তুমিই যে তোমার উপমা।

আষাঢ় ১৩৬৭

একটি সংলাপ

অরুণ ভট্টাচার্য

কে টানছে প্রবল স্রোতে, স্বচ্ছতোয়া সুচারু দর্পণে
মুখ দেখবে বারংবার। মাছেদের নবীন সংসারে
দু দণ্ডের রাজ্যপাট, অপর্যাপ্ত খুশির আলোক।

প্রেমিক তখন তার সুখী দিনগুলির স্মরণে
যুবতীকে অসংলগ্ন ক'টি কথা বলল গোপনে—
'একদিন তুমি আমি বিড়ম্বিত উজ্জ্বল প্রাসাদে
উৎসাহে, বিকল্প প্রেমে মুহ্যমান থেকেছি কেবলি।
স্বর্ণ দিয়ে কারুকার্য, সুগভীর দীঘিকা, সোপান,
রাজহংস, গাঙচিল—সেই হর্ম্য-দৃশ্যের ভিতর
দু ধারে আমলকী-বন'—

অকস্মাৎ সভয়ে যুবতী
জাপটে ধরল ছেলেটিকে, 'বোলো না প্রাক্তন কথা না না,
আমি আছি নষ্টনীড়ে, উৎসাহী উজ্জ্বল স্মৃতিটুকু
ভুলে থাকতে চাই, সুস্থ, বিবেকের নির্মম ইঙ্গিত,
আমাকে উন্মনা করলে দূরতর সুবর্ণ প্রাসাদ
নিরানন্দ অঙ্গীকারে ভস্ম হবে ; প্রগল্‌ভ ভয়
দুঃখের বিচিত্র হাসি হাসবে বলে নির্মল প্রত্যয়ে
কাছে দেখবে গুহাচিত্র। না না, আমি প্রাক্তন স্মৃতিতে
কখনো বিশ্বাসী নই।'

এই বলে মেয়েটি চকিতে
তাকাল অস্পষ্ট দূরে। ঘণ্টা বাজল নিকটে, গির্জায়।

এবং অবাধ্য হাওয়া যূথচারী মাছের মতন
ঘিরে বসল দুজনাকে। সামনে জল, স্বচ্ছতোয়া নদী,
নৌকার গলুই, পাশে দাঁড়, মাঝি সন্ধ্যায় প্রস্তুত,
পাড়ি দেবে অন্য গাঙে।

ছেলেটি ভাবল দিনক্ষণ

অপর্যাপ্ত স্মৃতি, ভয়, সামনে উন্মুখ জলপথ—
কি করবে, মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত, রমণীর বুক,
স্নেহ শান্তি নিরাময়, ঘরে ফিরলে দু দণ্ডের খুশি।

এপারে নৌকার শব্দ, চ্ছলচ্ছল একটানা স্বরে
দুষ্ট হাওয়া, অস্থিরতা। কি করবে কি হবে

ভেবে তারা

নক্ষত্রের নীচে বসে নিরানন্দ মাটিকে দেখবে।
মেয়েটির দুই চোখে মেঘবর্ণ প্রাসাদের রূপ
এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল, ভয় স্মৃতি দুঃখ বা চেতনা—
কাকে ফেলে কাকে রাখি—এ সংশয় তখনো কুণ্ঠিত।

'তুমি তবে সুখী হাওয়া', অসংকোচে শুধাল ছেলেটি,
'আর তুমি দুঃখী জল', চ্ছলচ্ছল শব্দের ভিতর
কয়েকটি ভীত শব্দ উচ্চারণ করল মেয়েটি।

আষাঢ় ১৩৬৭

ওগো কানন

মানস রায়চৌধুরী

কণ্ঠস্বর ছিটিয়ে যায় সন্ধ্যাবেলা বনতলের হাওয়া
ছদ্মবেশী দেবদূতের আসা যাওয়ার মৃদু
তরঙ্গের চূর্ণজল কপালে মাঝে মাঝে
অথবা পাশে হেঁটে যাবার সময় বসনের
কোমলতার স্পর্শ লাগে অতর্কিত

ওগো তমাল, বলো-না কোন্ অন্ধকারে বিদ্যুতের
করুণ রেখা মেঘশিখরে রেখেছ প্রচ্ছন্ন ?

অনুত্তর অরণ্যের হাওয়া, সরল সিন্ধুগাছের নিচে
নিগূঢ় সব জটিলতার শিকড়। ক্ষতরেখা
আঁকছে ধীর জলবায়ুর ফলা
তারার ঠোঁটে প্রাজ্ঞ ভাষা, অধরা চাপা গলা
বলে বধির গ্রহের কানে ভবিষ্যৎ-বাণী।

ওগো কানন, বলো-না কোন্ ভালোবাসা
রক্তভর যন্ত্রণার প্রসূনে রাখো লীন ?

ডিভাইন কমেডি পড়ে দান্তেকে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

যৌবনোদ্ধ তনু তার ; একটি নিটোল হাতে নির্বিষাক্ত ধূল
হয়তো সে ফুল হয়ে উঠবে বা উঠেছে কখনো
আমরা কি জানব তাকে, জানতে পেরেছি তার কোনো
ইতিহাস ? জীবন কি যৌবনের ভুল
কখনো জেনেছে !—হায় দান্তে, তুমি দশম স্বর্গের
কল্পনায় ক্লান্ত হয়ে বিয়াত্রিচকে ব্যথার সোপানে
সমর্পিত করে গেছ ! জীবনের মগ্ন অন্ধকার
তুমি কি, তোমাকে এসে কোনোদিন কান্নার অতল জলের
কোনো শব্দ শোনায় নি !—বুক অব সাম্‌স-এর গানে
তা হলে কি সব-কিছু শান্ত হতে পারে ?—এক নির্লিপ্ত প্রসার
হয়তো জীবনবোধে উদ্দীপ্ত এ সমুদ্রকে করেছে শাসন,
হয়তো লবণজলে মাঝেমাঝে মুক্তোর জন্ম হতে পারে,
হয়তো শঙ্খের বুকে শোনা যাবে স্বপ্ন, শব্দ ; শুক্তির হৃদয়ে
হয়তো থাকবে আঁকা বর্ণালির চিত্রিত চরণ।

তবু তা কি শেষ সত্য ?—বিয়াত্রিচকে নিয়ে যে ব্যথা
জীবনের সমুদ্রের দুরন্ত এপারে
উদ্দীপিত হয়ে ওঠে ; অনেক ওপার থেকে বলো তো নির্ভয়ে
কে কবি, মহৎশিল্পী !—তুমি কি অজস্র শান্তি
পেতে পার, পেয়েছ কি ; প্রেমে ও অপ্রেমে
কোনো দিন শোনোনি কি হৃদয়ের রক্তের নাচন ?
ভোরের নির্জন সেতু— জানে সে অস্পষ্ট ইতিহাস,
আবেগের অস্তসূর্য—কোনো ক্লান্ত কুয়াশায়
শিশিরে— হাওয়ার হাতে গিয়েছে কি থেমে ?

আমরা কখনো এক স্বর্গীয় স্বপ্নের অধিকারী
দেবদূতের সহচর হতে পারি, হৃদয়ের অন্তর্লীন
সমস্ত স্বপ্নের নিহিত বিকাশ
আমাদের অপার্থিব করে দিতে পারে! তবু আমরা কি জেনেছি
আমরা যারা তীক্ষ্ণ সূর্যে—আলো ছুঁয়ে—জল মেখে—
ধুলো ঘেঁটে—প্রত্যহের পূর্ণ পথচারী
মাটির মুহূর্তশিশু।—আমরা কি আমাদের সন্নিহিত মুখ
জলের আয়নায় দেখে এইসব মুহূর্তকে ধ্যানে পেতে পারি?
পেলেও প্রবাসে প্রশ্নে আরো নানা অন্ধকারে যখনি হেঁটেছি
দেখেছি হারিয়ে গেছে সেইসব সত্য-স্বপ্ন, শক্তির উচ্চার
অভাব আশঙ্কা ভয়—জন্ম আর জীবতায়; জীবনই যে জন্মের
অসুখ॥

আর-এক নির্ভীক

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

তবু সব ক'টি ফুল টেবিলে সাজিয়ে
এখনো রেখেছি আমি। হাওয়ারা ফুঁ দিয়ে
নিয়ে যায় চোখের আড়ালে।

তোমারি কল্পনা
বিশ্বাসে মুখর স্মৃতি, হাওয়া রেখে যায় কী মন্ত্রণা!

হয়তো পড়বে মনে কবে এই ফুল
সুরভিত হয়েছিল। আপন গৌরবে স্নিগ্ধ। হৃদয়ে গভীর ক্ষত;
তিলে তিলে দৃঢ় হয়; কাঁটা হয়ে বিদ্ধ হয় গভীর শরীরে।
ফুলের পাপড়িগুলি নীল নীল হয়ে যায় ছিঁড়ে।

তবু সব ক'টি ফুল সাজিয়েছে ঘরের চৌদিক,
মুহূর্ত স্মৃতিকে নিয়ে আমি হই আর-এক নির্ভীক।

রূপ ও স্বরূপ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় আছে, সুধীরা কাল কাটান কাব্যালোচনার আনন্দে, আর মূঢ় লোকের ব্যসন নিদ্রাকলহে। আজকের এই গতির যুগে, জনতা-মহারাজের হাটের দরবারে এ কথা সচল কিনা জানি না, তবে কাব্যশাস্ত্র-বিনোদন যে লোকোত্তর আনন্দের সৃষ্টি করে এটা শাশ্বত সত্য। আমাদেরই এক বিশিষ্ট সমালোচক বন্ধু কবির সৃষ্টিকে তুলনা করেছেন প্রজাপতির সৃষ্টির সঙ্গে। এই আনন্দভোগের দুটি রূপ— একটি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে কবির নিজস্ব ভোগ, আত্মআবিষ্কার; আর-একটি বহুকেন্দ্রিক বিতরণ, সকলকে তার ভাগ দেওয়া, আবিষ্কৃত হওয়া। কিন্তু ভাগ দিলেই হয় না, ভাগ নিতে জানতে হয়—তবেই ভোগ হয়। এ জিনিসটি নির্ভর করে দাতার অকৃপণতার মধ্যে নয়, কি জিনিস পরিবেশিত হচ্ছে, ঠিক তার উপরেও নয়, গ্রহীতার মন, তার আত্মসাৎ করার ক্ষমতা, তার পারিপার্শ্বিক, পারম্পর্য ও ঐতিহ্য-প্রবণতার উপরও। কবিতা মানেই সৃষ্টি, সৃষ্টি মানেই নিজেকে ফিরে পাওয়া। সৃষ্টি মানেই দান।

কাব্যামৃতরসাস্বাদের জন্য কবিতার পাঠককে নিজের জগৎ সৃষ্টি করে নিতে হয়—সেখানে সে শুধু দ্রষ্টা বা ভোক্তা নয়, স্রষ্টাও; সেখানে তারও সীমা অসীমকে স্পর্শ করছে। কাব্যের প্রতিষ্ঠা এইখানে। কাব্যকে বলা হয়েছে রসাত্মক বাক্য, এবং ধ্বনিই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। রমণীদেহের লাবণ্যের মতই কাব্যের এই ধ্বনিগুণ। কিন্তু ধ্বনি কি, রস কি, তার আলম্বন তার বিভাব শুধু কবিতাতেই রূপায়িত হয়নি, যুগ যুগ ধরে দেশদেশান্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক হয়েছে, নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। শুধু রস-প্রস্থান, অলংকার-প্রস্থান, গুণ ও রীতি -প্রস্থান, ধ্বনি-প্রস্থান, বক্রোক্তি-প্রস্থান নিয়েই আলোচনা হয় নি, রসশাস্ত্রকে দর্শনের সিদ্ধ দশ দশাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেই ভরত ভামহ উদ্ভট রুদ্রট দণ্ডী বামন আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্ত কুন্তক বৈষ্ণবাচার্যরা তো আছেনই, ইউরোপেও নন্দনতত্ত্ব poetics ও rhetoric -এর মাধ্যমে কাব্যের রহস্য রূপক ও অলংকরণের বিবিধ ব্যাখ্যা হয়েছে। কাব্য বাচ্যবস্তুর কথাই বলবে, না, ব্যঙ্গ্যার্থের, না, শব্দার্থশাসন জ্ঞান-মাত্রার।

স্বভাবোক্তিকেও কাব্যে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অলংকার তো উপলক্ষ্য মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি—"সুন্দরের বোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য এ কথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয়, তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোঁকা লাগায়, ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে। পাড়ায় মদের দোকান আছে, সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায় ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের বাসিন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকে সুধাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দোবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজ মাত্র দেন নি—অথচ শুড়ির দোকানে হয়তো তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি—কেননা আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যতদূরে, ইন্দ্রলোকের সুধাপান-সভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষপরিচয়ের হিসাবে। আমার বলবার কথা এই যে, লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণি-স্পর্শে মদের আড্ডা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, সুধাপান-সভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই।" সাহিত্যের মূল্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথাও বললেন যে রসের পাত্রে যে বস্তুটি আছে তাকে কাব্যলোকে উন্নীত করতে হলে জীবনের স্বাক্ষর কিন্তু চাই। উদাহরণ স্বরূপ বললেন, " 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে 'তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রং আছে উজ্জ্বলি, সে রং দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি' এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই।" এ কথা হয়তো অনেকে মেনে নেবেন না, যেমন স্বীকার করবেন না যে কালিদাসের কুমারসম্ভবে হিমালয়বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে রূপের সত্যতা নেই, শুধু ধ্বনির মর্যাদা আছে।

কাব্যে এক দিকে থাকবে প্রসাধনের বৈচিত্র্য আর-এক দিকে থাকবে উপলব্ধির নিবিড়তা। এই দুই মিলিয়েই রস। সাহিত্য তাই শুধু রূপসৃষ্টি নয়, সঙ্গেসঙ্গে রসসৃষ্টিও।

সবশেষের সিদ্ধান্তে রস হচ্ছে অ-লৌকিক। ভরত অবশ্য বলবেন বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগেই রসের নিষ্পত্তি। কিন্তু রস হচ্ছে উপলব্ধির গভীরতায়, প্রতীতির প্রতিলিখনে—কবির ও পাঠকের দুজনেরই

চিত্তলোকের আলোকে। তাই একজন সমালোচক ব্যবস্থা দিলেন যে রসানুভূতির ক্ষেত্র একটু দূরে, psychical distanceএর নির্লিপ্ততায়।

বাল্মীকি ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির হত্যায় যে শোক পেয়েছিলেন সেই হচ্ছে তাঁর কাব্যের উৎস। তাঁর শোক যেটি মরে গেছে তার জন্য নয়, যেটি বেঁচে আছে তার জন্য।

উপমা ব্যঞ্জনা বাক্যালংকার বস্তুধ্বনি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিরা কাব্যরচনা করেন। কাব্যের বিচারে তার শরীর, তার অলংকার, তার দোষ, তার ন্যায়নির্ণয়, তার শব্দশুদ্ধি এসবের মূল্য নিশ্চয়ই আছে। আলংকারিক ভামহ সেই কথাই বললেন, কিন্তু সব ছাড়িয়ে, সব মিলিয়ে কাব্যে একটি সমগ্রতার রূপও আছে যা বিশ্লেষণের অতিরিক্ত রসায়নবিদগ্ধস্বরূপ, সেইখানেই কবির সার্থকতা। এই রসায়নের মূলে আছে কাব্যপ্রস্থানের নিয়মকানুন নয়, অনুভূতির একটা integral ছন্দ, শব্দনির্ভর সৌষম্য 'হৃদিপ্রতীষ্যা'।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সতীন্দ্র ভৌমিক

আজ থেকে এক শ একুশ বৎসর পূর্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের মত দ্বিজেন্দ্রনাথও প্রায় স্বশিক্ষিত। বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন 'ইস্কুল-কলেজের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প'। অল্প হলেও বাড়িতে তিনি সর্বদা অধ্যয়ন নিয়েই থাকতেন। বাল্যকালেই মুগ্ধবোধ-চর্চা সমাপ্ত করে কালিদাস-পাঠ শুরু করেন। অবশ্য এতে তাঁর সংস্কৃতপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বলে সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না— তখন ছোটদের পড়বার মত উপযুক্ত বাংলা গ্রন্থের অসদ্ভাবই তাঁর সংস্কৃতানুরাগের মূল কারণ। যদিও সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল থেকে স্কলারশিপ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, কিন্তু কলেজীয় নিয়মপদ্ধতি মেনে পড়াশুনা করবার মত পিঞ্জরাবদ্ধ মন তাঁর ছিল না। ফলে তিনি কলেজ ছেড়ে দিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা বিচিত্রমুখী। তিনি ত্রিশ খানিরও অধিক বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনুবাদ মৌলিক এবং ইংরেজি—সবরকম রচনাই তিনি করেছেন। ছাত্রাবস্থায় দ্বিজেন্দ্রনাথ trigonometry এবং mensuration করতে ভালোবাসতেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি যখন Geometry in which the 12th axiom has been replaced by new ones রচনা করলেন তখন সেই বইয়ের উপর প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক Rees (Sutcliffe) বলতে বাধ্য হন This man has brains। যাঁকে আমরা দার্শনিক এবং স্বপ্নপ্রয়াণের কবি বলে জানি তাঁকে যখন চিত্রাঙ্কন করতে দেখি কিংবা কাগজের বাক্স তৈরি সম্পর্কে Boxometry রচনায় মশগুল দেখি তখন আশ্চর্য হতে হয়।

তবু আমরা তাঁকে কবি হিসাবেই স্মরণ করি। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন, 'আগে বরাবর আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম'। এই 'বরাবরে'র জন্যই শেষ পর্যন্ত দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি দ্বিজেন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছেন। আমরা সব অধুনা অলস-রসপিপাসু, তাই এক শত বৎসর পিছিয়ে

গিয়ে রসসন্ধানে প্রবৃত্ত হই না, ফলে দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাদের নিকট কলাকুশলী রূপে পরিচিত না হয়ে শুধুমাত্র নামে পরিচিত আছেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। ঈশ্বর গুপ্তের মত তীব্র স্বদেশপ্রীতি তাঁর ছিল না, বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরের প্রতি তিনি কখনো আকর্ষণ অনুভব করেন নি। তবে তিনি একসময়ে প্রসঙ্গান্তরে বলতে গিয়ে লিখছেন, 'মোটামুটি বলিতে পারি এই যে, Huxley, Mill প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর পরিবর্তে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক সার উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে'। আবার তিনি ইঙ্গ-বঙ্গ মিশেল patriotismও পছন্দ করতেন না। তিনি বলছেন, 'রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism-এর বারো আনা বিলাতি, চার আনা দেশি'। দ্বিজেন্দ্রনাথ অপরের মত নন, নিজের দেশের মাটিতে গড়া patriot ছিলেন তিনি। তাই দেখি স্বদেশী মেলা -প্রতিষ্ঠায় তাঁর অনলস প্রচেষ্টা, অসীম উদ্যম। ঠাকুর-পরিবারের 'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামক বার্ষিক সাহিত্যসম্মিলনেও তাই দ্বিজেন্দ্রনাথকে অগ্রণী হিসেবে পাই।

স্বদেশী মেলাতেই সর্বপ্রথম স্বদেশী গানের প্রচলন শুরু হয়। এবং এই উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' জাতীয় সংগীতের উদ্ভব হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। শোনা যায়, পূর্বে কোনো ব্রহ্মসংগীতই স্বরলিপির সাহায্যে গাত হত না, তিনিই ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি প্রচলন করে বাংলায় সর্বপ্রথম স্বরলিপি প্রবর্তন করেন। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসেবে তিনি প্রথম সংখ্যায় যে ভূমিকার অবতারণা করেছিলেন আজও সাহিত্যজগৎ তার সৌরভে সুবাসিত। অবশ্য, ভারতীতে তিনি বেশির ভাগই দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতী পত্রিকার পর তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক মনোনীত হন এবং সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল এই দুরূহ কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া সাপ্তাহিক হিতবাদীর মূলেও তিনি ছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন জাত-সম্পাদক, অক্লান্ত ছিল তাঁর মননশীলতা, অক্ষয় ছিল তার রস-উৎস। উপরন্তু ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্যসম্মিলন প্রভৃতি সভাসমিতির তিনি কখনো ছিলেন সভাপতি,

কখনো সহ-সভাপতি। এমনিভাবে তিনি সারা জীবনব্যাপী যুগ-পরিবেশের সঙ্গে সাহিত্যের সেতু গেঁথেই গিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা করতেন। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করে সাহিত্যিক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেন। স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন একদিন হাইকোর্টের ভিতর সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন, 'আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালায় ভালো কবিতা রচিত হতে পারে না; মেঘদূত পড়ে দেখছি সে ধারণা ভুল'। বিশ বৎসরের তরুণ কবির পক্ষে এ বড় কম প্রশংসা নয়। দ্বিজেন্দ্র-যুগে ঈশ্বর গুপ্ত সশিষ্য এবং সগৌরবে বাংলাসাহিত্যে বিচরণ করছেন কিন্তু গুপ্ত-ঢঙে প্রভাবিত না হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই সময়ে সংস্কৃত ছন্দানুসারে নবভাবের কাব্যরচনা করলেন, তাই তখনকার পাঠকবর্গ কাব্যজগতের একঘেযেমি থেকে মুক্ত হয়ে সাদরে আবাহন জানাল দ্বিজেন্দ্রনাথকে। ১৮৭৫ সনে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর রূপককাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রকাশ করেন এবং তখন থেকেই তিনি বাংলার সাহিত্যজগতে অন্যতম কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যদিও সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত এ কাব্যগ্রন্থ তেমন প্রচারলাভ করে নি। নিরবধি কাল পড়ে আছে, এ ক্ষণিকের উপেক্ষায় হয়তো স্বপ্নপ্রয়াণের কিছু এসে যাবে না। কারণ যথার্থ সাহিত্য কালের সীমা মেনে চলে না, ডিঙিয়েই চলে। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথা'য় তাই দুঃখ করে বলেছেন, 'আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে! কিন্তু অত originality, অমন রচনাসৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই।' এমনকি কৃষ্ণকমল স্বপ্নপ্রয়াণের কবিকে শেলির সঙ্গে তুলনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। আজকালকার বুদ্ধিমান পাঠক আমরা স্বদেশের তরঙ্গকে তুচ্ছ করে বিদেশীর ফেনপুঞ্জতেই তুষ্ট থাকি। 'ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা' কবিতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পির্‌হনে মান রয় না।

বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিং করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।

শেষোক্ত ছত্রদ্বয়ে ঈশ্বর গুপ্তের 'বিবিজান চলে যান লবেজান চালে'র প্রভাব থাকলেও, এ শুধুমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুক নয়, এই ছড়াতে তিনি যে সে-যুগের ইয়ংবেঙ্গলদের ব্যক্তিত্বহীন অনুকরণপ্রিয়তাকে মনে-প্রাণে সমর্থন করতে পারেন নি তারই বহিঃপ্রকাশ উজ্জ্বলরূপে ব্যক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি নিছক কৌতুকরসের অনেক ছড়া রচনা করে গেছেন। 'দীন দ্বিজের রাজদর্শন না ঘটিবার কারণ' তিনি বর্ণনা করেছেন—

টঙ্কাদেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোনো জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিচ্ছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি॥

এই ছত্র কয়টির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিহাসপ্রসন্ন মনের চিত্র স্পষ্ট ফুটেছে। এক কথায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা প্রশংসনীয়, উদ্যম অতুলনীয়। উৎসাহ দুর্মর এবং সৃষ্টি বিচিত্র। ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬ তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর 'অন্তিম বাসনা' থেকে দু-ছত্র এখানে উদ্ধৃত করি—

তুমিও হে ফেলিও এক বিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর।
ফুল তুলি একটি প্রাণপ্রিয়
মোর মাথায় দিও
সাধ মিটায়ো চেয়ো শয়নে মোর॥

এখন চার দিকে শতবর্ষের ভাবনা। রবীন্দ্রশতপূর্তি আসন্ন, এইজন্যে আবহাওয়া শতবর্ষের ভাবনায় যেন শতধা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) তাঁর জন্ম-শতবর্ষ পূরণ করেছেন বছর-কুড়ি আগে। এই আশ্চর্য মানুষটির প্রতিভাও ছিল আশ্চর্যরকম। আমরা ততোধিক আশ্চর্য ভাবে এঁর সম্বন্ধে উদাসীন আছি।

তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম 'মেঘদূত'-অনুবাদ। ১৮৬০ সালে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মশতপূর্তি আমরা স্মরণ করতে পারি নি; তাঁর সাহিত্যকর্মের শতবার্ষিক-পালন উপলক্ষ্যে তাঁর সেই দুষ্প্রাপ্য অনুবাদটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কুড়ি বছর বয়সের এই রচনা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পাদিত 'নবরত্নমালা' (১৩:৪) বইয়ে এই অনুবাদটি সংকলন করে ভূমিকায় বলেছেন, "পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদটি তাঁহার অনেক পূর্বকার তরুণ বয়সের রচনা, সুতরাং বাল্যসুলভ কিছু কিছু অপক্কতা-দোষে জড়িত থাকা সম্ভব। তাহা সত্ত্বেও মূল ভাবব্যঞ্জক এমন সুন্দর অনুবাদ আমাদের সাহিত্যজগতে দুর্লভ।"

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলেবেলা' শীর্ষক স্মৃতিকথায় (বসুধারা ১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ) দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কথা উল্লেখ করে বলেছেন, স্বপ্নপ্রয়াণ "বেরোনোর পর, শুনতে পাওয়া যায়, মাইকেল মধুসূদন বার-লাইব্রেরিতে তাঁর বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন If I have to doff my hat to anyone I shall do that to the poet of *Swapnaprayana*"।

মধুসূদনের মত তেজস্বী কবি কখনো সহজে কারো প্রতিভা স্বীকার করেন নি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদেরও তিনি insect of an hour বলে অভিহিত করেছেন, সেই মধুসূদন স্বীকৃতি দিয়েছিলেম দ্বিজেন্দ্রনাথকে। কিন্তু মধুসূদনের উক্তিটি 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সম্বন্ধে সম্ভব বলে মনে হয় না। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে, গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ১২৮০ সালের শ্রাবণ (১৮৭৩ জুলাই-আগস্ট) সংখ্যা বঙ্গদর্শনে

এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। মধুসূদন এর কিছুদিন আগেই—২৯ জুন ১৮৭৩—লোকান্তরিত হন।

কিন্তু মধুসূদনের স্বীকৃতিটি যে সত্য দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে তা জানা যায়, এবং মধুসূদনের সেই স্বীকৃতি 'মেঘদূতে'র এই অনুবাদ পাঠ করেই। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—"সিপাহী-বিদ্রোহের কিছু পরে আমার 'মেঘদূত' প্রকাশিত হইল।...আমি যখন 'মেঘদূত' লিখি, তখন ও-ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না; ঈশ্বর গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে [সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়] তিনি বলিলেন, 'আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হতে পারে না, মেঘদূত পড়ে দেখছি সে ধারণা ভুল'।"

মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লেখা ত্যাগ করেন নি হয়তো, কিন্তু ইতিপূর্বেই তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনা সমাপ্ত করেছেন, এবং এই সময়ে (১৮৬০) তিনি ব্যাপৃত আছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনার কাজে—মেঘনাদবধকাব্য-রচনায়। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে তখন ঐ কাব্যসম্বন্ধে তাঁর পত্রালাপ চলেছে। সুতরাং মাইকেল সে সময়ে বঙ্গভাষায় কাব্যরচনার প্রতি আগ্রহশীল। এই রকম সময়ে সেই তেজস্বী কবি যে-প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে মাথার টুপি নামাবার কথা বলেছেন, আমরা সেই প্রতিভার বিষয়ে আজ উদাসীন হয়ে আছি। এর জন্যে আমাদের মস্তক যেন নত হয়।

এর পরে মেঘদূতের অনুবাদ আরও অনেকে করেছেন। সেসব অনুবাদের পাশে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই অনুবাদ রেখে পড়া যেতে পারে। অনুবাদ জিনিসটা কেবল ভাষান্তর হলে তাকে অনুবাদ বলা সম্ভব নয়; তার উপর, মূল রচনার ও রচয়িতার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাও যেমন দরকার, মূল ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও ততোধিক দরকার। এই দুইটি অপরিহার্য বিষয় পরিহার করে অনুবাদের কাজে হাত দিতে নেই। কিন্তু এ নিয়ম অমান্য ক'রে মেঘদূতকে নিয়ে প্রহসন যে না হয়েছে এমন নয়। তার জন্যে আমরা দুঃখিত।

সুশীল রায়

রবীন্দ্রনাথ-সহ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রের ব্লক বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

পতী

অনুবাদ

কালিদাসের মেঘদূত

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত সংখ্যার অনুবৃত্তি

উত্তরমেঘ

অট্টালিকা কত শত সাজিয়াছে তোমা মত,
দেখিবে হে গিয়া অলকায় ;
তোমার তড়িতমালা, সেথায় ললিত বালা,
তুল্য শোভে কিবা দুজনায় ;
তোমার গর্জন-স্বর শুনিতে কি মনোহর,
সেথায় মৃদঙ্গ বাজে তায় :
তোমার অন্তরে জল প্রকাশিছে নিরমল,
মণিময় ভূতল সেথায় ;
ইন্দ্রধনু তোমা দেহে, অলকার গেহে গেহে
চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ ;
হর্ম্ম্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার আয়তন,
তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ।
আলো করি গৃহমাঝে বধূগণ কিবা সাজে—
কুসুমের অলংকার গায়।
সেসব পড়িলে মনে, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে
কোথা ছিনু এসেছি কোথায়।
পঙ্কজ তাদের করে, শিরীষ শ্রবণ 'পরে,
কুরুবক খোঁপায় বিলাসে ;
কপোল-চুম্বন-লোভে অলকেতে কুন্দ শোভে,
কদম্ব বিরাজে কেশপাশে ;

সদাই ফুটিছে ফুল, গুঞ্জিছে ভ্রমরকুল
ঋতুর শাসন সব টুটি ;
হৃদয়েতে পেয়ে সুখ, যেন হাঁসি-হাঁসি মুখ
কমলিনী সদা রহে ফুটি।
ময়ূর যতেক সবে, মত্ত হয়ে কেকারবে
সদা আছে পাখনা তুলিয়া।
সদাই জ্যোৎস্নাজলে, স্নান করি কুতূহলে
নিশি যায় আঁধার ভুলিয়া।
হর্ষ বিনা অশ্রুধারা জানেনা কেমন ধারা,
সেথায় যাহারা করে বাস।
যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিক লেশ,
নাহি আর বিচ্ছেদ-হুতাশ।
অট্টালিকা শিরোদেশে উঠিয়া আনন্দ বেশে
সঙ্গে লয়ে রামা কতগুলি—
যুবকেরা মিলে বসি, সুরাপান-রসে রসি,
মনের কপাট দেয় খুলি।
মন্দাকিনী-উপকূলে পারিজাত তরুমূলে
দেবকন্যা খেলিছে সকলে।
সুবর্ণ বালুকা দিয়া মণিমুক্তা ঢাকা দিয়া,
খুঁজিবারে এ উহারে বলে।
প্রিয়ার বসন ধরি' টান দেয় ত্বরা করি,
নাগর মনেতে পেয়ে সুখ,
মানিকের আলো দেখি, নিভাইতে গিয়া ঠেকি,
কামিনী লজ্জায় ঢাকে মুখ।
মেঘেরা কৌতুক চিতে, জল দিয়া চিত্রাদিতে
গৃহমধ্যে করিয়া প্রবেশ—
কেহ কিছু বলে বোলে, ভয় পেয়ে যায় চ'লে,
ধূমের ধরিয়া ছদ্মবেশ।

প্রিয়-আলিঙ্গন-ভরে, প্রাণান্ত হইয়া মরে,
কামিনীরা নিদাঘ-জ্বালায়।
চন্দ্রকান্ত-মণিগণ, করে তারা নিবারণ,
ফোঁটা ফোঁটা জলের ছিটায়।
নিশীথে কামিনীগণ, যায় প্রিয়-নিকেতন,
চিহ্ন তার পাওয়া যায় প্রাতে—
পথের মাঝেতে পড়ি, মুক্তা যায় গড়াগড়ি,
ছিঁড়ে পড়ি স্তনের আঘাতে।
সাক্ষাৎ দেখিয়া হরে, কন্দর্প পারেনা ডরে
ধনুক লইতে হাতে তুলি।
ভুরু-ধনু দৃষ্টি-শরে, তার কাজ সিদ্ধ করে,
নবীনা কামিনী যতগুলি।
কুবের-আলয় ছাড়ি' উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহিরদ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
পরকাশে মণি-বাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি ভাসি দলে দলে,
হংস-হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে
যাইতে মানসসরে, কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উঁচা ভূমি একধারে গিরি-সম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ কদলী তরু চারিধারে শোভে চারু
তোমায় তড়িত যেন সাজে।

মাধবীমণ্ডপ 'পরে কুরুবক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটে অলিকুল।
লতায়-পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ— অশোক বকুল।
অশোক ভাবিছে মনে পাব আমি কতক্ষণে
বধূটির চরণ-আঘাত।[১]
কবে আমি পাব মিঠা মুখ-মদিরার ছিটা
বকুল ভাবয়ে দিবারাত।[২]
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রন রন বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সেসব কথা মরমে জনমে ব্যথা
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এসকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত ক্ষণে
দেখে মাত্র মোর বাড়ি পানে।
এবে উহা শূন্যপ্রায়, কমল না শোভা পায়
কখনো দিবস অবসানে।
শীঘ্র যাইবার তরে ক্ষুদ্র করি কলেবরে
উপস্থিত হইবে সত্বর।
চপল চপলা ঝাঁকি দৃষ্টি দিবে থাকি থাকি,
আলো করি ঘরের ভিতর।
প্রিয়ারে পাইবে দেখা, গা-ময় লাবণ্যরেখা,
পয়োধরে ফুলিছে যৌবন।

১ পূর্বতন কবিদিগের কল্পনানুসারে অশোক তরু স্ত্রীলোকের পদাঘাতে পুষ্পিত হয়। এবং

২ বকুল বৃক্ষ উহাদের মুখ-মদিরার সংস্পর্শে কুসুমশালী হয়।

তনু তার কলেবর, কটী তার ক্ষীণতর
স্তনভার করয়ে বহন।
বাঁধিবারে অনুরাগ, অধরে বিম্বের রাগ,
মৃগ-আঁখি প্রণয়-আধার।
দেখিলে আকৃতি তার, মনে হয় সবাকার
আদি সৃষ্টি বুঝি বিধাতার।
অন্তরে বিরহব্যথা, দুই-একটি মুখে কথা,
দ্বিতীয় জীবন সে আমার।
দিন যত হয় গত উৎকণ্ঠা চাপে তত,
যন্ত্রণার বাড়ে তত ভার।
চক্রবাকী একাকিনী, কিম্বা মৃদু মৃণালিনী,
যে রূপে পোহায় বিভাবরী
বিরহে হইয়া ক্ষীণ, যাপন করিছে দিন
প্রাণপ্রিয়া সেইরূপ করি।
কাঁদি কাঁদি সারাক্ষণ ফুলিয়াছে দু-নয়ন,
ওষ্ঠ দুই আগুন নিশ্বাসে।
গালে আছে হাত দিয়া, পড়িয়াছে এলাইয়া
কেশপাশ এ পাশ ও পাশে।
হয়তো দেখিবে গিয়া, পূজায় সে মন দিয়া
রহিয়াছে ব্যাকুল অন্তর ;
নয়তো বিরহ-ভাব মনে করি আবির্ভাব,
লিখিছে আমার কলেবর।
নয়তো সারীরে কয়, তারে কি লো মনে হয়
তুই তো রসিকা বড় জানি ;
কাহাকে সে তোর মত, বাসিত না ভালো অত,
সদাই শুনিত তোর বাণী।
কিংবা যে ক'মাস বাকী ফুল তটী ভুঁয়ে রাখি,
দেখিতেছে গুনিয়া গুনিয়া।

আমার সঙ্গম-সুখে মনে আনি সকৌতুকে
কিংবা ঢালি দিয়া আছে হিয়া।
মলিন বসনোপরি, বীণা-যন্ত্রে কোলে ধরি,
গাইতে যদ্যপি করে মন—
নেত্রজলে ভিজে তার, গাওনা ক্রন্দন সার,
গলে আটকায় ক্ষণে ক্ষণ।
কাজকর্মে দিন-মানে, থাকে যদি সুস্থ প্রাণে,
রাত্রে তুমি গবাক্ষ সামনে
ভুঁয়ে যবে আছে শুয়ে, নিদ্রা নাই আঁখি দুয়ে
খুলিবে যতেক আছে মনে।
ভূমিতলে পার্শ্বতল, অন্তরে বিরহানল,
কলেবর ভাবনায় ক্ষীণ।
পূর্বদিক সীমানায়, কলা অবসান প্রায়,
শশী যেন আছয়ে নিলীন।
মনে মাতি মম সনে মুহু থাকে অন্যমনে
পরক্ষণে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
যন্ত্রণার অশ্রুজল বহে যত অনর্গল,
করে তত এ পাশ ও পাশ।
অমৃত শিশিরময় শশীর কিরণচয়
পড়িয়াছে বাতায়ন দিয়া,
পূর্বেকার মনে করি, দিয়া আঁখি তদুপরি,
পরক্ষণে আনে ফিরাইয়া।
অশ্রুযুত পক্ষ্মগণে ঢাকা পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
সুশোভন দুইটি নয়ন,
বরষার দিবাভাগে অর্ধ মুদে অর্ধ জাগে
স্থলজাত পদ্মিনী যেমন।
স্বপনে যদ্যপি কভু, পাই তারে বাঁচি তবু,
হেন ভাবি যত মুদে আঁখি—

অশ্রুধারা অনিবার আটকে নিদ্রার দ্বার
শূন্যে উড়ে মনোরথ-পাখী !
অলংকার পরিহরি, পড়ে আছে শয্যোপরি
দেখ যদি তার কলেবর—
দুঃখ না রাখিতে পারি, তোমারো হে অশ্রুবারি
ফেলিতে হইবে জলধর।
এত বলিতেছি ব'লে ভেবোনা বাচাল ব'লে.
মনগড়া এতে কিছু নাই।
কহিতেছি যাহা যাহা, সমুদায় তুমি তাহা
স্বচক্ষে দেখিবে ওহে ভাই।
অপাঙ্গ অলকে ঢাকা, কাজল নাহিক মাখা
আঁখি এবে ঠারে না বিলাসে ;
তোমায় দেখিতে খালি উঠাইবে পক্ষমালী
পদ্ম যেন নড়িল বাতাসে।
দেখ যদি তুমি গিয়া, সুখে আছে ঘুমাইয়া,
খুলিও না গর্জনের মুখ ;
স্বপনে পাইয়া মোরে বাঁধিয়াছে বাহুডোরে
ঘুচাইয়া দিও না সে সুখ।
বনের মালতী-জালে উঠাইয়া প্রাতঃকালে
সজল শীতল বায়ু দিয়া,
জাগাইবে প্রেয়সীরে, পরে তারে ধীরে ধীরে
কহিবে কি দিতেছি বলিয়া।
এইরূপ তারে কবে, শুন ওহে অবিধবে
সখা আমি স্বামীর তোমার।
ভাসিয়া বায়ুর স্রোতে তাহার নিকট হতে
আসিয়াছি লয়ে সমাচার।
জলধর জেনো মোরে, বিদেশে যে কেহ ঘোরে,
গর্জনে তাহারে তাড়া দিয়া

উতলা অবলাটির পুছিবারে অশ্রুনীর
বাড়ি আমি আনি ফিরাইয়া।
এতেক শুনিয়া কানে, তাকাইয়া তোমা পানে
হনুমানে জানকী যেমন
শুনিবে সকল কথা, মন নাহি আর কোথা,
বাক্যে যেন পাইছে জীবন।
এতেক বলিও শেষে, রামাচল পরদেশে,
সহচর আছয়ে তোমার ;
প্রাণে সে বাঁচিয়া আছে, জিজ্ঞাসিছে তোমা কাছে
তোমার কুশল সমাচার।
তোমা অঙ্গে নিজ অঙ্গ, করিতেছে এক সঙ্গ
মনোরথ মাত্রে করি সার।
তপ্ত দেহ দুজনার, শ্বাস তাহে অনিবার
দুধারে নয়ন-বারিধার ;
সখীদের সন্নিধানে, হেরি তব মুখপানে,
চুম্বিবারে হইয়া বিব্রত,
কত যেন কথা আছে, ফুসিত্ত কানের কাছে,
তোমার সে এত অনুরত—
এমন যে সেই জন, কেমনে বল এখন,
বাঁচিবে সে তোমার বিহনে।
শুন তুমি মন দিয়া, তোমায় সে মোরে দিয়া,
কি কহিছে সকাতর মনে।
হরিণে নয়ন তব, লতায় লালিত্য নব,
মুখশ্রী শশাঙ্কে শোভা পায় ;
তরঙ্গে আঁখির ঠার, শিখিপুচ্ছে কেশভার,
এক ঠাঁই কিছু নাই হায়।
কোপ করি আছে যেন, প্রতিরূপ তোমা হেন,
শিলা 'পরে লিখিয়া যতনে।

মোরে তব পদ ঠাঁই, যত আঁকিবারে যাই,
অশ্রু তত ঢাকে দু নয়নে।
ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া, শূন্য ধরি জড়াইয়া,
স্বপনেতে পাইয়া তোমায় ;
বনের দেবতা যারা, এসব দেখিয়া তারা,
অশ্রু ফেলে পাতায় পাতায়।
দেবদারু দুলাইয়া নানা পুষ্প বুলাইয়া,
এই যে বহিছে সমীরণ,
তোমায় কখন যদি, ছুঁয়ে থাকে ক্ষণাবধি
তবে আমি করি আলিঙ্গন।
কেমনে এ পোড়া নিশি, পলকে যাইবে মিশি,
গ্রীষ্মতাপ থামিবে কেমনে ;
মিছা হেন মনস্কাম, উঠি উঠি অবিশ্রাম,
হুতাশন জ্বালাইছে মনে।
দশাচক্র নহে স্থির, হেন মনে জানি স্থির,
কোনো মতে কাটাই জীবন ;
তুমিও হে দিন দিন, শরীর কোরো না ক্ষীণ
ভাবিয়া ভাবিয়া সারাক্ষণ।
জাগিবেন বিষ্ণু যবে, শাপ মোর অন্ত হবে,
চক্ষু মুদি থাক এ ক'মাস।
শরদের জ্যোৎস্নারাতে মনসুখে এক সাথে
পরে মিটাইব যত আশ।
পতি তব মোর কাছে যাহা যাহা কহিয়াছে,
বলিলাম তোমায় সকলি ;
শুনিলে সে সমুদয়, না যদি প্রত্যয় হয়.
অভিজ্ঞান বাক্য শুন বলি।
পড়িয়া সখার বুকে, শুয়ে ছিলে মনসুখে
ঘুমাইয়া পড়িলে অমনি ;

কি জানি কিসের লাগি, চমকি উঠিলে জাগি,
ক্রন্দনের মত করি ধ্বনি।
স্বামী তব জিজ্ঞাসিতে, বলিলে কৌতুক চিতে
দেখিলাম, ওহে ধূর্তরাজ!
যেন অন্য কারো সঙ্গে মাতি আছ রসরঙ্গে
ছি ছি ছি এমন তব কাজ।
এইরূপ শুনাইয়া কোনমতে থামাইয়া
আসিবে আমার প্রেয়সীরে;
প্রথম বিরহজ্বালা, এই সে জানিল বালা,
সহিবে কেমনে বল ধীরে।
নিরুত্তর আছে ব'লে মোরে যে বিমুখ হলে,
এ কথা কভু না আমি মানি;
চাতকে চাহিলে জল, কর তারে সুশীতল
নাও কোন শব্দ মুখে আনি।
চাহিনু যা তব ঠাঁই এমন চাহিতে নাই
কি করিব মারা যাই প্রাণে।
ঘুচাইতে কারো দুখ, নহ তুমি পরাঙ্মুখ
তোমায় সকল লোকে জানে।
সমাপিয়া মোর কাজ পরে ওহে ঘনরাজ
যথা ইচ্ছা তথা বিচরহ;
বরষার শুভযোগে, থাক চপলার ভোগে,
ক্ষণেক না জানিয়া বিরহ।

উত্তরমেঘ সমাপ্ত

বক্তব্য

হরপ্রসাদ মিত্র

কিছু যে বক্তব্য থাকবেই জীবনের প্রতি ঘটনাতে
গ্রাহ্য কোনো তত্ত্ব কিংবা দৃশ্য কোনো গভীর ইশারা
তা নয়, তা নয় ; রাস্তা পড়ে আছে সবার হাঁটবার।
কুকুর, মানুষ, গাড়ী—এমন-কি বাতাস বা আলো
তারাও আসছে যাচ্ছে, সব নিয়ে দেশ আর কাল
বিস্তার ও পরম্পরা বিম্বিত এ-লক্ষকোটি বোধে।
জীবনের এই জ্ঞানে ভেদ নেই শিক্ষিতে নির্বোধে।

রাস্তায় কাঁপছে গাছ, জ্বলছে কোনো নদীর ঢেউয়েরা,
ছায়া পড়েছে ইতস্ততঃ, পাখি উড়ছে, ফুটে ঝরছে ফুল,
প্রেমেতে দুলছে বুক, শোকে ভাঙছে, লোভেতে থর্-থর্,—
তারই মধ্যে মনে জেগেছে কী জানি কী বিশ্বচরাচর !
স্বরূপ জানবে না কেউ, জানা যে-সব সামান্য জান্‌লায়,
মনের যে-সব সূত্রে, বোধের যে-সব ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
জগৎ ছাড়িয়ে যায় সেই-সব বেড়ার বেষ্টন।
সত্তা তো তাতেই বন্দী—মৃত্যু হয়তো শেষ পরিত্রাণ।

ইতিমধ্যে বর্ষা এলে মনে পড়বে কোনো শান্ত মুখ,
ইতিমধ্যে চৈত্র এলে ফুটে উঠবে রাত্রের বকুল।
আকাশে নক্ষত্র জ্বলবে, মা থাকবেন দূরের দুর্লভ।
মৃত্যুর ওপারে প্রিয় জ্বলবে সব জীবনবল্লভ।
সমস্ত মমতা থাকবে অন্ধকারে দূরের তারাতে।
কেউ নেভেনা ভালোবাসায় মন ভাববে হারাতে হারাতে।

তবু তো একদিন কোনো বাসে ট্রামে ট্রেনে বা জাহাজে,
ছায়াচ্ছন্ন হাসপাতালে কিংবা কোনো দুর্বার প্রপাতে

নিজেকে ডোবাতে হবে, যাবে এই দুর্মর নিজত্ব
ঈশ্বরে মিশবে সবই অণুত্ব, বৃহত্ব।
এবং ঈশ্বর তাই চোখ বুজলেই অন্তরে আসেন।
দুর্জ্ঞেয় নাস্তিই তিনি, অস্তি-কে নাশেন!

কেন

দিলীপ রায়

মেয়েটিকে ভালো লাগে, কেন লাগে জানি না
কোথায় স্পষ্ট নয় রয়েছে মাধুর্য ;
বৃষ্টিকে ভালো লাগে, কেন লাগে জানি না
চোখে ওর কাজলের একটু চাতুর্য।

কবিতাকে ভালো লাগে, কেন লাগে জানি না
ব্যবহারে কি বা হবে মূল্য ক্ষণিক ;
সংগীত ভালো লাগে, কেন লাগে জানি না
অমৃত স্বাদ যেন স্বপ্ন ধ্বনিক !

বন্ধুকে ভালো লাগে, কারণ সে অকারণ
বকবক করে তার সেটাই স্বভাব ;
প্রকৃতিকে ভালো লাগে, কেন লাগে জানি না
মহাকাল রেখে যায় ঋতুর প্রভাব।

পলাতক

আনন্দ বাগচী

মধ্যদিনে দেখা দিলে তুমি।
যখন প্রগাঢ় রুক্ষ লাল মাঠে আমি একা বিষণ্ণ পথিক
জীবনকে মুঠো ভরে পেতে গিয়ে
হারিয়েছি কখন ধুলোয়,
গান বন্ধ হয়ে গেছে, নিরাত্মীয় চতুর্দিক জুড়ে।
নাটকের সাঁকো বেয়ে দেখা দিলে তুমি।
মধ্যদৃশ্যে সমাহৃতা কোনো এক প্রক্ষিপ্ত নায়িকা,
অধরে তাম্বূলরাগ, মুখে লোধ্ররেণু, বাম হাতে
কোনো লীলাপদ্মের কোরক
ছিল না এ কথা মনে আছে।

অভিনয়-পর্ব শেষ হলে,
ক্লান্ত পায়ে বাড়ি যাবো অন্ধকারে রাত্রির বিবরে।
আমার চারপাশে শুধু স্মৃতি, শুধু স্মৃতি ;
শুধু মৃত কথা আর অসহ্য জোনাকি
মৃত নক্ষত্রের মত।
নিজের পায়ের শব্দ শুনে স্বপ্নলোকে চলে যাব।
অভিনয়-পর্ব শেষ হলে,
ঈর্ষার, ঈপ্সার পটক্ষেপে
আমি ক্লান্ত প্রাণ সব প্রেম-প্রীতি-অশ্রুজল মুছে
ইতিহাস হয়ে যাব কবে।

বধ্যমঞ্চ দূরে ছিল, আলোজ্বলা সাজঘরে বসে
চিত্রিত রেখায় বন্দী এই আত্ম-মুখশ্রীকে দেখি
অপরাহ্ণ হয়ে যেন নিভৃত দর্পণ জুড়ে জ্বলে ;

আঁকাবাঁকা পথ চতুর্দিক থেকে মাকড়সার মত

মঞ্জুজাল রচনা করেছে,

আমি ওইখানে যাব সর্বাঙ্গের বিবিধ মুদ্রায়

কখনো ফোটাব ফুল

আলোক অমৃত কখনো-বা

বিষবৃক্ষে রুচিকর ফল।

প্রতি নায়কের মত সমস্ত বিষণ্ণ সন্ধি খেলে

আমাকে নিবিড় বৃত্তে ঘিরে,

যন্ত্রণারা সংগীতের মত।

এমন সময় তুমি এলে সাঁকো বেয়ে

অধরে তাম্বূলরাগ, মুখে লোধ্ররেণু, বাম হাতে

কোনো লীলাপদ্মের কোরক

ছিল না এ কথা মনে থাকবে চিরকাল।

বধ্যমঞ্চ পড়ে রইল, নির্ধারিত জীবনসঙ্গিনী

সঞ্চিত সংলাপ আর

সর্বাঙ্গের মুদ্রা বহুবিধ।

সমাচ্ছন্ন

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শব্দ করে ভাঙো এই দুঃখের প্রাচীন অধিকার ;
যে দুঃখে এখনো আমি আকাশকে নীল রক্তে লিখি
পাখির সহজ ডানা তাকে নিয়ে ভেসে যায় মেঘের অসীম পারাপারে ;

বলি এসো, কাছে এসো অন্তহীন কবিতার দুর্লভ বিরহে।

কাকে লিখি নিশিদিন ! কে আমার ছন্দের শরীর
একান্তে রক্তাক্ত করে উন্মাদ উন্মাদ তীব্র বাসনা বিক্ষোভে।
খুঁজি তারে উন্মোচনে, আপাদমস্তক খুঁজি স্তনে গ্রীবামূলে।
মনে ঘোরে অন্ধকার আচ্ছন্ন কেশের ভারে রেখার আদ্র্তা
গৌরীবধূ ভোর তবু নিঃশব্দে দাঁড়ায় এসে উষার অভ্যাসে।

কেন ভুলে আছি আজো অগ্নিময় যথার্থ যজ্ঞের
সাহসী মন্ত্রের ধ্বনি ; কেন আজো তুচ্ছ রচনায়
শিল্পের নিসঙ্গ মুখ বারবার ভুল ভেঙে ফেলি ;
কোথায় প্রধান তুমি, হে দক্ষিণ দেবতা আমার,
একবার দৃশ্য হয়ে এই রুদ্ধ রক্তে ফুটে ওঠো।
শুধু আমি নির্নিমেষ সমাপ্তির তীরে বসে দেখি
বুকের অন্তিম পণ্য অস্থির জোয়ারে ভেসে যায়···

কিছু শব্দ হোক, ভাঙো, প্রাচীন দুঃখের সব বৃদ্ধ অধিকার ॥

তুমি না ফোটালে

দুর্গাদাস সরকার

তুমি না ফোটাও যদি সে-ফুল ফোটাবে অন্যজন !
যতদিন অরণ্য চঞ্চল হয়, সমুদ্র গর্জন করে,
আকাশে আলোর আয়োজন—
আসব তোমার কাছে।
তবু না ফোটাও যদি সে ফুল ফোটাবে অন্যজন।

কারো ফুল ফোটাবার ভার।
কেউ শুধু ভালোবাসে তুলে আনা ফুলের সম্ভার
সে-ভালোবাসাকে
ঢেকে রাখা একান্ত অশুচি
আত্মার স্বরূপ।
শুনেছ কি দূরদিগন্তে ধ্বনির বিদ্রূপ।

আকাশের কালো পিচে ভরুক পা দুটো—
তবু ছোটো রুক্ষপীত সূর্যের দিকেই।
আজ সে থাকুক যেখানেই
সে ফুল ফোটায় বারবার
সে করে আলোর আয়োজন।
তুমি নাও শুধু তাই সাজাবার ভার।
তুমি না ফোটাও যদি সে-ফুল ফোটাবে অন্যজন।

সর্বজনীন

শংকর চট্টোপাধ্যায়

সোহাগবিকচ অসীমতা ছিল মগ্ন
নীলিমালিপ্ত শূন্যের প্রতিবেশী
পূর্ণ হলেন আতুর দৃশ্যপট।

দৃশ্যান্তরে, চিত্রশালায়, সংহততন্ময়
লুপ্ত ভাষ্য, অরূপের অধিবাসী
প্রপিতামহের সিক্ত রক্তে সংহত তন্ময়
প্রাণধারা, তাই আসি।

পাতালচক্রে, লক্ষ্যোতাড়িত লুব্ধ, মূর্খ, নির্বাক, সংশয়ী
মলিনস্পর্শে পাত্রপাত্রী সহজলভ্য বিষয়ী
দিব্য তৃপ্ত সুধা।

খণ্ডদৃশ্যে গ্রথিত কালের সমর্পণ
মানসগভীরে ব্যাকুল পুণ্যধারা
পূর্ণ হবেন আতুর দৃশ্যপট।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১-১৯৬০

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যু এক-এক সময় ভালোবাসার নিখাদে পৌঁছে দেয়, একই সময় ভালোবাসা আর বিচ্ছেদ দুটির একত্র জটিল অনুভব দাবী করে। তাই আজ এত আন্দোলিত লাগে, এত প্রখর শূন্য। শিল্পজগতের প্রাচীন ও নবীন মনীষীদের সগোত্র, চিন্তার সূক্ষ্ম উজ্জ্বল শস্যের সুনিপুণ আহার্যে পুষ্ট, সমাহিত সুধীন্দ্রনাথ কোন্ অমোঘ ভালোবাসায় এমনকি প্রায় নাবালকের তুচ্ছ চিন্তার আস্ফালনকেও প্রীতির সহজ স্পর্শে নমিত করে, সঙ্গীর মত নির্ভয় নৈকট্যে এগিয়ে এসে গুরুবিষয় অতিসরল বিন্যাসে স্পষ্ট করতেন সে কথা আজ মনে না পড়ে পারে না।

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমস্বরে যেন আমাদেরও বলার বাসনা ছিল যে জীবনের কেন্দ্রস্থলে যখন সন্দেহ অবিশ্বাস নানা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করছে, প্রেম সমাজবোধ চৈতন্যের গূঢ় এষণা কিংবা অনুভূতির ললিতমায়া যখন প্রশ্নে, স্বচ্ছতম বিশ্লেষণের প্রখর উন্মোচনে, অর্থহীন পরিচ্ছদবর্জনে স্পষ্ট এবং আবর্তে কম্পিত, তখন 'আছে' 'হয়' 'সব থাকে' 'শাশ্বত' 'সমন্বয়' ইত্যাদি আমাদের সংশয়পীড়িত মনে আত্মীয়তার গাঢ়তা আনতে সক্ষম হয় না, সর্বোত্তম অগ্রজের সুবিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও সমকালের নৈরাশ্যগুঞ্জিত নাস্তিক্য-কঠিন বিশিষ্ট চেতনার প্রান্তভূমিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তই অগ্রজের অধিকার অর্জন করেছিলেন। বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী— অনাথ পৃথিবীর অধিবাসীর এই উচ্চারণের সঙ্গে সমকালের অনেক কণ্ঠ মিলিত হতে পেরেছিল।

এই ভিন্ন মেরুতে নিঃসঙ্গ ভ্রাম্যমাণ কবি রোমান্টিকতার অতীন্দ্রিয় অনুভবের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়ানুভবের সঙ্গে মননের যোগ্য রসায়ন আমন্ত্রণ করলেন কাব্যে। ধ্রুপদী শিল্পীর স্থাপত্য লক্ষণীয় হল এই শিল্পকর্মে এবং এর ভাবমণ্ডলে কবির প্রবাহমানতানির্ভর ক্ষণবাদী এবং নৈরাশ্য-ভারাক্রান্ত জীবনদর্শন। প্রতীকপন্থার ব্যঞ্জনাধর্মে রঞ্জিত এই অনুধ্যান। এতদিনকার আরাধ্য কবিতাসৃষ্টির মূল বলে স্বীকৃত প্রেরণাকে অলৌকিকতার বাধ্যতা বলে দূরে সরিয়ে একাগ্র সংকল্প ও প্রযত্নে অভিজ্ঞতার প্রকাশই কাব্য-

ধর্ম বলে মেনে নিলেন। অনুরূপ চিন্তা এবং প্রকরণের স্পর্শ তাঁর অন্যান্য কবিতাগুলোর মত প্রেমের কবিতাগুলিকেও স্পর্শ করেছিল। এক দিকে তার নেতিবোধ প্রেমের শাশ্বত স্মরণকে অসম্ভব মনে করলেও তাঁর ক্ষণবাদী মানসিকতা একটি কথার দ্বিধা-থরথর চূড়ে সাতটি অমরাবতীকে আশ্রয় করতে লক্ষ্য করেন। একটি নিমেষ বৈনাশিক কালের চিরচঞ্চল গতির পথ আগলে দাঁড়াতে সক্ষম। এখানেই প্রবল অস্বীকার এবং পাশাপাশি অসহায় স্বীকারের জটিলতা কবির রচনায় দ্বন্দ্বের ও মননের সমন্বয় ঘটিয়েছে, নিয়তির তির্যক ছায়া ফেলেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

কাব্যগ্রন্থ

তন্বী

অর্কেস্ট্রা

ক্রন্দসী

উত্তরফাল্গুনী

সংবর্ত

দশমী

অনুবাদ

প্রতিধ্বনি

আলোচনাগ্রন্থ

স্বগত

কুলায় ও কালপুরুষ

কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে

দিব্যেন্দু পালিত

অনুবাদ কবিতাও কবিতা; যথেষ্ট মনেনিবেশ করলে ও 'হৃদয়' নামে যে-বস্তু কখনো আবেগ এবং কখনো ভাবালুতা ব'লে আজকের দিনে লোকমুখে আর কবিতার ছাত্রদের কথায় ও ব্যবহারে প্রায় ক্ষ'যে এল, তার সেঁক দিলে সেসব কবিতায় রীতিমতো বাষ্প ওঠে। সে-উত্তাপ সহনীয় ও মতভেদ ঘটলেও শ্রেষ্ঠ; কেননা তার মধ্যে অনুবাদের কবিও যেহেতু ভালো কবি, অন্তত কবিতায় তার অধিকার সহজাত এবং ব্যুৎপত্তি পরাশ্রয়ী নয় ব'লে সেখানে সক্রিয়ভাবে দুজন কবি কাজ করছেন; বামে ও দক্ষিণে তাঁরা কবিতাকে নানাবিধ স্খলনের উপদ্রব থেকে সতর্ক পাহারা দিয়ে আগলে রেখেছেন; ছিদ্রান্বেষীদের ক্বচিৎ সাফল্য কবিদের ইচ্ছাকৃত; অনায়াস স্বাস্থ্যে শরীর ও মন সেখানে কিছুমাত্র খর্ব হতে পারে না। এবং দেখা না-দেখা অনেক অঘটন ঘটনের সম্ভাবনা থাকে বলেই অনুবাদের কবিরা নমস্য: কর্তব্যের হাতে কঠোর অনুশাসনের বেড়ি পরানো সত্ত্বেও তাঁরা প্রথম কবির হৃদয়ে নিজেদের হৃদয়কে ঘ'ষে ঘ'ষে চকমকির আগুন জ্বালবার চেষ্টা করেন; তা বেশ কষ্টসাধ্য, তাতে রক্তক্ষরণ হলেও হতে পারে; প্রায়ই জ্বলে না কিংবা জ্বলতে সময় লাগে বলে দুর্লভ; এবং তার দীপ্তি নিতান্তই স্বল্প বলে কোনোরকম সধূম সৎকার হয় না বটে, কিন্তু ছোট ছোট অন্ধকার— সূক্ষ্ম অনুভূতির শেষে যা মুক্তোর মতো চুপ করে থাকে, ভয় পায়; এবং ঝড় বৃষ্টি হলে স্বভাবতই শীত জানায়; হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে আর চমক দিয়েই আবার নিভে যায়; কিন্তু সেই চকিত মুহূর্তই সৎ পাঠকের কাছে মহৎ হযে কিংবা চোখের মণির ভিতর লুকানো সেই ক্ষুদ্রতম কালো অস্পষ্ট স্পষ্ট, সাদা বিন্দুটির মত— যে আলো দেখে নি এবং যে দেখেছে, উভয়ের চিন্তিত ধারণার মত বেঁচে থাকতে পারে। কোনো কোনো ভালো কবিতার অনুবাদ তাই মহৎ কবিতা হয়ে ওঠে।

অবশ্য এ কথাও খুবই সত্যি যে প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই ভুল করে ফেলেন, দু নৌকোয় পা রাখা এবং মাঝে মাঝে অপটু অভিজ্ঞতায়

সন্তরণ-চেষ্টার ফলে কাউকেই সমীহ করা হয় না ; ঢেউয়ের শিখরে জলের আত্মা ফুঁসে ওঠে ; এমনও হয়তো হয যে দুকূলই ভেসে উঠল। তাৎক্ষণিকের উৎসাহে তাই আমরা, আমাদের এবং যাঁরা প্রায় আমাদের মত, অর্থাৎ কবিতা প'ড়ে শিখে ও বুঝতে নিয়মিত আত্মসংস্কারে ব্রতী, এবং সব কবিতা থেকে ভালো কবিতা কিংবা ভালোয় নিহিত কিছু কিছু বিশেষ তাৎপর্যকে চিনে সফল— আরো অনেকের ধৈর্য ও বিশ্বাস না-হারিয়ে উপায় নেই।

অর্থাৎ নিশ্বাস সহজ হয়ে এলে যেন অনুবাদ-কবিতাটি অনুবাদ, কিন্তু আভিধানিক না হয় ; হয়তো পুরনো চাল : বহুবার প'ড়ে প্রত্যেকবারই মনে হয় অন্য কিছু— মহৎ ও বিস্মিত ; যেন দ্বিতীয় কবির সঙ্গে ভাব হলে তাঁর জন্য অভাব বোধ করি। জলে জল আসুক, তাতে কিছু যায় আসে না ; কিন্তু তা কেন জলবৎ তরল হবে ; আর তাই যদি হয় তাহলে এ-দেশের এবং অনেক দেশের ছোট বড় অনেক পদ্য-লেখকই তো অনশ্বরতা দাবি করবেন ; আসল কথা হল— এ-জল যেন রঙিন হয়, বেশ গাঢ় হয়, প্রকৃত হৃদয়ের তাপে জ্বাল পেয়ে পেয়ে মজ্জার খানিকটা কাথ যেন বেরিয়ে আসে। দুই দেশের দুই কবি— তাঁরা পরস্পরকে চিরকাল না-দেখুন, আলাপ-পরিচয় নাই বা থাকল : হয়তো তাঁদের সময়ের প্রান্তে দুই মেরু স্থির : কিন্তু দেখা হলেই যেন তাঁদের মনে 'যেন কোথায় দেখেছি' ভেবে সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহ অস্ত্রোপচার ক'রে, একজন বৃদ্ধ জাতিস্মরের মত অনেক কথা ভাবতে ভালোবাসে এবং বিষুবরেখার মত দুই প্রান্ত ছুঁয়ে তাঁরা ক্রমশ কাছে আসতে থাকেন, এবং একটি মাত্র কেন্দ্রে 'এক' হয়ে হারিয়ে যান। অনুবাদ তখন আর 'অনুবাদ' নয় ; মূল, কিংবা মূলের আমূল পরিবর্তন।

তা হলে অনুবাদ-কবিতার উপযোগিতা আছে ; কেননা, সেখানে এক কবির অনন্য একাকিত্ব অন্য এক কবির স্পর্শ পেল ; প্রবাসী আত্মীয়ের মত তাঁরা চিন্তায় পারস্পরিক ; তাতে উভয়েরই মানসিক শ্রী ও সমৃদ্ধি ঘটে : আর, যাকে 'কাথ' বলেছি, গায় বয়।

এ কাজ খুব সহজ নয়। বড় বেশি শক্ত ; প্রায় জীব-ব্যবচ্ছেদ বলা চলে। আর যে-কোনো কবিতা বিষয়ের কাজের থেকে কবিতার অনুবাদ কম মেধা চায় না, তার দাবি বরং বেশি ; কবি যেমন 'দেখা' দিয়ে শুরু করেন, অনুবাদক তেমনি 'পড়া' দিয়ে, কিন্তু সে-পড়াও এক রকমের দেখা, রূঢ়

রঞ্জনরশ্মিতে আন্তরিক হাড়-মাংস মেদ-মজ্জা সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—. কথার অনুবাদে জেল্লা বাড়ে, কিন্তু প্রাণ শুকিয়ে যায়, মা'র যোগ ছিঁড়লে শিশুর নাড়ির মত শেষে একদিন কালো হয়। ভালো অনুবাদ মূল কবিতার চেয়ে বেশি সময় চায় (এজ্‌রা পাউণ্ড তো এক পংক্তির emotion আবেগ স্পষ্ট করার জন্যে ছ মাস সময় ব্যয় করেছিলেন); নানা ধৈর্য বিশ্বাস হারায়, আবার হয়তো কখনো নতুন বিশ্বাসে হৃদয় নিষ্পন্ন হলে একটি কথা হঠাৎ বহু বেশি প্রতীকের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে এক মুহূর্তের শব্দের মত বেজে উঠে অন্য-সব ধ্বনি ও ছন্দের দ্রুত প্রহারে অবিন্যস্ত করে তোলে। সেসব কষ্ট ও অসুবিধে মালার্মে কি হাইনের মত কবিদের অনুবাদে কিংবা পাউণ্ড-এর মতো কবি এবং দ্বিতীয় কবির মহৎ প্রতিভায় সহ্য হয়: সে-কবির কাজ হল কবিতার শরীরে একটুও আঘাত না হেনে, অন্তরে কিংবা বাহিরে কোনো বিশেষ বস্তু বা ভাবনার সূত্র-সম্প্রসারণ, যা প্রথমেরই ঐশ্বর্য, কিন্তু যার অধিকার উত্তরাধিকার হিসেবে দ্বিতীয়ে সংযুক্ত। প্রথমে বিশ্বাসই হল তার ব্যাকরণ, বা প্রয়োজন হলে 'সিঁড়ি', যে-সিঁড়ি তার নির্বিঘ্ন প্রদর্শক, ঘুরে ঘুরে ক্রমশ শ্রেষ্ঠ আলোয় গিয়ে থেমেছে; এবং তার পর নিজের সকল ব্যক্তিত্ব ক্রমোচ্চারিত হযে প্রদর্শনের ছায়া আড়াল ক'রে নিজেরই কাযা হয়ে দাঁড়ায। সেইখানেই তার, অনুবাদকে কর্তব্যের শেষ: কিন্তু তাদের শেষ কোনোদিন হয না ব'লে বাকি শ্রমটুকু প্রথম ও দ্বিতীয় কবি তাঁদের সততার গুণগ্রাহীর কাছে প্রত্যাশা করেন।

তাই প্রয়োজন নতুন (পুরনো ও মহৎ) বা না-চেনা কবিদের অনুবাদে এবং সেসব কবিদের আত্মায় এবং বিশ্বাসে প্রবল হওয়া। আর, অনুবাদ-চর্চায় তরুণ কবিদের মনে অন্তত যেসব কথা অস্ফুট কী অর্ধস্ফুট হযে আছে, প্রকাশের জড়তা বা অন্য যা-হোক কিছুর দৈন্যে, যেসব অনুভবের মৃত্যু প্রতিদিনই ঘটছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ফল পাওয়া যাবেই; দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন হবে অভিব্যক্তি গাঢ় হবে; যে-হৃদয় পুরনো হতে চলল, যার স্বতোৎসারিত ক্ষমায় ও প্রেমে অন্য প্রসঙ্গ কায়েম হতে গিযে তবু কী ভেবে আজও পিছনে তাকায় নতুন রক্তে সে আরো উষ্ণ হবে।

সোনার হরিণ। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। ২২ শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। দেড় টাকা।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথমে স্ত্রীলোকের ছদ্মনামে লিখতেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যথাসময়ে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছেন। কবি শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ নেই। বিশ্বসাহিত্যে কোথাও রমণী-রচিত উল্লেখযোগ্য কবিতা নেই। এ দেশে মেয়েদের নামে কবিতা পাঠালে তা তৎক্ষণাৎ কাগজে ছাপা হয়, কিন্তু কদাচিৎ তা পাঠকের মনে ছাপ রাখে।

নিজের নাম প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন— এই থেকে মনে করা যায়, এই কবি অতিশয় রোমান্টিক, স্পর্শকাতর, স্বভাববিহ্বল। অথচ যেই স্বনামে বেরিয়ে এলেন, অমনি একটি বেশ সবল স্পর্ধিত যুবাকে দেখা গেল। এই গ্রন্থে তাঁর দুই সত্তারই কবিতা আছে। সেইটাই এই বইএর প্রধান দোষ।

এ বইতে একজায়গায় পড়ছি—

জানলা গলিয়ে তুমি প্রত্যহই রোদ্দুরের খামে
যে চিঠি পাঠাও, আমি সে চিঠি পড়ি না সারাদিন ;

এ কবিতা নয়, শুধু মিষ্টি অক্ষরের মেলা। এ জাতের কবিতা রীতিমত বিস্বাদ, বেশি চিনি দিলে চা যেমন বিস্বাদ লাগে। আবেগে আপ্লুত হলে কবিতা হয় না, শব্দ যদি বহুকোণ-হীরকের মত দ্যুতিমান না হয় তবে কবিতা হয় না। ছন্দ এবং মিল যদি obsiquous ভৃত্যের মত না হয়— তবে কবিতা হয় না। এ সমস্ত জ্ঞান মেয়েদের নেই। একই বইতে তিনি লিখেছেন—

রোদ্দুর লেগেছে তার মেদ-পিত্ত-শ্লেষ্মার শরীরে
খেজুর-রসের মত ফোঁটায় ফোঁটায় দুধ হয়ে…

অথবা শীতের সঞ্চয় চাই, খাদ্য খুঁজি চলি পায়ে-পায়ে
পিঁপড়ের কি প্রয়োজন অশ্রুর সমুদ্র ভরা প্রেমে

এগুলি তাঁর আত্মপ্রকাশের পরবর্তী, কারণ এতে আত্মপ্রত্যয়ের সুর শোনা যাচ্ছে। সুতরাং এ বইয়ে তাঁর পরিচয় স্পষ্ট নয়, নানান জাতের লেখায় মিশ্রিত। এ বইতে ভালো কবিতা বেশ কয়েকটি আছে, কিন্তু কবির diction আছে মাত্র কয়েকটিতে। তবে এই কয়েকটিই তাঁর পরবর্তী রচনা সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিয়ে রাখে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আলেখ্যদর্শন। সুশীল রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭। আড়াই টাকা।

স্বাধিকারপ্রমত্ত কশ্চিৎ যক্ষ দুঃসহ একবর্ষভোগ্য শাপের ফলে কান্তাবিরহিত হয়েছিল। স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুনিবিড় রামগিরি আশ্রমে আষাঢ়ের প্রথম দিবস তার শোকার্ত অন্তরে অশ্রুসমাকুল হয়ে উঠল। সুদূরসংস্থিতা সেই কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনীর জন্য নবজাত কুটজকুসুমের অর্ঘ সে পাঠাতে চাইল আশ্লিষ্টসানু মেঘের সঙ্গে। মানসোৎক বলাকার সঙ্গে দক্ষিণ থেকে উত্তরে নির্দেশিত হল মেঘের যাত্রাপথ, তার গন্তব্য যক্ষেশ্বরদের বসতি অলকা। সেখানে প্রাচীমূলে চন্দ্রের কলামাত্রাবশিষ্ট মূর্তির তুল্য যক্ষপত্নী বিরহশয়নে নিষণ্ণ। তার জন্য একটি গোপন অভিজ্ঞান যক্ষ তুলে দিল মেঘের হাতে। অলকা থেকে ফিরে এসে অভিজ্ঞানসহ প্রিয়ার কুশলবাক্য জানিয়ে প্রভাতী কুন্দের মত শিথিল যক্ষের জীবন রক্ষা করবে মেঘ, এই প্রতিশ্রুতি আছে ভুবনবিদিত বংশে জাত সেই মেঘের চরিত্রে ; যাচিত হলে যে নিঃশব্দেই চাতককে জলদান করে, তার কাছ থেকে এই বন্ধুকৃত্য আশা করা অন্যায় নয়।

প্রায় দেড় হাজার বছর ধ'রে সুপরিচিত এই কাহিনীটি মেঘদূত খণ্ডকাব্যের বিষয়। বলা যায় দেড় হাজার বছরে এই সৃষ্টি দেবশিল্পের গৌরব পেয়েছে। অসংখ্য ভাষ্য এবং টীকায় নিঃশেষিত হয় নি, এর সংক্ষিপ্ত শরীরে যে বিপুল সম্ভাবনা সংহত আছে, তা একে চিরদিন ভাবীকালের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই কাব্যের বিচ্ছুরিত সংকেত এক দিকে যেমন টীকাকারকে আহ্বান জানিয়েছে, অপর দিকে জন্ম দিয়েছে কবির। টীকাকার যে গূঢ়ার্থের অরণ্যে পথরেখা চিহ্নিত করবার দায়িত্ব নিয়েছেন, কবি সেগুলিকে উপকরণ হিসেবে তুলে নিয়েছেন তাঁর আপন ডালায়, তাঁর উৎসাহ নতুন সূত্রযোজনার। মেঘদূত-পাঠকের দুই সীমানার এক প্রান্তে মল্লিনাথ, অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক দ্বিতীয় জনের অভিপ্রায়কে আরও কিছু দূর বহন করে নিয়ে গেছেন।

পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ এই দুই পর্যায়ে বিন্যস্ত কাব্যখানি অনেকগুলি চিত্রপরম্পরার যোগফল। শ্রীযুক্ত সুশীল রায় তাঁর গ্রন্থের পরিকল্পনায় এই কথাটি প্রথমেই স্মরণ করেছেন। শুধু গ্রন্থের নামকরণের জন্য নয়, যে তেইশটি

নিবন্ধে তিনি সমগ্র কাব্যখানিকে আস্বাদ করেছেন, সেখানে যেন তেইশটি সুস্পষ্ট চিত্র কাহিনীর অনুক্রমটিকে প্রতিকৃত করেছে। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আলেখ্য ও দর্শকের মধ্যে প্রাধান্য এখানে দ্বিতীয়ের। এতে এক দিকে কালিদাসকে আমরা পাচ্ছি, কিন্তু আস্বাদিত অবস্থায়। অপর দিকে এখানে একজন সাম্প্রতিক সময়ের কবি, যিনি একমুহূর্তের জন্যও পদক্ষেপগুলিকে সম্বৃত করেছেন সীমায়, যে সীমাটি মেঘদূত নামের কাব্য। প্রথমটির শিরোণাম দেওয়া যেতে পারে: কালিদাস ও একটি নতুন দৃষ্টিকোণ। দ্বিতীয়টির আলোচনা প্রধানত সুশীল রায়ের কবিকৃতি নিয়ে; যদিও প্রসঙ্গ-বহির্ভূত নয়, তথাপি পরিসরের কথা চিন্তা করে এখানে আমরা একবার শুধু স্পর্শ রেখে যাচ্ছি।

আলেখ্যদর্শনের পরিকল্পনায় দুটি নতুন প্রস্তাব প্রথমেই স্থাপন করা হয়েছে:

১. রেবা বেত্রবতী নির্বিন্ধ্যা শিপ্রা গন্ধবতী গম্ভীরা চর্মণ্বতী সরস্বতী জাহ্নবী— এই নদীরা শুধুমাত্র স্রোতস্বিনী নয়, এরা এক-একটি মানবী; দূতরূপী মেঘের অভিযানপথে এরা বিচিত্র রূপে এসে মেঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।

২. মেঘদূত কাব্য নয়, কাব্যরূপী নাটক। কালিদাস এখানে সূত্রধার মাত্র। মেঘ এই নাট্যের নায়ক, নদীরা উপনায়িকা, নগর ও পর্বতেরা এর প্রধান পাত্র এবং অলকাপুরীর যক্ষিণী নেপথ্যনায়িকা।

প্রথমটির সূত্র সম্ভবত মেঘদূতের ত্রয়োদশসংখ্যক শ্লোকে, যেখানে অনুকূল মার্গের বিবরণ-প্রসঙ্গে যক্ষ মেঘকে উপদেশ দিয়েছেন ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘুপয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুক্ত। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি মেঘদূত-আলোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। এবং এই প্রস্তাবকে সপ্রমাণ করবার জন্য লেখক সামান্য স্বাধীনতা নিয়েছেন। বিবৃতিধর্মী এই কাব্যখানির অন্তরে ফল্গুধারার মত অন্তঃশীলা নাটকীয় গতি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, এক শ্লোক থেকে অপর শ্লোকে পৌঁছানোর পথ ওই কারণেই হয়তো এত আকর্ষণমদির হয়ে উঠেছে। কিন্তু মূল কাব্যের সমস্তটুকুই যক্ষের স্বগতোক্তি, মেঘ সেখানে উপলক্ষ্যমাত্র। এখানে মেঘই প্রথমাবধি সক্রিয়, যক্ষ নেপথ্যে। গ্রন্থের পরিকল্পনায় এটি অবশ্যই অপরিহার্য। নায়ক এখানে মেঘ, সে পরিব্রাজক। যদিও কবির (যক্ষ বা কালিদাস) হৃদয়ের নিবিড় বেদনাই তার শরীর, তবু পথে নেমে

সে নিজেই কবি হয়ে উঠেছে। তার যাত্রাপথে একের পর এক সঙ্গলোভাতুরার আহ্বান, কিন্তু তার গন্তব্য উত্তরাপথে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে নিজেকে পেয়ে নিজেকে চিনে নিজেকে অতিক্রম করে সে পৌঁছেছে অলকায়। যক্ষ তার মনের অভিলাষ দিয়ে রচনা করেছে যে আনন্দনিকেতন, তার সন্ধানের ব্রত গ্রহণ করে অতঃপর সে সেই অলকাবিহারী হয়েছে। পরিব্রাজকবেশে তার যাত্রা, নায়কের রূপে তার অভিযান শুরু। সেই নায়ক পরিব্রাজক অবশেষে কবির সাধনায় আত্মসমর্পণ করেছে। পূর্বেই বলেছি, আলোচ্য গ্রন্থখানি মেঘদূতের আরেকখানি টীকা নয়, নতুনতম একটি আবিষ্কার। শ্রীযুক্ত সুশীল রায় মেঘদূত কাব্যটিকে আরেকবার নতুন আলোয় সিঞ্চিত করে নিয়েছেন।

উনিশ শতকীয় এক ফরাসী কবি লিখেছিলেন, কাব্যালোচনায় কবিরই একমাত্র অধিকার। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, কবির চরিত্রে দুটি ব্যক্তিত্ব সংহত থাকে, তিনি অনুভব করতে পারেন বলেই সেই অনুভব বিশ্লেষণের অধিকারী। কাব্যোপভোগের ফলশ্রুতি হয়তো একটি সনেট, কিন্তু অন্য যে কোনো প্রকার সমালোচনার চাইতেই তার সার্থকতা সমধিক। বলা বাহুল্য এই আলোচনার সার্থকতা যতখানি, বিপদ তার চেয়ে কম নয়। এখানে আলোচক সম্মুখবর্তী হন বটে কিন্তু আলোচ্য কুহেলীবিলীন হয়ে ওঠেনা। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের লেখক উপরন্তু গল্পলেখক। তিনি কবির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সহজেই মিলিয়েছেন গল্পকারের দায়িত্ব, গল্পকারের রূপকর্ম। সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে কালিদাস আস্বাদিত হয়ে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের কোথাও ফাঁক নেই। স্তরের পর স্তরে একটির পর একটি দৃশ্য সাজিয়ে তিনি নিপুণ কথকের মত আনুপূর্বিক বলে গেছেন। প্রত্যেকটি উপনায়িকার চরিত্র সংজ্ঞাবদ্ধ করেছেন শিরোণামে, কর্ম এবং ভাবনা সম্মিলিত করে তাদের প্রাণ দিয়েছেন অবশিষ্ট আলোচনায়। নায়কের প্রতিটি হৃদয়ভারকে আলোকিত করেছেন। স্বর্গের প্রতিটি আলোকরেখাকে সুস্পষ্ট করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত আলোচনার দ্রুতগতি এখানে নেই, তিনি অত্যন্ত মন্থর গতিতে এখানে এগিয়েছেন, বলা যায় পাঠকের সঙ্গে সন্ধি করেই এগিয়েছেন। এবং সে সন্ধির ফল যথেষ্ট শুভ হয়ে উঠেছে। পাঠক এখানে বারবার পিছিয়ে পড়বেন না। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথে যে অস্থির সংকেতময়তার ভার পাঠকের উপর বর্তায়, সেই সংকেতময়তাকে ইচ্ছে করেই সুশীল রায় আরও নিঃসংশয় করে দিতে

চেয়েছেন। এক দিকে তিনি একটি নতুন রচনা করেছেন, অপর দিকে তাঁর প্রতিটি অনুসন্ধানের প্রবাহকে পাঠকসাধারণের মধ্যে বিসর্পিত ক'রে দেওয়ার অভিলাষ তাঁর প্রতিটি বক্তব্যকে সুবোধ্য ক'রে তুলতে চেয়েছে। সহায় হয়েছে তাঁর ভাষার প্রসাদগুণ। প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে একটি নিশ্চিত অনুষঙ্গ ফুটিয়ে তুলে তিনি পাঠককে গ্রন্থের মধ্যে টেনে নিয়েছেন।

আলেখ্যদর্শনের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কথামুখ রচনা করেছেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। একজন পাঠক হিসাবে আমি এই গ্রন্থের বহুসমাদর কামনা করি।

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের কথা

বোধ হয় তাঁর কীর্তির চেয়ে তিনি মহৎ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমসাময়িক কবি ও অনুজ কবিরা তাঁর সম্বন্ধে যে প্রশস্তি রচনা করেছেন তার প্রায় সবগুলিরই জোর তাঁর মহত্ত্বের উপর, অর্থাৎ তাঁর বন্ধুত্বের ও তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর; তাঁর কবিত্বের উপর নয়। বন্ধুত্বের উপর —যথা, তাঁর লোকান্তরে একজনের "অস্তিত্ব থেকে একটি অংশ অসীমের গহ্বরে মিলিয়ে গেল"; ব্যক্তিত্বের উপর— যথা, তাঁর সম্মুখে যেতে একজনের "হাঁটু কাঁপছিল"।

যাঁরা তাঁর অনুরাগী ও ভক্ত পাঠক ছিলেন তাঁরা তাঁর কবিত্বের উপর জোর দিতে পারেন নি, আমরাও নাহয় আপাতত না দিলাম।

গত ২৪ জুন ১৯৬০ রাত্রি আনুমানিক তিনটের সময় মৃত্যুর অতর্কিত আক্রমণে তিনি নিহত হয়েছেন। অপরিণত বয়সেই, মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে, তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত।

সুধীন্দ্রনাথ সৌভাগ্যবান পুরুষ। তাঁর জীবন সহজ জীবন। অভিজাত ও বিত্তশালী বংশে তাঁর জন্ম, সুতরাং জীবনের আসল যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি নিস্তার পেয়েছিলেন— জীবনধারণের কায়ক্লেশ কাকে বলে তা জানার সুযোগ তাঁর ঘটে নি; যে কবিখ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন তাও সহজলব্ধ, এর জন্যেও যন্ত্রণা বেদনা সাধনা আরাধনা ইত্যাদির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী পরিচয় তাঁকে করে নিতে হয় নি, তাঁরই সমসাময়িক আর-পাঁচজন সাধারণ ঘরের কবিদের যেমন করে নিতে হয়েছে; এবং, অবশেষে তাঁর মৃত্যুও এসে গেল সহজে— কোনো রোগ না, রোগযন্ত্রণা না, একেবারে অতর্কিতে তার আগমন।

বহুকাল যাবৎ তাঁর সম্বন্ধে আমরা নানা কথা শুনেছি। তিনি যে খুব তেজীয়ান কবি, এবং তাঁর নিজের স্বাস্থ্যের মত তাঁর কবিতাও যে বলিষ্ঠ— এ কথাও আমরা শুনেছি। কিন্তু তাঁকে আমরা জেনেছি অন্যভাবে— তিনি একজন সুযোগ্য সম্পাদক; বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদন করে পত্রিকাটির বিশেষ মর্যাদা রচনা করেছিলেন। এর জন্যে বাংলাসাহিত্য বোধ করি তাঁর কাছে ঋণী।

এবং অনেক কবিও তাঁর কাছে ঋণী, কেননা, তিনি তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতনির্ভর কঠিন শব্দবিন্যাস করেছেন সুধীন্দ্রনাথ; এতে আমরা চমকিত বা পুলকিত হতে পারিনি, কেননা ইতিপূর্বে অনুরূপ কাজের সার্থক ও সুন্দর নিদর্শন দিয়েছেন দত্তকুলোদ্ভব আর-একজন কবি—মধুসূদন। ছন্দ সম্বন্ধে খুব সতর্ক ও ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ; কিন্তু ছন্দের কারুকাজ ও বৈচিত্র্যই কবিতার প্রধান গুণ বলে বিবেচিত হলে কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের থেকে অবশ্যই অনেক বড় হচ্ছেন দত্তকুলোদ্ভব আর-একজন কবি— সত্যেন্দ্রনাথ।

সুতরাং এ-সব বিচারে লিপ্ত হতে আমরা ইচ্ছে করি নে। বিত্তের অধিকারী ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ – এটাও বড় কথা নয়। সেই প্রভূত বিত্তের সঙ্গে তিনি যে তাঁর প্রসন্ন চিত্তের সমন্বয় সাধন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে সেই দুর্লভ যুগলমিলনের সমাপ্তি ঘটল।

আমাদের কাছে একটি পত্রিকা এসেছে— কবিতার পাক্ষিক পত্রিকা ক ল্প দ্রু ম। "প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা— শুক্রবার ১৫ই আষাঢ় ১৩৬৭, ইং ২৯শে জুন ১৯৬০। সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন, হস্তকলা দ্বারা মুদ্রণ, কোরাপুট হইতে মুদ্রিত, দণ্ডক হইতে প্রকাশিত।"

ফুলস্ক্যাপ সাইজের একটি শিটের এ-পিঠ ও-পিঠ লিথোয় ছাপা কাগজটি। সঙ্গে এই চিঠি এসেছে—

মাননীয় সুধীজন
করি আমি নিবেদন
কল্পদ্রুম প্রাপ্তিপত্র
অনুগ্রহে দিন শীঘ্র
কল্পদ্রুম প্রবর্ত্তক
পত্রে ইতি সম্পাদক।

দণ্ডকারণ্যে গিয়েও বঙ্গসন্তানেরা কবিতাচর্চা ত্যাগ করেন নি দেখে আমরা আনন্দিত ও বিস্মিত।

সুশীল রায়

'যক্ষপত্নী' চিত্রের ব্লক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

আধুনিক কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব

গুরুদাস ভট্টাচার্য

'আধুনিক বাংলা কবিতা দুর্বোধ্য; এবং তাই একেবারেই নাস্তি'—এই প্রস্তাবের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে মন্তব্য দিয়ে কথারম্ভ না করে স্বীকার করা যাক আধুনিক কবিতা সম্পর্কে দুর্ভেদ্য দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সাম্প্রতিক নয়। বস্তুত বেশ একটু পুরনোই। এই বোধ-অগম্যতার জন্যে ভট্টিকাব্যের লেখক আত্মদম্ভে স্ফীত হয়ে উঠেছিলেন এবং ভামহ তাঁর সেই দম্ভকে ব্যঙ্গোক্তি দিয়ে আঘাত করেছিলেন। তারও পরে অনেকবার মহাকালের আদালতে এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যেসব কবিতাকে বর্তমানের অনেকে 'তরল রচনা' বলে মনে করেন তার অনেকগুলিকেই একদা এই ধারায় দায়রা সোপর্দ করা হয়েছিল। তাঁর শেষজীবনের অনেক কবিতা আজও এই দুর্নামে কলঙ্কচিহ্নিত। এলিঅট বা সিটওয়েলের কবিতা সম্পর্কে ভীতি আজ সর্বজনীন না হলেও অধিক-জনের এবং 'অ্যাঙ্‌গ্রি ইয়ংম্যান' ও 'বিট্ জেনারেসন'-এর রচনাবলী সম্পর্কেও অনুরূপ অভিযোগ আজ সাগরপারে ধ্বনিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সে অভিযোগ সর্বত্রই বিশুদ্ধ শূন্যবাদী নেতি-ঘোষণা নয়।

ঠিক এইখানেই দুটি প্রশ্ন আমাকে বিব্রত করে। প্রথমতঃ, কবিতা অধিকাংশের কাছে আজ অস্পৃশ্য মনে হয় কেন। সে তো সাহিত্যের আসরে নবাগত নয়। সেই আদিমকাল থেকেই সে মানুষের নিত্যসঙ্গিনী, তার কর্ম ধর্ম ও মর্মের সহধর্মিনী। তার উপর, মানুষমাত্রেই তো কবি। কোনো বিশেষ ঘটনার অথবা হৃদয়ের দুর্ঘটনার ভাবের বলাকা আপনিই ডানা মেলে। বৈবাহিক পদ্যের সারস্বত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপিতে তার স্বতঃ-সুরভি। কবিতা তো জীবনবিরহী নয় এবং কবিতা, গানের পরেই, অন্তরতম। অথচ পরকীয়া কবিতা, পত্রিকাপত্রস্থ কবিতা দেখলেই চোখ পিছলে যায়, পাতা উলটে যায়। এর কারণ আজও অজানা। দ্বিতীয়তঃ, সুবোধ্যতাই কি কবিতার একতম-অন্যতম লক্ষণ? তা হলে স্কুলপাঠ্য সহজ-পাঠ্য কবিতা তথা পদ্যগুলিকে বধ করার জন্যে শিক্ষকদের এত পরিশ্রম

করতে এবং ভারীভারী অর্থপুস্তক লিখতে হয় কেন। সে কি শুধুই শব্দভেদী, আর কিছুই না? তবু তো ঐসব অর্থপুস্তক অবশ্যপাঠ্য; কিন্তু তার বাইরে যে বিপুল কবিতার জগৎ, সেখানে তো প্রবেশ-তোরণে এমন কাঁটাবেড়া নেই। তার অর্থপুস্তক, তথা সমালোচনা, বাজারে দুষ্প্রাপ্য নয়; কিন্তু সেগুলি তে অবশ্যপ্যঠ্যও নয়। অনায়াসেই পাঠক-মন কবিচিত্তের মুখোমুখি বসে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদ বিনামূল্যে বিনিময় করতে পারে। তবে?

এখানে হয়তো বলা হবে, প্রাগাধুনিক কবিতার শব্দার্থ মাত্রই জটিল, আধুনিক কবিতার সর্বাঙ্গ। সত্যই কি তাই? কিন্তু এ আলোচনা এখানে নয়, এখন নয়। তবে পালটা প্রশ্ন নিশ্চয় করতে পারি—এখনকার কবির মন যদি জটিল হয়, তবে সমশিক্ষিত পাঠক-মনও তো কম জটিল নয়। দুজনেই সমকালের আবর্তে ভাসমান ও ক্রিয়াশীল, অবচেতন মনও সকলেরই আছে। এবং মনস্তত্ত্ববিদের কথা মানতে হলে অবচেতন মানসে যে প্রক্রিয়া ও রূপান্তরিত প্রতীক বা চিত্রকল্পের জন্ম হয়, তা সব মনে প্রায় একরকম। কবিরা তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছড়িয়ে-গুটিয়ে প্রকাশ করেন মাত্র। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব কিছুটা চিত্র-স্বাতন্ত্র্য তৈরি করেও বটে, তবে জানাশোনা ছবি রেখা রঙ থেকে তারা খুব বেশি দূরেও নয়। অন্যপক্ষে প্রসারিত হয়ে এলে মানুষ মাত্রেরই রূপরেখার অদলবদল হয়, কিন্তু তাই বলে এমনটি নিশ্চয় হয় না যে চেনামহলের মানুষকে, মনের মানুষকে, মানসীকে একেবারেই চিনতে পারব না। অবশ্য না-চেনার ইচ্ছা বা অগ্রহের অভাব থাকলে আলাদা কথা।

আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা তার নিজের মধ্যে যতটা, তার চেয়েও বেশি এই বাইরের, এই না-জানবার ইচ্ছা বা অনাগ্রহের মধ্যে। ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগ এই নিস্পৃহ নির্বেদকে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে তুলছে এবং কবিতার কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে দুর্নামের বোঝা, যে বোঝা বইবার কথা তার নয়। একটি শূন্যগর্ভ কথাও বারবার বলতে-বলতে সত্য হয়ে ওঠে না বটে, তবে সত্যের মত প্রতিভাত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতা তথাকথিত এবং এইরকম একটি ফুলিয়ে তোলা বিয়োগান্ত অভিযোগ।

অভিযোগ যখন ভিত্তিহীন এবং আসামী যখন নির্দোষ, তখন এ-ব্যাপারে কর্ণপাত না করাই সমীচীন— ঐ মনোভাব সাধুবাদের যোগ্য। কিন্তু সত্য

স্বয়ংপ্রকাশ হলেও তাকে প্রমাণিত করতে হয়, প্রতিষ্ঠা দিতে হয়। সেইদিক থেকে তিনটি প্রস্তাব সকলের কাছে রাখতে চাই।

প্রথম প্রস্তাব— আধুনিক বাংলা কবিতার সম্যক্ রসাস্বাদের জন্যে এগিয়ে আসতে হবে পাঠক-সম্প্রদায়কেই। আজকের কবি-ব্যক্তিত্ব আত্মবৃত্তে বক্র ও মননে জটিল, তাই তাঁদের কবিতাও, ইত্যাকার সুভাষিতাবলীর প্রতি কান না দিয়ে এবং পূর্ব-সংস্কারগুলিকে সংস্কৃতির গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ে আয়োজন করতে হবে মানসসমৃদ্ধির ও মানসপ্রস্তুতির। যাঁদের আছে, তাঁদের অনুশীলন ও প্রয়োগ করতে হবে; তাঁদের বুঝতে হবে আজকের পরিবেশ ও আবেশকে, আজকের মনন ও মানসকূটগুলিকে; জানতে হবে সচেতন ভাব এবং অবচেতন ভাবনাগুলিকে। সেইসঙ্গে এই ভাব-ভাবনার বিশিষ্ট প্রকাশ-কলাকেও। আমাদের জীবন যেমন ছাঁচে ঢালাই নয়, আমাদের মানসবৃত্তিও তেমনি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে কাজ করে না। জীবনের ঘটনাগুলি, মনের বাসনাগুলি অস্খলিত হলেও অসজ্জিত। এবং বাস্তবে যা ঘটে, মনে তার ভাব যথাযথ থাকে না; কমবেশি সাজবদল করে। আজকের কবিতা এই আপাত-বিক্ষিপ্ত মানস-চিন্তার মালা। সেই মালার ফুলগুলি যে-সুতো দিয়ে গাঁথা, তার নাম 'ভাবানুষঙ্গ'। সেই সুতো ধরেই ব্যঞ্জনার আলোর পথ চিনে-চিনে রসতীর্থে পৌঁছনো যাবে। এই ভাব ও ভাব-বয়নের রীত্‌কানুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা সহজসিদ্ধ হলে কবিতাও সহজসাধ্য হবে। নিরন্তর অনুশীলনের দ্বারা তার তীর্যক বাগ্‌বিন্যাস এবং প্রতীকধর্মী চিত্রকলাও পাঠকের বিনীত অনুগামী হবে। এগুলি কোনো বাধাই নয়, আসল বিপত্তি ঐ পূর্ব-সংস্কার এবং অনভ্যাসের অসমতল পাঁচিল। নতুনের ক্ষেত্রে চিরকালই এমন হয়, প্রথম-প্রথম অস্বস্তি, তারপর একদা এক সুন্দর প্রভাতে নতুন রূপরাজ্যের জগৎ হঠাৎ-খুলে-যাওয়া।

প্রশ্ন হবে, কেন এতো কষ্ট করব? উত্তর হবে, কেন করব না? তবে তা এমন কিছু নয়, শুধু ঐ বাধা-বিপত্তিটুকু পেরিয়ে আসা। আলোর জন্যে, ভালোর জন্যে, ভালোবাসার জন্যে একটু কষ্ট একটু ঝুঁকি সামান্য একটু সাধনা— তাও করব না? আর সাধনা তো করছি নানাভাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পশুর বাচ্ছা পশু হয়েই জন্মায় কিন্তু মানবপুত্র জন্মায় খালি হাতে, তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। সেই অতিআবশ্যিক অর্জনের উপর আর

একটু উপরি-পাওনা— শিল্পরসিক হওয়া, মনকে সংস্কৃত করা, তাকে কাল ও কলার সমতালে এগিয়ে দেওয়া।

কিন্তু তা ব'লে সব দায়িত্ব পাঠকগোষ্ঠীর নয়। কবিদেরও দায়িত্ব আছে। এইখানে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব। কবিতা কবিতাই, পূজোর ফর্দ নয়, ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত তার রদবদল করা যায় না, যা লেখা হল, তা না লিখে উপায় ছিল না। তবু চেষ্টাকৃত কষ্টকল্পিত পারিপাট্যের রেওয়াজ যে এখনও নেই, তা নয়। তবে আগের মত উগ্র নয়। তবু সাধারণ পাঠকের কথা মনে রেখে এবং অতি সরলীকরণ না করেও ভাব-ভঙ্গিকে সহজতর করা দুঃসাধ্য নয়। আজকের কবিতার মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত অবিরল। হাতের কাছে 'ধ্রুপদী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অন্য-কিছুর অভাবে' কবিতাটি, এমন সহজ-স্বাভাবিক সংযত-নিটোল কবিতা; দুর্বোধ্যতার বিন্দুমাত্র কালো দাগও তো ওর গায়ে নেই, অভাব নেই তিলোত্তম-ব্যঞ্জনার।

শুধু রচনার ক্ষেত্রে নয়। স্বকীয় ও পরকীয় কবিতার রূপ ও রস সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াও কবিদের অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করি— বিশেষত যাঁরা এ বিষযে বলতে ও লিখতে পারেন! আধুনিক কবিতার ভোজে সকলকে সপরিবারে সবান্ধব আমন্ত্রণ জানানো যাবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু কেবলমাত্র কবি ও কাব্যরসজ্ঞ মহলে নয়, তার বাইরে আরও যত জনকে এখানে আনা যায়, সেও তো আনন্দ। এ সম্পর্কে অনেকের যে একজাতীয় অনীহা আছে, সেগুলি সংস্কার নয়? পাঠকের যেমন সংস্কারমুক্তির প্রযোজন, তেমনি কবিরও তো। বিষয়টিকে অল্প কথায় অথচ ভালো লাগার মত করে তুলে ধরেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'ধ্রুপদী'রই দ্বিতীয় সংখ্যায় ("কেমন লাগল")—'কবি আমাদের সময দিন। আমরা তাঁর কবিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। তিনি আমাদের জন্য প্রস্তুত হোন।'

এই 'প্রস্তুতি' কেবল আত্মপ্রকাশে নয়, আত্মপ্রমাণেও।

এখানেই আমার তৃতীয় প্রস্তাব। আধুনিক বাংলা কবিতার (এবং স্থির চিত্রকলার এবং নিও-রিয়েলিস্‌টিক চলচ্চিত্রের) জনপ্রিয়তা সৃষ্টির সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব সমালোচকের। কবিতা ও পাঠকের যোজকসেতু তিনি। এখানেও অবশ্য কাজ হচ্ছে— মুখে ও লিখে। সে সবই মূল্যবান, এদেরও

প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঐ গণ্ডীকে আরও বড় করতে হবে, আধুনিক কবিতা যে সরল না হলেও নিতান্ত অসহজ বা নাবুঝ নয়—এই সত্যটি সাধারণের কাছে নিয়ে আসতে হবে। কোনো বাঁধাধরা পদ্ধতিতে নয়, রসায়ন-রীতিতে। অনেকে বলবেন, এও তো একরকম মাস্টারী—ক্লাসের বদলে সভায় এবং অর্থপুস্তকের বদলে সমালোচনা-সাহিত্য নামে। বোধহয় নয়। অন্তত ততদূর নয়। আজকের কবিতাপাঠক আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন এবং অনেক কম অপ্রস্তুত। তাই কাজটা হবে একটু খেই ধরিয়ে দেওয়া, পথটা চিনিয়ে দেওয়া, কবিতার ভাব-ভঙ্গি সম্পর্কে সামান্য অবহিত করে তোলা, মনের গায়ে লেগে-থাকা ভয়টাকে টুস্‌কি দিয়ে সরিয়ে ফেলা। ঐ ভয়টুকু খসে গেলেই আর পায়ের তলে পথটা পেয়ে গেলেই মন এগিয়ে যাবে, মাঝে মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হলেও তারার আলোয় পথ চিনে চিনে ঠিক কবিতার আকাশে পৌঁছে যাবে।

শীত

সুনীল বসু

পাতা চুয়ে চুয়ে ফোটা ফোটা জল টুপ টুপ ঝরে
রোদের মুকুরে হাসির রাঙিমা ফোটায় সকাল ;
আমি চেয়ে দেখি প্রাকৃতিক দেহ নগ্ন-প্রবাল
দেবশিশু ওই জলক্রীড়ায় কাক-সরোবরে।

অপরূপ দিন কর্পূর-শাদা, কার্পাস মেঘ
রোদ্দুরে জলে হীরকের দ্যুতি, ঘাসের সাটিন,
রাত্রি রূপসী মুছে ফেলে মুখে ক্ষত উদ্বেগ
আকাশের হাত ঘননীল রঙ খোলে আস্তিন।

বকুল-বাগানে নানারঙ-পাখি সুরের ফোয়ারা
প্রভাতে ছড়ায়, জলছবি-মুখ নায়িকা শায়িত,
শেজ-নেভা ঘরে শীতের আমেজ, আরামকেদারা
বিছিয়ে বসেছি. দেখি শিশিরের অশ্রু গলিত।

শ্বেত-পাথরের শুভ্র সোপানে নীল কবুতর
হীরা খোটে ঠোঁটে, সিঁদূরের রঙ রক্তশাড়ির,
পরীর চিবুক তন্বী অঙ্গ— ঝরে নির্ঝর
রেখায়িত রূপ, হাতে ধরে দেখ লজ্জা আবীর॥

শান্তিনিকেতনের কোনো ঘর : বার্নপুরের একটি সুর

প্রসেনজিৎ সিংহ

এবার কোনো শ্রাবণ-রাতে লুকিয়ে যদি আস—
কখনো আমি জানতে পারব না তা,
তন্দ্রালীন অন্ধকারে দুয়ারে দাও মৃদু
আঘাত ; আমি হঠাৎ জেগে ঘুমের সেই পাতা
ঝরিয়ে দিয়ে, অবাক্ হয়ে ভাবব কিন্তু যা-তা ॥

আকাশ যেন তারার দীপ মেঘের কোলে জেলে
মগ্ন ধ্যানে ; নীরবতার অপূর্ব সে সুরে
বাতাস যেন কান্না হয়ে রবীন্দ্রসংগীতে
সরিয়ে দিল শ্রান্ত ঢেউ, ছড়িয়ে নিল দূরে,
বিস্মিত এ চিন্তাকে রে : দ্বারে কে এলো ঘুরে ?

হতেই পারে লজ্জাহীনা রিক্ত কোনো রাতে
সহসা এলে পূর্ণমনে বিষণ্ণ এ ঘরে।
তবুও আমি সাহস করে সে দ্বার নাহি খুলে
ভাবব জেগে হাওয়ারা এসে যন্ত্রণার 'পরে
ব্যথার হাতে লিখল গান আশার মর্মরে ॥

কিম্বা যদি আগল ভেঙে প্রদীপ প্রাণে জেলে
ঢুকেই পড়ো নম্র পায়ে, তোমায় ঘরে পেলে
তখন হবে তোমায় চেনা দু চোখে চোখ ফেলে ॥

দুটি কবিতা

গৌরীশঙ্কর দে

খ্যাপা খুঁজে ফিরে

মনে ছিল
পৃথিবীকে হৃদয় চিনুক,
একা আমি বালু খুঁড়ে
কুড়াবো ঝিনুক,
হয়তো বা মিলে যাবে
যন্ত্রণায় প্রবালের ফুল ;
রঙিন সম্পদ নিয়ে পড়ে রইল সমুদ্রের কূল।

আমরা এখনি যদি হতে পারি দুটি প্রজাপতি,
নীল আকাশের নীচে আগুনের মত একটি ফুলে
আমাদের দেখা হয় ভোরের সোনালি উপকূলে,
তা হলে শাশ্বত আমি, আর তুমি— তুমিও শাশ্বতী

হয়তো দিনের শেষে ঝরে যাবে আমাদেরও প্রাণ,
ফুরাবে মেঘের মুখে অবশেষে আকাশের গান,
তখনো রঙের ছটা পাশাপাশি নিঃস্পন্দ ডানায়
চলেছে আলোর স্রোত সন্ধ্যার বিশাল মোহানায়।

জ্যোৎস্নারাতে অন্ধকার

শিবশম্ভু পাল

জ্যোৎস্নারাতে অন্ধকার সুকঠিন দু হাত বাড়িয়ে
আমারে নিবিড় করে ; অথচ সম্মুখে স্মিত রূপসীর দেহ
রূপালি সবুজ পাতা, জনপদ, বাড়ির দেয়াল
নীলিম রাত্রির দৃশ্য গুচ্ছে গুচ্ছে সুগন্ধ ছড়ায়...
সবাই গিয়েছে বনে, আমি শুধু বন্দী হয়ে আছি।
হৃদয়ের শাখা হতে সকল ললিত স্তর হলুদ পাতার মত ঝরে।

আমারে যাবে না ছেড়ে কোনাদিন সেই দুর্নিবার
যতই আকুল রক্তে বলি, 'যাও সুখাবহ নদীর ওপারে।
এখন ভ্রমণ হবে, খেয়ালের শাদা পালে অনুকূল বাতাসের স্নেহ ;
চেয়ে দেখ রূপসীরে যেন দেহাশ্রিত ইন্দ্রজাল
সার্থক গানের শেষে অনুভূত পরিব্যাপ্ত স্বর্গলোক, দেখ।'
নিরুত্তর শিলাখণ্ড অন্ধকার, সে আমার প্রবল আড়াল।

মন্ত্রমুগ্ধ ক্রীতদাস ; আমার সর্বাঙ্গে তীব্র চাবুকের দাগ
বিদীর্ণ করেছে চামড়া। উন্মুক্ত জীবন্ত হয়ে ওঠে
মদের জান্তব ফেনা বেপরোয়া। হে আঁধার, তুমি,
দেখিয়েছ, প্রিয়তমা শুধুমাত্র তরঙ্গিত খেলার প্রান্তর।

কোথাও ফুলের শুভ্র মুক্তির জানালা খোলা নেই।
প্রথম রাত্রির লগ্নে তুমি তো আমারই সৃষ্টি, স্নেহের আত্মজ,
প্রশ্রয়ে শৈশব গেছে, অভ্যাসিত, অতঃপর এখন সম্রাট।
জ্যোৎস্নারাতে আমি যেন পরাজিত বন্দী শাজাহান।

কে তোকে যৌবন দেবে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কে তোকে যৌবন দেবে, মা তোর শৈশবে পলাতক।
তুই তো জানিস, শুধু সেই পারে চাঁদ ধরে দিতে!
আমরা যতই হাত উর্ধ্বে তুলি— চতুর্দিকে অপার শূন্যতা।
স্নেহময়ী অন্ধকার, সর্বস্ব সে দাবি করে সময়ের মত।

মৃত্যুর যেটুকু স্বত্ব, তার বেশি সে দাবি করে না।
ওরা সব চায় : দুঃখ-সুখ-আলো-প্রেম-প্রণয়িনী—
এবং বন্ধুর ছবি, পরিচিত নিবিড়-হৃদয়
মহৎ আকাঙ্ক্ষা গান দূরস্মৃতি ব্যর্থতা অবধি।

তবে কে যৌবন দেবে? অসম্ভব প্রার্থনা এ তোর।
বরঞ্চ প্রতিষ্ঠ হও বয়সের স্বধর্মে। কামনা
সুস্থির হলেই সেই পিতামহ-পিতামহী বহু দৃশ্য হবে।—
আবর্তে অদৃশ্যমুখ। স্থিরজলে বলিরেখা অভিজ্ঞ সম্মান।

সোনার হরিণ চাস? সেও তো মৃত্যুরই হাতে নিয়ন্ত্রিত আলো!
পদ্মের পাতায় জল— জাদুকর দক্ষ হাওয়া নিশ্চিত নিয়তি।

টবের ফুলগুলোকে দাও

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ করে। কার্নিশে ছড়ানো লাল জামা
এইবার তোলো, নয়তো ভিজে যাবে উচ্ছৃত পশলায়।
ফুলের টবগুলোকে দাও, সিঁড়ি থেকে ছাদে টেনে ফেলে—
মাটিতে ছড়াতে দাও ইতস্ততঃ-ভ্রষ্ট মূল ওর।
নয়তো কী দিয়ে বাঁধবে শিখারূপী ব্যক্তিত্বের ভার
সটান সবুজ, যার দাঁড়িয়ে থাকাই মনোগত
ইচ্ছা, তাই বলি, নয়তো অভিলাষও বলতে পারতাম।

মেঘ, পুঞ্জ ভেঙে চলে কাপড়ের মত ভাসমান
বলে ফেল্‌লে। লাল জামা, নিশ্চিত, উগরেছে সব রঙ
ডাঁই-করা খণ্ড-বস্ত্রে। চরিত্রের খণ্ডতা, তোমার
আলো লেগে ধাবমান তিনতলায়, উন্মুক্ত সদরে।

টবের ফুলগুলোকে দাও বৃষ্টি পেতে, শিকড় বসাতে
টবেরই ঝামায়, পোড়ামাটির জীবনজোড়া পাত্রে ;
তৃষ্ণা, তাই বলি, নয়তো পিপাসাও বলতে পারতাম।

কালবৈশাখী

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

উত্তর-পশ্চিম কোণে ঝড় ওঠে ঘুরে ঘুরে, ঝড় ওঠে পশ্চিমের মেঘে
বৈকালী পশ্চিম দিক লালিমা-বিলাসী হয় ঝ'ড়ো কত ঘন মেঘে মেঘে ;
দিগন্তের প্রান্ত ছোঁয়া পেয়েছে সূর্যের আলো কৃষ্ণচূড়া রাঙা রঙ মাখা,
সোনালী আলোয় ফিকে, ঝল্‌মল্‌ করে শুধু পাটকিলে চিলেরই পাখা।

এ চিল চিরটা দিন পাত্‌লা পালক নিয়ে পাখাভর করেছে বাতাসে,
হয়তো হারিয়ে গেছে অনন্তের সীমাশূন্যে হতাশার বিষাক্ত নিশ্বাসে ;
একটি শিশুর চোখে পৃথিবীর আলো যেন শেষ হয়ে এল এইবার
সমস্ত চেতনা দিয়ে সে চায় চাইতে আজ হাজারো দৃষ্টির ভিড়ে বারবার।
অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে ; সূর্য-শেষ-আলো মোছা আকাশে আসন্ন সন্ধ্যা নীল,
গুড়িগুড়ি কত তারা চুমকির চেকনাই, একটি শিশুর দৃষ্টি অনাবিল—
সেই তো বিকেল থেকে তাকিয়ে দেখেছে ঠিক অবাক চোখের চাউনিতে
রঙ-ছুট বৈকালীর চঞ্চল রূপের স্রোতে সুদূর মেঘের ছাউনিতে।

একটি শিশুর চোখ ভয় খায় ; চিল বুঝি ছোঁ-ই মারে ছোট্ট তার হাতে !
ঝড় এলো, এলোমেলো, এখানের মন আর অনেক কিছুই গেল সাথে—
তারপর গোধূলির সূর্য পাটে পট্টবস্ত্রে গৈরিকের, আলো হল ক্ষীণ,
শিশু ভাবে চিল দিলে দিনের আলোতে বুঝি একটি ছোঁ, তাই কালো দিন।

অন্ধকারে পশ্চিমের মেঘ ছুঁয়ে ঝড় এলো অগুন্তি ধূলির আবর্তনে,
ভীরু-শিশু চোখ তার বুঁজে আসে ; দৃষ্টি তবু, হাজারো যে আয়াস দর্পণে।

দ্বিধা

অধীর সরকার

ভিখারি-মন সেদিন কেন কথার মালা গেঁথে
গিয়েছে সেইখানে,
যেখান থেকে মহুয়া-মাস কেন কিসের টানে
পাগল করে তারে ;
ভিখারি-মন স্বপ্ন দেখে গহন পথে যেতে
ফিরেছে বারে বারে।

অথচ সে তো দেয়নি সাড়া সেদিন কোনো কিছু
নেয়নি তার ডাক ;
তবুও দেখি হৃদয় তারি বিরহে নির্বাক ;
আকুল নিশ্বাসে
ব্যাকুল-করা সন্ধ্যা এল দিনের পিছু পিছু
মহুয়া-ঝরা মাসে।

কখন দেখি দীর্ণ হল নিথর নীরবতা
প্রেমের সৌরভে ;
ভিখারি-মন আবার কি সে গভীর অনুভবে
জাগাবে উল্লাস ?
প্রহর গেল দ্বিধায় কেটে, গহন কোন্ ব্যথা
ছড়াল মধুমাস।

এক আকাশ তারা

অমর ষড়ঙ্গী

অনেক অনেক শাস্তি। এক আকাশ তারা
খোলা ছাদে শুয়ে দেখি, যে আঁধার সেই তো আলোক।
তন্ময়তা উপজীব্য। একই প্রেম দ্যুলোক ভূলোক
পরিব্যাপ্ত— কালপুরুষ, সপ্তর্ষি কিংবা ক্যাসিয়োপিয়ারা।

রহস্যে আবৃত স্মৃতি জন্মদাতা সৃষ্টির প্রধান
কখনো হাওয়ায় মত্ত, কখনো বা রাতজাগা পাখি।
সুরে সুরে এক সত্তা। অপরিশোধ্য ঋণ বাকী
নীল আকাশের নীচে। শিশিরের বিন্দু দিয়ে স্নান।

গাছ, পাতা, ঘাস আর সবুজ প্রকৃতি
অসীম বিশ্বাসে পুষ্ট। অমার উদাস দৃষ্টি, মন
হাওয়ার শব্দই শোনে, তারা গোনে। রীনার যৌবন
সত্য বলে মনে হয়। এখন সে ঋতুমতী নদী।

নির্মল সন্ধ্যায়

কণাদ গুপ্ত

অনেক সোনার মন মরে গিয়ে তারা হয়ে আছে,
অনেক নেপথ্য প্রেম বিচিত্রিত ম্লান ছায়াপথে,
অনেক শপথ-ভাঙা গড্ডলিকা ভীরু অস্বীকার
প্রসারিত হয়ে আছে আকাশের উদার বিস্তারে।

অশ্রু হয়ে গেছে রস। সুপারি পরেছে শিরস্ত্রাণ
নিষেধের মাথার উষ্ণীষ। সমাজের কানাকানি
মর্মরিত হয়ে দোলে পাতায় পাতায় আর
আমের শাখায়। এখানে নেইকো কোনো বিধি।

পিঠে করে বয়নাকো কেউ ক্রূশদণ্ড
ভালবাসবার। জটিল তালের মাথা শুধু
আর কিছু নয়। এখানে নেইকো রাঙা চোখ
জ্বলে শুধু জোনাকী আর কি-একটা প্রশান্তির আলো।
এ শরীর, কাকে বলি; এও তো এক নির্মল অরণ্য
শরীর অরণ্য হলে আরণ্যক হবে না কি মন।

জীবনতপস্যা

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের পাহাড়

স্তরে স্তরে শ্বেত কৃষ্ণ ধূসর পিঙ্গল।

মেঘ শুধু ছন্দোময় রূপময় মেঘের বাহার

শূন্য পথে নির্নিমিষে চেয়ে থাকে

চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র মণ্ডল।

পার্বত্য অরণ্য শিরে নিশীথের রহস্য তিমিরে

শিশিরের মুক্তাবিন্দু দলে

রজতাভ্র জলে

ঝরে পড়ে একান্তে যখন সহস্র ধারায়

আকাশে মেঘের দল তখনি সঙ্গ হারায়।

জল ঝরে অবিশ্রাম শ্রাবণ বর্ষণ।

অঝোর অশান্ত জল উচ্ছল প্লাবন

আকাশের বাঁধ ভেঙে যায়।

মৃত্তিকাও নিজেকে হারায়,

বিস্মৃতির অন্ধকারে অতল গহ্বরে।

জীবনের সমস্ত সংকেত স্বাক্ষর হারিয়ে

অরণ্যের অতল গভীরে।

ইতিহাস লেখা হয়

শুষ্ক চ্যুত শাখা-পত্রাংশুকে

একান্তে নিভৃতে,

বৃষ্টিস্নাত মৃত্তিকার চন্দন লিপিতে

ইতিহাস লেখা হয় কালের কঠোর ইঙ্গিতে

হঠাৎ কুয়াশা নামে

সুকোমল বসু

হঠাৎ কুয়াশা নামে আমার এ মনটার চারি দিক ঘিরে
ভিজে-ভিজে গুঁড়ো-গুঁড়ো নরম ফ্যাকাশে অন্ধকার !
কিছুই যায় না দেখা, কিছুই যায় না বোঝা দূরে যা কিছুই
শুধুই নিজেকে নিয়ে হাতড়ে এগিয়ে চলা— না-জানার অকূল বিস্তার !
সামনে দু হাত দূরে অতল মৃত্যুর খাদ অথবা সে স্বর্ণ-সিংহদ্বার—
আছে কি অথবা নেই কিছুই যায় না জানা রহস্যের যবনিকাতলে
কালো ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলার আমেজে মন মজা পায় তাই বার বার !

কিন্তু সেও কতক্ষণ ?— কল্পনার কৃষ্ণগর্ভে রুদ্ধশ্বাস মনে তারই পর—
সূর্যের বন্দনা জাগে— আঁধারের বুক ভাঙে তীব্র স্পষ্ট আলোকসম্পাতে
প্রাপ্তি যত তুচ্ছ হোক মন পেতে চায় তারই প্রত্যক্ষ প্রত্যয়
তবুও কুয়াশা নামে রহস্যের পাখা মেলে—ডাইনে বামে সম্মুখে পশ্চাতে !

কুতুবমিনারে কিছুক্ষণ

অসীম সোম

এখানে অবশ বিশ্ব, মুখর অতীত
স্মৃতিকথা তরঙ্গিত বাতাসের ঠোঁটে।
রণক্লান্ত গ্রামান্তের মাঠে
ইতস্তত ভগ্নস্তূপ যেন অলংকার।

জোয়ার-ভাটায় জনস্রোত ; মুহূর্তের কথা
নিঃশব্দ ঘূর্ণির মুখে চূর্ণ হয়ে
মাথা কোটে ইতিহাস-পাথরের পায়ে।
ঐশ্বর্যের করুণ ব্যঞ্জনা —
বাসী সরাবের স্বাদ
অবলুপ্ত গোলাপনির্যাস
জীবনের স্বাদগন্ধ স্খলিত উচ্ছ্বাস
সমাহিত সময়ের স্রোতে।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে আরো দূর গ্রহান্তরে
চেতনার ক্ষণিক বিন্যাস—
সনাতন সাক্ষী শুধু
আয়ুহীন মাটি ও আকাশ।
অতীতের দেহ থেকে ধুলো ঝেড়ে
স্মৃতি তুমি, কি আশ্চর্য, অবয়ব নিয়ে উদ্ভাসিত।

প্রথম প্রেরণা, শেষ সান্ত্বনা

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার প্রথম দিনে কবিতার অক্ষরে কথায়,
সতর্ক শিল্পীর মত গড়েছি যে সযত্নে তোমায়,
অরুণিমা রায়।
চুপি চুপি নেমে এসে শিশিরের শব্দের মতন,
ভোরের কুঁড়ির গায়ে ছম্‌ছম্‌ ছায়ার কম্পন।
চোখ চেয়ে চারিদিকে মোম-রং সূর্যের উত্তাপে,
প্রথম কবিতা তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে
কার অভিশাপে।

যুগে যুগে যেই ছবি আঁকার উল্লাসে,
সারারাত পতঙ্গের পাখা উড়ে আলোর চারপাশে,
অনেক কবিতা পুড়ে হয়ে গেল ক্ষয়।
মরে-যাওয়া নক্ষত্রের হিম
সকালের পতঙ্গের মৃত্যুশীত কার্পেট-শয্যায়।
আমার উন্মাদ চিন্তা ঝড় হয়ে ভেঙে দিল লবঙ্গের বন,
উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল উত্তরের হাওয়া, নিল স্বাক্ষর নির্জন।
যশ এল, অর্থ এল, পরিশেষে সব গেল চলে,
লুপ্ত হল সূর্যের রঙিন টিপ পড়ন্ত বিকেলে।
সব শেষে প্রতিভার সৌম্য স্পর্শ রেখে গেল গোধূলি সন্ধ্যায়,
প্রথম কবিতা তুমি ফিরে এলে চুপিসাড়ে অরুণিমা রায়।

তুচ্ছ

সন্তোষ দাস

একফালি রোদ
এক মুঠো যুঁই
হাত দিয়ে ছুঁই
        তবু কিছু পাই ঘ্রাণ।
দেওয়ালেতে ছায়া
জীবনে তো অবসাদ
তবুও যা-পাই স্বাদ
        সেটুকু মাটির দান।
মায়াবী আকাশ
উদ্ধত ঝাউবন
নিঃস্ব সে নিস্বন
        হাহাকার হানে মনে
এক ফালি ঘাস
একটু মৃদুল হাসি
তাই ফিরে আসি
        রোদের নিমন্ত্রণে।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ১৮০৬-১৮৬১

চিত্ততোষ বাগচী

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ এক সম্পন্ন পরিবারে এলিজাবেথ ব্যারেট জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের তিনি প্রথম সন্তান। ছেলেবেলা খুব আদরে কেটেছে। মাত্র তেরো বছর বয়সে এলিজাবেথ *The Battle of Marathon* নামে একটি এপিক কাব্য রচনা করায় বাবা খুব খুশি হয়ে ছাপিয়ে দিলেন। দু বছর পরে মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এলিজাবেথ। ক্রমে তাঁর মেরুদণ্ড ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হল। লণ্ডন শহরে ওয়াম্‌পোল স্ট্রীটের একটি বাড়িতে এলিজাবেথ বন্দী হলেন। বাড়িতে নয়, বাড়ির একটি ঘরে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন কাটে; বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রইল শুধু বইয়ের মারফত। লেখা আর পড়া নিয়ে দিন পার হয়ে যায়।

১৮৪৪ সালে তাঁর একটি কবিতা-সংকলন বের হল। এই সংকলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা The Cry of the Children। খনিতে এবং কারখানায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের দিয়ে কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কাজ করাবার বিরুদ্ধে কবির দৃপ্ত প্রতিবাদ সেদিন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই সংকলনের একটি বিশেষ মূল্য আছে। সংকলনের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় এলিজাবেথ রবার্ট ব্রাউনিংকে শক্তিশালী কবি হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। ব্রাউনিং তখনো কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। সমালোচক ও পাঠকদের নিকট তাঁর কবিপ্রতিভা স্বীকৃতি পায় নি। সুতরাং এই অপরিচিতা কবির স্বীকৃতি লাভ করে ব্রাউনিং অভিভূত হয়ে পড়লেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে চিঠি লিখলেন তার প্রথম লাইন হল "I love you with all my heart, dear Miss Barrett"।

দুজনের পরিচয় হল। পরিচয় থেকে প্রেম এবং গোপনে বিবাহ। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই নববিবাহিত দম্পতি য়ুরোপে পালিয়ে গেল এলিজাবেথের বাবার ক্রোধ এড়াবার জন্য। ব্রাউনিং জানতেন, তাঁর স্ত্রীর জীবনের মেয়াদ আর বড়জোর এক বছর। কিন্তু আশ্চর্য, ভালোবাসা এবং ইতালীর উষ্ণ আবহাওয়া এলিজাবেথকে সুস্থ করে তুলল। লণ্ডনের বড় বড় ডাক্তাররাও যা পারেনি প্রেম সেই অসাধ্যসাধন করেছে। এলিজাবেথ

একটি কবিতায় নিজেই বলেছেন, প্রেম তাঁর চুলের মুঠি ধরে মৃত্যুর গহ্বর থেকে টেনে এনেছে।

প্রেমের ব্যক্তিগত অনুভূতি পঁয়তাল্লিশটি সনেটের মধ্যে রূপায়িত করে এলিজাবেথ স্বামীকে দিয়ে বললেন, তোমার যদি পছন্দ না হয় তাহলে এগুলি ছিঁড়ে ফেলব। ব্রাউনিং সনেটগুলি পড়ে মুগ্ধ হলেন। বইয়ের আকারে বের করতে এলিজাবেথের সংকোচ হল। ব্যক্তিগত প্রেমের পবিত্র অনুভূতি জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করলেন; রবার্ট ব্রাউনিং-এর পরামর্শে বই বের হল 'সনেটস ফ্রম দি পোর্তুগীজ' নামে। পাঠকদের প্রথম ধারণা হল পোর্তুগীজ থেকে অনূদিত সনেটগুচ্ছ স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রধানতঃ এই বইয়ের জন্যই এলিজাবেথের কবি-খ্যাতি। প্রথম বেরুবার পর এই সনেটগুলি শেক্সপিয়ার স্পেনসার রসেটি প্রভৃতির কবিতার সঙ্গে সমপর্যায়ের বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে।

Casa Guidi Windows (1851)-এ এলিজাবেথের ইতালী-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর *Aurora Leigh (1857)* পদ্যে উপন্যাস রচনার অভিনব প্রচেষ্টা। ভিক্টোরিয়ান যুগের অত্যাচারিতা নারীর মর্মবেদনা উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন লেখিকা *Poems before Congress (1860)* রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর উপর রচিত কবিতার সংকলন। এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ কবিতা A Musical Instrument, এর বিষয়বস্তু আলাদা।

একদা এলিজাবেথের কবি-খ্যাতি ব্রাউনিংকে ঢেকে রেখেছিল। এলিজাবেথের কবিতায় ছন্দ মিল ও শব্দ-চয়নে অনেক ত্রুটি আছে। তাঁর কাব্যের অঙ্গনে গদ্যের অবাধ পরিক্রমণ দেখা যায়। তথাপি অনুভূতির আন্তরিকতা এবং সমাজসচেতনতা তাঁর রচনা জনপ্রিয় করেছে। কোনো কোনো কবিতায় তিনি প্রথমশ্রেণীর কবিপ্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন।

গ্রন্থাবলী ॥ Essay on Mind, with other poems (1826) The Seraphim and other poems (1938); Poems (1844); Sonnets from the Portugeese (1850); Casa Guidi Windows (1851); Aurora Leigh (1857); Poems before Congress (1860); Last Poems (1862). অনুবাদ · ঈস্কাইলাসের Prometheus Bound (1833).

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর সনেট : অনুবাদ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

১

যখন আমরা দোঁহে পরস্পর হই সম্মুখীন,
মন্ত্রমুগ্ধ, মুখোমুখি নিবিড় সান্নিধ্যে আসি সরে,
সঞ্চারিত উভয়ের পক্ষে পক্ষে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে
সংঘর্ষে না জ্বলে বহ্নি যতক্ষণ ; সুখে সমাসীন
ভাবি এ পৃথিবী কি-বা বিপর্যয় হানবে নবীন
যুগল সুখের নীড়ে ধরাতলে ? উচল শিখরে
যদি যেতে চাও, ভাবো, গন্ধর্বেরা এসে পরস্পরে
স্বর্গীয় কণ্ঠের সুরে ভেঙে দেবে মগ্ন, আত্মলীন
দু জনের এই প্রিয় নৈঃশব্দকে !

এই পৃথিবীতে

তার চেয়ে বাঁধি বাসা, এসো তুমি, যদিও সংসারে
ক্রূর চক্রী জটিলতা পারে শুধু দূরে ঠেলে দিতে
শুদ্ধ-আত্মা প্রেমিকেরে ; দেয় তবু কোনো এক ধারে
ভালোবাসবার দ্বীপ রচে নিতে দু দণ্ড, নিভৃতে—
যদিও মৃত্যুর লগ্ন, অন্ধকার তার চারিধারে।

২

কি ভাবে তোমায় বাসি ভালো ? শোনো, করি বিশ্লেষণ।
যতখানি উচ্চে আর প্রস্থে, যত গভীরে আমার
আত্মার সঞ্চার তত, যবে আমি পাইনা সত্তার
সার্থকতা খুঁজে, যবে স্বর্গের ঝরুণা অদর্শন।
সংসারের নির্ঝঞ্ঝাট প্রাত্যহিক শান্ত প্রয়োজন—
তার সম অনুপাতে সূর্য আর মোমের শিখার
আলোকে ভালো যে বাসি— ব্যষ্টি যথা স্বীয় অধিকার।

এ-প্রেম তেমনি শুদ্ধ, যেমন শোনেনা গুণীজন
নিজের প্রশংসা কানে।

শৈশবের দুঃখে যে-তীব্রতা
সে-আবেগে ভালোবাসি তোমাকেই, শিশুর বিশ্বাসে।
ভালোবাসি— সাধু-সন্তে ছিল যত ভক্তি-প্রবণতা,
অধুনা যা লুপ্ত, তার সব দিয়ে, প্রতিটি নিশ্বাসে
আজীবন হাসি-অশ্রু দিয়ে; ভাবি, অদৃষ্টের কথা,
যদি মৃত্যু হয়, তারও পরে আরো প্রেমের বিকাশে।

যদি ভালোবাসো, তুমি ভালোবেসো বিনা কারণেই
প্রেমের জন্যেই ভালোবেসো; যেন বো:লোনাক' ওর
হাসিটুকু ভালো লাগে, ও চাহনি, কিম্বা নম্রস্বর
ও যখন কথা বলে; কৌতুকের বাক্য-আলাপেই
যেমন কেটেছে দিন, ভালোবেসানাক সে জন্যেই।
যদিও এমন বহু লঘুপক্ষ উজ্জ্বল প্রহর
প্রসন্ন স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে দিয়ে গেছে সমস্ত অন্তর;
এসব বদলাতে পারে, কিম্বা পারে অর্থ হারাতেই
একদা তোমার কাছে;

ভালোবেসোনাক সে কারণে,
আমার কপোল হতে অশ্রু মুছে দিতে বেদনায়;
অশ্রুও শুকাতে পারে তোমার আদরে-আপ্যায়নে।
শুকাবে তোমারো প্রেম, কান্না যদি ভুলি, সান্ত্বনায়!
প্রেমের জন্যেই তুমি ভালোবেসো, যাতে প্রতিক্ষণে
ভালোবেসে যেতে পারো শাশ্বত প্রেমের মহিমায়।

৪

বলি, শোনো, হতাশার দুঃখে কোনো নেই আকুলতা;
শুধু সেই আশাহীনতায় যার নেইক বিশ্বাস,

সম্পূর্ণ জ্বালা না সয়ে, আর্তনাদে ফাটায় আকাশ,
জানায় নালিশ তার ভেঙে মধ্যরাত্রির শুব্ধতা
উর্ধ্বে সিংহাসনারূঢ় বিধাতাকে। অপার শূন্যতা
তাদের অন্তরে, যেন উপমায় শূন্য বসবাস
ঝরা পোড়া মরা দেশ পড়ে আছে, উপরে আকাশ
রক্তচক্ষু মেলে শুধু অগ্নি বর্ষে—মরুর নগ্নতা।
হৃদয়বানের শোক জেনো তুমি, নিঃশব্দ, গভীর,
মৃত্যুর মতন তার অভিব্যক্তি স্তব্ধ, চরাচরে।
যেন সে মর্মরমূর্তি চেয়ে আছে নিস্পন্দন, স্থির,
দুঃখেও টলেনা দৃঢ়, যতক্ষণ ভেঙেই না পড়ে।
স্পর্শ করো, পাথরের চোখে নেই অশ্রুর শিশির
দু চোখে ঘনালে কান্না, অন্য কোথা চলে যেত সরে।

যৌবনবাউল। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সুরভি প্রকাশনী। মূল্য তিন টাকা।

কবিতার আন্দোলন ইদানীং কালের হলেও কবিতায় আন্দোলন শুরু হয়েছে অনেক আগেই। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ক্ষতগুলির রক্তমোক্ষন বন্ধ যখন হয় নি, তখনই বাংলাদেশের কবিসমাজ এক সুস্থ সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন। প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে ঐরূপ আন্তরধর্মে তাঁরা স্মরণীয় পরিবর্তন এনেছিলেন।

প্রাগুক্ত কাব্য-ধারার প্রসরণে আমরা যে উজ্জ্বল কবিহৃদয়ের সঙ্গে পরিচিত হই, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অন্যতম। তাঁর বহু-প্রতীক্ষিত এবং বহু-বাঞ্ছিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবনবাউল' আমাদের হস্তগত হয়েছে। অবশ্য তাঁর গ্রন্থে সমাহৃত প্রায় সব কবিতাই সাময়িক পত্রপত্রিকার কল্যাণে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও আমাদের পূর্ব-পঠিত। তথাপি এক সঙ্গে ১০৮টি কবিতার শীলিত পরিবেশনে রূপবৈচিত্র্যের মধ্যেও বিদগ্ধ কবিস্বভাবটি যেমন স্পষ্ট, তেমনি সহজ তাঁর নম্র দীপ্ত ফুটোন্মুখ হৃদয়সংবেদনার দিগ্‌দেশনা।

দ্য ভিঞ্চির মোনালিসার হাসির মত অলোকরঞ্জনের কবিতায় একটি করুণমাধুর্য আছে। যদি রঙের কোনো তাৎপর্য থাকে এবং রঙের পরিভাষায় যদি কবিতার মুল্যায়ন সম্ভব হয়, তবে বলা যায়, অলোকরঞ্জনের কবিতার রং গৈরিক। দুহাতে 'রাঙামাটির পথে'র ধুলো কুড়িয়ে তিনি যেন তাঁর কবিতার নায়িকাকে সাজিয়েছেন। এবং সসংকোচে বলি, তাঁর কবিতার ভূগোলও সেই রাঙামাটির পথের সান্নবর্তী। সেই সঙ্গে একটি দেহাতী আভাসও। আনন্দের কথা, সেখানেই অলোকরঞ্জন সার্থকতর।

একজন শিল্পীর পক্ষে বিষয়নির্লিপ্তি অপরিহার্যভাবে কাম্য। বৈপরীত্য যদিও কীট্‌স্ এবং ব্রাউনিঙ্ প্রমুখ কবিদের পক্ষে শ্লাঘনীয় হয়েছিল, তথাপি নিরুত্তাপ নির্লিপ্তিই অলোকরঞ্জনের মৌল কবিস্বভাবের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণে তাঁর সেই কবিস্বভাব স্পষ্ট। প্রসঙ্গত বলি, তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কথিকা-ভূমিক। বস্তুতন্ময়তাই পরিশেষে ব্যক্তি-তন্ময়তায় সমোত্তীর্ণ। কয়েক ক্ষেত্রে সংলাপ-বাহুল্যের কথা বাদ দিলে বস্তু-তন্ময়তা ও ব্যক্তিতন্ময়তার সমন্বয়-সাধনে অলোকরঞ্জনের কৃতিত্ব বিস্ময়কর।

দুঃখের বিষয়, ইতিমধ্যে অলোকরঞ্জনের কবিতা কোনো কোনো উগ্র সমালোচকের চোখে উনিশ শতকীয় রোম্যান্টিক রোমন্থন বলে নিন্দিত হয়েছে। তার আংশিক উত্তর গোড়াতেই দিয়েছি। সুস্থ সুন্দর পৃথিবী -নির্মাণের যে-কাজ বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশালায় চলেছে, তারই স্বপ্ন তাঁর কবিতায় প্রতিবিম্বিত। সেই অম্লান জীবনবোধের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন বোধহয় 'অরণ্যমধু' এবং অনুরূপ কবিতাগুলিতে। আমার মনে হয়, তাও প্রতীককল্প। অলোকরঞ্জনের কবিতা:ক উনিশ শতকীয় মনোবৃত্তির অনুবর্তন না বলে উনিশ শতকের অকল্পিতপূর্ব জীবনবোধের রোম্যান্টিক বিবৃতি বলাই সঙ্গত। তবে তাঁর কবিতায় যাঁরা এ-যুগের দ্বন্দ্ববেদনা আশা-নৈরাশ্যের, এক কথায় এ-যুগের ট্র্যাজেডির, তীব্রতা অন্বেষণ করবেন, তাঁরা অবশ্য হতাশ হবেন।

এ কথা বলতে বর্তমান সমালোচকের দ্বিধা নেই যে, আধুনিক বাংলা কবিতায় সার্থক ইম্‌প্রেশানিজ্‌মের প্রয়োগনৈপুণ্যে কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছেন কবি অলোকরঞ্জন। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র অবশ্য এ নয়। তাই ইম্‌প্রেশনিজ্‌মের সার্থক প্রয়োগনৈপুণ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচ্য গ্রন্থ থেকে তুলে দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি—

১. যাকে চেয়েছিস গোপনে সে তোর বুকের আকাশে থির বিজুরী!

অন্ধবাউল

২. দিগ্বলয়ে গোধূলির অন্য নাম উৎসর্গ উমার। বসুধারা কল্যাণের ব্রতে

৩. তাকালো বিষণ্ণ চোখে দরিদ্র ধূসর ধানক্ষেতে বৃষ্টির বাসনা যেন
কৃষাণীর দুনয়নে কালো— বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে

৪. সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি— নির্জন দিনপঞ্জী

অলোকরঞ্জন শব্দসাধনায়ও সিদ্ধকাম। বহু কবিতায় আমাদের দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের বহু আটপৌরে শব্দও ভারি তৎসম তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি কাব্য-সৌষম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুপী, জবুথবু, ইনিয়ে বিনিয়ে, কুনো কুঁজো, বাসী ফুল, আর-জন্ম, হিংসুটি, ভড়ং, বেহায়া— ইত্যাকার শব্দের ব্যবহারের সাফল্য বিস্ময়কর। অপ্রযুক্ত শব্দের শুদ্ধীকরণ এবং কাব্যায়নে শব্দের জন্মান্তর

ঘটে। ভাষার গৌরবও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া নতুন শব্দ গঠন এবং পুরাতন প্রচলিত শব্দের নতুনতর ব্যবহারও অলোকরঞ্জনের কবিতায় অপ্রচুর নয়। এ বিষয়ে বলা চলে, তিনি অমিত নিষ্ঠাবান। তবু 'শাল মহুয়ার শাখে' 'আমার আলো তোমার ছায়াটিরে' 'যদি ওরেই এক চাহনিতে ভালো লেগে থাকে' 'আমার শ্রাবণ আমার ফাগুন' 'খুঁজে নিক বীতশোক বীণ', 'কবরী তার দিলো সে সঞ্চারি' 'তুমি স্বচ্ছ ঢেউ রয়েছো থমকি' 'ও-আকাশ তোমাকে আবরি' 'আভিজাত্যে উঠেছে পৌরুষি'— চরণগুলির বড় হরফের শব্দপ্রয়োগ অনাধুনিক বলে আমাদের মনে হয়েছে। এই সব শব্দের আবির্ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল-ব্যপদেশে। তবু অলোকরঞ্জন তাঁর কবি-স্বভাবের অপূর্ব আবহ-বিস্তারের সঙ্গে ছন্দের শিল্পানুগ প্রসাধন-বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটিয়ে শেষরক্ষা করতে পেরেছেন। স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে সমন্বিত।

অলোকরঞ্জন তরুণদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, শক্তিশালী কবি। শুধু শক্তি-শালীই নন, প্রভাবশালীও বটে। তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতায় এক শান্ত স্নিগ্ধ স্মিতোজ্জ্বল স্বানুভাব নম্র অথচ হার্দ্যগুণে ভাস্বর পরিশীলিত এক কবি-হৃদয়ের উপস্থিতি প্রচ্ছন্ন। আত্মমুগ্ধ সঙ্গীতপ্রসন্ন সুললিত সৌন্দর্যই তাঁর কবিতার রূপ। সেখানে বাংলা কবিতায় একক। বিস্তৃত আকাশ, মুখর আলো, অরণ্যের মধুচ্ছায়া, পৃথিবী, পৃথিবীর ফুল-পাখি গান, মুগ্ধ মানবহৃদয় এবং সর্বোপরি একটি নির্দ্বন্দ্ব বিশ্বাস তাঁর কবিতায় প্রতিশ্রুত। আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে প্রীতিপ্রদ। কিন্তু কবিতানির্বাচনে কবির কিঞ্চিৎ নির্মমতার বোধহয় প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া কবিতাবিন্যাসে কালানুক্রমণের প্রতি আনুগত্যে কবি-স্বভাবের উপলব্ধিও সহজ হত বলে মনে করি।

ফণিভূষণ আচার্য

একটি শতাব্দীর সত্যই যেন অবসান ঘটল এবার। যাঁর কাছ থেকে আমরা গত শতকের আস্বাদ পেতাম তিনি লোকান্তরিত হলেন। গত ১২ আগস্ট, ২৭ শ্রাবণ, শুক্রবার ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী লোকান্তরিত হয়েছেন।

পরিণত বয়সেই, ৮৭ বৎসর বয়সে, তিনি পরলোকগমন করেছেন, কিন্তু আক্ষেপ এই যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতপূর্তি-উৎসবের প্রাক্কালে নিজের স্মৃতির মধ্যে একটি শতকের কাহিনী নিয়ে অন্তর্হিত হলেন ইন্দিরা দেবী। উনবিংশ ও বিংশ— এই দুই শতকের মাঝখানে তিনি ছিলেন সেতু বিশেষ। এরই মধ্য দিয়ে দুই শতকে যাতায়াত করা যেত। জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারের এই দুহিতা প্রকৃতপক্ষে সেকাল ও একাল—এই দুই কালের ছিলেন জোড়াসাঁকো। তাঁর মৃত্যুতে সাঁকোটি ভঙ্গ হল।

সাম্প্রতিক কালের নবীন কবিরা শৌখিন কবি যে নন, কয়েকদিন আগে নতুন করে তার পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। 'কবিপত্র' মাঝে মাঝে কবিদের বৈঠক আহ্বান করে থাকেন। গত মাসে তাঁদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিল।

কয়েকজন কবি তাঁদের রচিত কবিতা পাঠ করলেন। কবিতা পাঠ করাটাকে আমরা বিশেষ বড় কাজ বলে মনে করিনি, যদিও কবির মুখ থেকে তাঁর লেখা কবিতার আবৃত্তি শোনার মধ্যে শ্রোতার একটা বাড়তি লাভ আছেই। বড় কাজ মনে করেছি, সেইসব পঠিত কবিতা নিয়ে হৃদ্য আলোচনাকে।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন অনেকে। কবিতার ছন্দ ভাব ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে তরুণ কবিরা যে বিশেষভাবে চিন্তা করছেন— তাঁদের আলোচনায় ধারা দেখে তা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল।

কবিসম্মেলনের চেয়ে এই ধরণের বৈঠক যে কবিদের পক্ষে উপকারী, এই ধারণা নিয়ে সেদিন রাত্রে সেই বৈঠক থেকে ফিরেছি। এখানে মতের আদানপ্রদান হয়েছে, এবং একটা নতুন কিছু করাটাই যে কবিদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় তা অকপটে প্রকাশ করা হয়েছে।—

কবিতা বুঝিতে চাও?

অর্থে এ তো দিবে নাকো ধরা

অভিধান আনিয়োনা

অনুভূতি আনিয়ো তোমরা

বলে একটা কথা আছে, কবি যেমন তাঁর অনুভূতির উপর নির্ভর করে তাঁর কাব্য রচনা করবেন, পাঠকও সেইরূপ অনুভূতির উপর নির্ভর করেই কবিতার রস আস্বাদন করবেন।

সেইজন্যেই, কবিতা কি ভাষায় ও কি ছন্দে রচিত হল তা উপেক্ষা করতে হবে—এমন নয়। সমবেত কবিবৃন্দ এই বিষয়ের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন। এই ধরণের বৈঠক কবিদের মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলে মনে হল।

গত মাসে কল্পদ্রুম পত্রিকার বিষয় বলা হয়েছে। তাঁরা জানাচ্ছেন—তাঁদের প্রথম সংখ্যার তারিখের সঙ্গে তাঁরা ভুলক্রমে শুক্রবার ছেপেছেন, বুধবার হবে।

সুশীল রায়

দুর্গা পট । বিষ্ণুপুর । বাঁকুড়া

কবিতার অপমৃত্যু

সরোজ আচার্য

চসারের মোরগ ও শেয়ালের গল্প নয়, ঈশপের সেই কাক ও শেয়ালের গল্পটি। কবিকে কোকিল না বলে কাক বললে তিনি ক্ষুব্ধ হবেন জানি, আবার পাঠক বা সমালোচককে সিংহ না বলে শেয়াল বললে তিনিও খুব খুশি হবেন না। কিন্তু গল্পের কাক বা শেয়াল তো রূপক বৈ নয়, অতএব 'ন পরমার্থেন গৃহ্যতাং বচঃ'। পাঠক বা সমালোচক কবিকে বলছেন, 'আহা, কী তোমার গলা! তোমার পিতৃদেবকেও বুঝি হার মানিয়ে দেয়; শোনাও-না একটা গান।' কবির মনে পাপ ঢুকলো, অহংকারের পাপ; তিনি তাঁর মুখ খুললেন, অন্তত ঝর্নাকলমের মুখ; ঝরঝর করে— প্রায় কান্নার মত, কিংবা শরৎকালের বৃষ্টির মত, কিংবা পূজাসংখ্যার পদ্যের মত— কবিতা লিখে ফেললে, মুখ থেকে মধুর সন্দেশটিও পড়ে গেল। অবশ্য শেয়ালের সঙ্গে সমালোচকের পুরোপুরি মিল নেই, থাকবার কথাও নয়। শেয়ালের মনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, নিজের স্বার্থসিদ্ধি। কিন্তু সমালোচকের তো নিজের কোনো স্বার্থ নেই। নেই তা ঠিক। কিন্তু তাতে গল্পের কোনো ইতরবিশেষ হচ্ছে না। আমার গল্পের এই কাক ও শেয়ালের অবতারণা তো শুধু এই যুগের কবি ও সমালোচককে বুঝাবার জন্যেই। সমালোচকের বাহবা কবির মুখ খোলাবে, সমালোচকের ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করে কবি তাঁর ঝর্নাকলমের খাপ খুলবেন এবং এই সুযোগে এ-যুগের সাহিত্য তার যুগোপযোগী সন্দেশটি কুড়িয়ে নেবে। এই তো?

সাময়িক পত্রিকার পাতায় আজকাল দেখছি শেয়াল তেমন খুশি নয়। তার ঠিক মনোমত সন্দেশটি কাকের মুখ থেকে পড়ছে না। কাককে মুখ খুলতে সে বারণ করছে না, কিন্তু বিস্বাদ পচা সাতবাসি সন্দেশ দিয়েই বা সে কী করবে? ঝকঝকে তবকে মোড়া হলে কী হবে, মিঠাইতে মধুরের বদলে যে অম্লস্বাদ। কিন্তু যে-কাক পিতৃদেবকেও হার মানিয়েছে সে কেন শেয়ালের দাবি মানবে? সত্যিই তো, কেন মানবে? কাক অহংকারী; তার মনোভাব হচ্ছে: 'আমি মস্ত গায়ক, ইচ্ছে হয় আমার গান শোনো

নাহয় না-শোনো।' কিন্তু কাকের এই অহংকার-বুদ্ধিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে কে? শৃগালরূপী সমালোচকই নয় কি? 'নিরঙ্কুশা বৈ কবয়ঃ', কবি সব আইন-কানুন-রীতিনীতির ঊর্ধ্বে, সব জবাবদিহির বাইরে, তিনি এক দুর্বোধ্য অতি-মানব, ব্যাস-বাল্মীকির উত্তরাধিকারী— এসব কথা তাকে কে শুনিয়েছে?

আজকাল রব উঠেছে, 'কবিতা গেল-গেল'। কবিতার পত্র-পত্রিকাগুলি ক্ষীণকায় এবং অনিয়মিত; বিজ্ঞাপনদাতারাও কাকের মুখ থেকে কোনো লাভজনক সন্দেশের আশা রাখেন না; হাজার হলেও তাঁরা ব্যবসায়ী; ঘী ঢালতে তাঁরা রাজী, কিন্তু ভস্মে নয়। সমালোচক-শৃগালের কাছেও আজ 'কাকের কর্কশ রব বিষ লাগে কানে'। কিন্তু কয়েক পুরুষ আগেও কাকের স্থান ছিল স্বর্গীয় পারিজাতের শাখায়। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডে ম্যাথু আর্নল্ড বড় আশা করে বলেছিলেন, 'কবিতার ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনাময় (The future of poetry is immense)'। এখন দেখা যাচ্ছে এই ভবিষ্যদ্বাণী খুব বেশি সার্থক হয়ে উঠেনি— না ইংলণ্ডে, না এদেশে। একালের লোক অতটা আশাবাদী নয়। কিন্তু তবু কারো কারো মনে এমন-একটা আশা— হয়তো ক্ষীণ— রয়েছে যে কবিতার হাত ধরেই বুঝি সংস্কৃতি বা সভ্যতার সংকট পার হওয়া যাবে। কবিতার সমর্থকদের আমি নিন্দা করছি না, তাদের সদিচ্ছাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু কোনো কবিতাপত্র— যেমন ধরুন লণ্ডনের 'পোয়েট্রি রিভিউ'— বা কোনো কাব্য-উৎসাহী সমালোচক যখন দুনিয়ার আর সব-কিছু থেকে আলাদা করে, অন্য সব-কিছুর সংস্পর্শ-শূন্য বাক্-সর্বস্ব কবিতাকে একটা বিশেষ দাওয়াই হিসাবে প্রচার করেন, বলেন, পৃথিবীর বা মানবসভ্যতার প্রায় একমাত্র আশাভরসা হচ্ছে কাব্য, যেমন একদা ম্যাথু আর্নল্ড বলেছিলেন, তখন তাঁরা কাব্যের অপকারই করেন। কবিতা তখনই কবিতা যখন তার সঙ্গে এমন আরো অনেক-কিছু জড়িয়ে থাকে যা কবিতা নয়। কবিতা ও বিশ্বসংসার ঠিক তেমনি অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত যেমন শিল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু (form ও content)। কাক যখন অহংকারী, নিজের কণ্ঠে নিজে মুগ্ধ, শুধু তখনই সে ধরাকে সরা বা একেবারেই অসার জ্ঞান করে। তখন সে চসারের গল্পের মোরগের মত চোখ বুজে গান করতে যায় এবং তার অপমৃত্যু ঘটে।

কবিরা মনে করছেন তাঁরা কাব্যের তাজমহল তৈরি করছেন। করুন· ক্ষতি নেই। কিন্তু দেশের সব রাজমিস্ত্রিই যদি পণ করে বসেন যে তাজমহল ছাড়া আর-কিছুই তাঁরা তৈরি করবেন না, করলে তাঁদের ইজ্জত যাবে; অথবা যদি তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা যা-কিছু তৈরি করছেন (বা করবেন) তাই তাজমহল, তাহলে বড়ই ভাবনার কথা। সমালোচকেরাও যদি মনে করেন, কবিতার তথাকথিত আঙ্গিক সম্পর্কে দু-একটি ত্রুটি প্রদর্শন করা বা দু-একটি চিত্রকল্প বা শব্দচয়ন সম্পর্কে মন্তব্য করাই যথেষ্ট কাব্যসমালোচনা, কবিতার আকার-প্রকার বিষয়ে অবহিত হওয়া ছাড়া আর-কিছুই উত্থাপন না করা, কবিতার বিষয় ও কবিতার আবেগ-কেন্দ্র বিষয়ে একেবারে নীরব থাকাই সূক্ষ্ম ও শিল্পসম্মত সমালোচনা, তাহলে বলব— সে-সমালোচনা কবিতার 'অপমৃত্যু'কেই সাহায্য করবে।

কবিতার মধ্যে শুধুমাত্র কবিতারই স্থান থাকবে— খাদশূন্য সোনা দিয়ে অলংকার তৈরির এই অতি-আধুনিক স্পর্শকাতর প্রচেষ্টায় কবিতার জনপ্রিয়তা (সস্তা জনপ্রিয়তার কথা বলছি না) বা প্রিয়তা নষ্ট হচ্ছে। কবিতা জীবনের, দেশের, সংসারের 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে আঁকা' বিচিত্র মানচিত্রে চিহ্নিত হতে পারছে না, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্র এবং নব্য-সাহিত্যদর্পণের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। 'বিশুদ্ধ' কবিতা এত তৈরি হচ্ছে— সত্যিই শব্দচয়ন ও আলংকারিক নৈপুণ্যে আধুনিক কবিরা অতীতের সব কবিদের, পিতৃ-পিতামহদের, ছাড়িয়ে গেছেন— কিন্তু তাতে কবিতার মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে না, কাব্যের জাদুঘরে নমুনার সংখ্যা বাড়ছে মাত্র।

দিনটা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ট্রাম-বাসের ঠাসাঠাসি
আর ট্রাক মোটর লরির
ধোঁয়া-ছাড়া ধুলো-ওড়ানো কাৎরানিতে
নোংরা নাট দিনটা
চেয়েছিল নিভাঁজ মসৃণতায়
রাত্রের আকাশে নিজেকে টাঙাতে
মনুমেণ্ট থেকে মেমোরিয়াল অবধি।

ছেঁড়া মেঘে জড়িয়ে গিয়েও
ক'টা তারার চুম্‌কির নিখাদ স্নেহ
আর বাদুড়ের ডানার নিরুদ্বেগ মন্থরতায়
সে শুদ্ধ স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল।

এসপ্ল্যানেডের রঙীন কটাক্ষ
হয়তো তাকে নাচাতে চাইবে।
কিন্তু গড়ের মাঠের পাড়-বসানো গাছগুলো
থেকে থেকে মৃদু মর্মরে
তাকে মন্ত্রণা দেবে এলায়িত প্রশান্তির,
যদি না হঠাৎ কোনো দমকলের ঊর্ধ্বশ্বাস ঘণ্টা
কোথাও সর্বনাশা আগুনের পানে তাকে ছোটায়।

নৈঃশব্দ্য মধুর এত

বিষ্ণু দে

নৈঃশব্দ মধুর এত, মূক শূন্য এত বাঙ্ময়
সে কথা সবাই বোঝে যখন পাড়ায়
বিয়ে কিংবা পূজা হয়, ঐহিক স্বর্গীয় যে-কোনো সুযোগে
যাতে সুরুচি স্নায়ুর স্বাস্থ্য সব-কিছু শব্দরোগে ঝেঁটিয়ে তাড়ায়।
রবীন্দ্র-আলোকে আমাদের জন্ম, তাই জানি গান
সৃষ্টির চরম শিল্প, অধরা আবেগে
গান বুঝি হাতে ধরে হৃদয়ের সাত ইন্দ্রধনু
সুকুমারতম ভাব ভাষায় ও সুরে ওঠে যেন বা কৈলাসে হরগৌরী জেগে।

কে জানত গানেই চিত্ত খান্‌খান্‌, মগজের শিরা ছেঁড়ে, ভেঙে যায় হনু ?
প্রচণ্ড তাড়কা ছোটে আকাশে বাতাসে,
ছড়ায় কি আধুনিক গীতি নাকি ছায়াছবি গান
বোম্বাই বা কলকাত্তাই, নব্যপল্লীগীত নাকি শিশুনাট্যনামক হুঙ্কার,
রাগরূপ বা রাগপ্রধান ?
সুরকে অসুর করে ভূতুড়িয়া সংস্কৃতি বিলায় লাউডস্পীকারে !
বুঝি কেন আলমগীর বন্ধ ক'রে দেন গীতবাদ্যকে ধিক্কারে।

পাড়ায় পূজায় কিংবা বিয়ে কিংবা ভাতের উৎসবে
ভয় পাই, কারণ জীবন তাতে পিছু হাঁটে মৃত্যুকে যে ডাকে,
চৈতন্যের মৃত্যু চায় গানে কিংবা বোমায় পট্‌কায় মত্ত কলরবে।
মূক শূন্য এত যে মাধুর্যে পূর্ণ এই কুম্ভীপাকে সে কথা জানত কেবা আগে !
মন বড় ভয়ানক, বড় কড়া, গান চায়
শান্ত স্থির স্তব্ধ মনীষায়, তুলে ধরে নিজমনে উজ্জ্বল মুকুর,
মনের বালাই বড়, বহু দাবিদাওয়া সে জানায়,
তাই পালাই পালাই করে যখন মাইকে হাঁকে দুরন্ত কুকুর ॥

জমিদারি

কানাই সামন্ত

বিশ্বের লাখেরাজ
খোওয়া গেছে, তাই আজ
'ছটাক' খানেক জমি চাই রে—
কলগুঞ্জনময়
গঞ্জে বাজারে নয়,
হলে পরে ভালো হয়
বোলপুর শহরের বাইরে।

ছটাকে কাঠায় মাঠ
মেপে নিই পথ ঘাট—
চুন বালি ইঁট কাঠ
কী জানি কোথায় ধারে পাই রে।
ছোটো ঘরে ছোটো দ্বারে
কুলোলে কুলোতে পারে
স্বরাট্ বিরাট্ তারে
মাপ-মত ছেঁটে-ছুঁটে ভাই রে।

বিশ্বের লাখেরাজ
তারামণিময় তাজ
খোওয়া গেল যার, আজ
ছটাকেও রুচি হল তাই রে।
ধূমকলঙ্কময়
শহরে না হলে হয়,
একটু উঠোন রয়—
ব'সে সন্ধ্যায় হাওয়া খাই রে।

দু পায়ে শিকলিডোর,
নীলাকাশে মনোচোর,
আঁখিপাখি ধায় তোর—
মানা নাই সেখানে তো নাই মানা নাই রে।
বিশ্বের লাখেরাজ
খোওয়া গেছে, যায় যাক্—
দু-কাঠা ছ-কাঠা জমি চাই রে ॥

দুই মেয়ে

গোপাল ভৌমিক

সে একটি কালো মেয়ে
আমাকে ভালোবাসে নি,
আমার কবিতা ভালোবাসে ;
আমার চোখে সে রানী,
সব তাকে দিতে পারি
যদি সে দাঁড়াতে দেয় পাশে।

অপরা রূপসী মেয়ে
আমাকেই ভালোবাসে,
কবিতায় অরুচি বেজায় ;
অথচ প্রাণের সাড়া
পাই না তো তার কাছে
দেহ-মন কাঁদে বেদনায়।

দিতে পারে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

স্বর যার
দিকছোঁয়া ছুটির প্রান্তর—
দুটি ডানা অসীম অম্বর,
পাখিরা, পাখিরা সেই—
পাখিদের রাখো কি খবর ?
আলোর দ্বীপের মত যেমন জোনাকি,
গানের মেঘেরা এই পাখিগুলি, পাখি—
সুরে যারা মুড়ে রাখে দিন,
দিন আর দিনের যন্ত্রণা ;
তারই পরে ফোঁটা-ফোঁটা করুণার কণা
ওরা যেন , ওরা যেন
একমুঠো দেবতার বর ।
পাখিদের রাখো কি খবর ?
কত না খবর দিতে পাখিরা ডাকছে নিরন্তর ।
ফুল নয়, তারাও তো নয়—
ফুলের খানিক আর তারার বিস্ময়—
এ নিয়েই বুঝি পাখি হয় ;
পাখিরা না একান্ত সুন্দর !
শুধু শান্তি, শুধু স্নিগ্ধ রুচি—
শিল্পীর তৃপ্তির ক'টি কুচি,
কিছু চেনা, কিছু-বা অচেনা
ওরা যেন আর কোন্ সাগরের ফেনা ;
রাখো যদি সঠিক খবর—
পাখিরাই দিতে পারে হয়তো অনেক উত্তর ।

রহস্যময়ী

জগন্নাথ চক্রবর্তী

জলে পা ডুবিয়ে বসে যে-মেয়েটি রোদ মাখে গায়ে
তার কালো চোখের গভীরে জীবনের আলো বাঁধে বাসা,
মাটি-গন্ধি হাওয়া তার কানে কানে দেয়
একটি গোপনবার্তা, লজ্জায় আদুল গায়ে
কোনোমতে কাপড়ের ফালি টেনে দেয়,
নিজের হৃদয় নিয়ে নিজে মুগ্ধ ; এত রোদ !—
এত চোখ চেয়ে আছে তার চোখে, এত রোদ, এ বড় অদ্ভুত !
আঙুরের রসে সুরা, জল থেকে জলের বিদ্যুৎ,
মনের বিদ্যুৎ ছুঁয়ে চোখের আবেগ
জন্ম দেয় নূতন কান্নাকে মাতৃগর্ভে, এ এক অদ্ভুত ;
স্বপ্ন থেকে সত্যের অঙ্কুর ওঠে।
শঙ্খচিল উড়ে গেলে তবু থাকে আকাশের নীল,
থাকে রোদ নারকেলের সবুজ চিরুনি-চেরা পাতায়
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি,
আরো সব চিল আসে নূতন নূতন দ্বিপ্রহরে—
আকাশের মুভি-ক্যামেরায়
উড়ন্ত ডানার ছায়া ফেলে
বাদামি রঙের সব ভাসমান চিল
শুককীট থেকে জন্মে প্রজাপতি, এ এক আশ্চর্য কথা,
মেঘ থেকে রামধনু,
ঝিনুকের বুকের গভীরে কী এক নূতন রোদ আনন্দে জমাট ;
কারখানার গর্ভে জন্মে এরোপ্লেন শুভ্রফেননিভ
সদ্যোজাত গোবৎস মসৃণ,
ফ্যাক্টরি সূতিকাগারে জন্ম নেয় ইলেকট্রনিক ব্রেন,
যেন জাতিস্মর শিশু শাস্ত্র-পারঙ্গম, আশ্চর্য !

কালো জল দীঘির কিনারে
নিপুণ মাকড়শা হাঁটে অবলীলা জলের উপরে
যখন পাতঝড়ে জীর্ণপাতা ঘুরে ঘুরে আসে।
প্রৌঢ় লতা ত্রিকালজ্ঞ বৃষ্টিকে যাচ্ঞা করে,
বিচার প্রার্থনা করে আকাশের
এল না নূতন শাস্তি বিশীর্ণ বাহুতে;
কালো জল দীঘির আরশিতে
করুণ বার্ধক্য দেখে বৃষ্টিকে যাচ্ঞা করে,
অনসূয়া-আকাশকে ডেকে বলে—বৃষ্টি দাও, শান্তি দাও,
মৃত্যুর ছায়াকে ফুলে ঢেকে দাও।
নিরুত্তর নিস্পৃহ আকাশ। জন্ম মৃত্যু একাকার নীলে।
জলে পা ডুবিয়ে বসে যে-মেয়েটি রোদ মাখে গায়ে
তার চোখে বিদ্যুতের তারা,
নিরাক্ষেপ জীবনকে নিয়ে সে যেন একলা দিশাহারা।

জীবনের মহাকাব্য নিরবধি—জন্মে পূত, মৃত্যুতে প্রবীণ,
কর্মে মহীয়ান।
মেয়েটির ছায়া যায় কালো জল থেকে কালো জলে,
কাল থেকে কালে,
ভাবীকাল থেকে ভেসে দূর পুরাকালে;
অজন্তার অঙ্কিত দেয়ালে আনন্দে নির্বাক সে-ছায়া রঙীন হয়ে ওঠে,
চাঁদের মেরুতে কিংবা মঙ্গলের মাঠে
সেই ছায়া শশিকলা।
প্রাগৈতিহাসিক গুহা আলো করে মেয়ের সংসার,
সুখ তার চিরন্তন শিলালিপি, মুখ তার মোনালিসা,
নবজন্ম বয়ে বয়ে মনের গুহায় সে রহস্যময়ী।
তাকে আমি দেখেছি সুন্দরী রক্তচূড়া গাছের ছায়ায়
ডোভার লেনের মাঠে, তাকে আমি দেখিনি কখনো,
বৃষ্টির রেলিঙে ঘেরা অফিস ক্যান্টিনে দেখেছি হয়তো, কিংবা
হয়তো দেখিনি।

অন্ধকার নয়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অন্ধকার ভালো নয়। আমি অন্ধকারে এতকাল
শুধুই আলোর ইচ্ছা লালন করেছি।
শুধুই আলোর ইচ্ছা, আলোর অসীম ইচ্ছা নিয়ে
আমি এই অন্ধকারে জেগে আছি। এই
অব্যয় তরল অন্ধকারে।

অন্ধকার ভালো নয়। যদিও সে আত্মীয় আমার।
যদিও আমারই রক্ত এই অন্ধকারের শরীরে
প্রবাহিত। যদিও আমার সহোদর
এই অন্ধকার।
এই তিক্ত, আত্মমুখসর্বস্ব, তরল অন্ধকার।

অন্ধকার ভালো নয়। যেহেতু সে একমাত্র নিজের
শরীর দেখায়। সে যেহেতু
অন্য আর কারও মুখ দেখতে দেয় না। সব
দৃশ্যের মুখশ্রী মুছে অন্ধকার নিজেই যেহেতু
একমাত্র দৃশ্য হয়ে ওঠে।

অন্ধকার ভালো নয়। অন্ধকার শুধুই নিজের
শরীর দেখায়।
আমি দীর্ঘকাল কোনো মাঠ-নদী-সমুদ্র দেখিনি।

আপন স্বভাবে

মণীন্দ্র রায়

অধিকার-বোধ ? বেশ তাই যদি হয়
সে এমন লজ্জার কথা কী ?
তোমার জীবনে মনে আমি উদাসীন
বলি যদি, সেই হবে ফাঁকি।

তুমি তো ফুলের ভক্ত, দেখেছ কখনো
পাপড়ি আর রঙের বিচ্ছেদ ?
তোমার চোখের জ্যোতি, হৃদয়ের তাপ
যদি চাই, তাতে কী নিষেধ ?

তবুও বলি না তুমি আমারই আধারে
বাঁধা থাকো। যাও, যদি যাবে।
কেবল পুনশ্চ এই, নিশ্চিহ্ন আমিও
ঝরে যাব আপন স্বভাবে ॥

যেমন ফ্রাঁসোয়া ভিয়ঁ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

শুনি কার খামখেয়ালে জন্ম ও'র ; নবাবজাদার
উচ্ছৃঙ্খল ব্যসনের মুহূর্ত কি এই পৃথিবীতে
ওকে এনেছিল ঘরে জনমদুখিনী বাঁদী মা'র ?
তখন সচ্ছল দিন। শান্তি ছিল প্রতি ঘরে ঘরে
দুমুঠো পোলাও তার যেত জুটে সোনার শান্‌কিতে।

এখন গ্রহের ফেরে আকালে, বন্যায়, দুর্বৎসরে
ঘুরেছে কালের চাকা, মানুষের ভাগ্য ছিন্নমূল।
রুজি-রোজগারের খোঁজে তাই তাকে দেখি প্রতিদিন
দাড়ি না কামানো গাল, ছিন্ন বস্ত্র, বিশীর্ণ আঙুল ;
সর্বাঙ্গে এঁকেছে ক্ষত দারিদ্র্যের উদ্যত সঙিন।

কখনো দেখেছি তাকে শনিবারে খিদিরপুর মাঠে
ছুটন্ত ঘোড়ার পুচ্ছ ধরে যারা ভাবে, বাজিমাত
রাতারাতি করে দেবে, সেইসব পান্টারের দলে ;
সম্বল যা গয়নাগাঁটি এমনি করে হয়েছে বেহাত ;
কোনোদিন কিছু পেলে, দেখিছি বেলেল্লা দঙ্গলে
মদের তলানি আর উচ্ছিষ্ট মাংসের শুকনো চাটে
হুল্লোড়ে উঠেছে মেতে ; কখনো নিরালা এককোণে
স্থুলাঙ্গীর আলিঙ্গনে গদগদ চটুল ভাষণে।
যতই দেখেছি তাকে, মানবিক করুণায় মন
ততই ভরেছে, দেখে দুর্গ্রহের দুষ্ট আক্রমণ।

সম্প্রতি শুনেছি আরো কয়েক ধাপ গিয়েছে সে নেমে—
অসতর্ক পথচারী বুকপকেট না যদি সামলায়,

কিম্বা বেকায়দায় পেলে কোনোদিন গলির নির্জনে
কোনো সান্ধ্য-ভ্রমরীকে, তাক্ লাগিয়ে দেয় সে এলেমে।
অথচ লেখার হাত ছিল নাকি ! ঠিক নেই মনে,
দেখেছি একটি কি তুটি মাসিকের দাক্ষিণ্য-পৃষ্ঠায়।

ভাবি কবে মুক্তি পাবে ? কোন্ শুভ নক্ষত্রের আলো
ও'র ললাটে রাখবে হাত; নির্জন মুহূর্তে সে নিজের
কবে হবে মুখোমুখি : চাতুরীর, পাপের আবিলও
অনুতাপে অশ্রুস্রোতে ধুয়ে ধুয়ে মুছে যাবে ফের !
যেমন ফ্রাঁসোয়া ভিয়ঁ সন্ধ্যার হল্লোড় শেষ হলে
মধ্যরাতে ঘরে ফিরে অনুতাপে অশ্রুধারা-জলে
যীশুর মূর্তির নীচে নতজানু, পেয়েছেন ক্ষমা—
সব ক্ষোভ সব অশ্রু পুঞ্জীভূত করে অনুপমা
যেমন লিখলেন কাব্য—ভাবি, কবে পাবে সে প্রসাদ !
আগুনের স্পর্শে কবে শুদ্ধ হবে, পুড়ে যাবে খাদ।

হাওয়ার ভিতর

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তোমার নামে যে-মেয়েটির নাম
আজ নিশীথে কপালে তার স্পষ্ট এঁকেছিলাম
চুম্বনের শুক্লা জয়টিকা।

'এঁকেছিলাম' বললাম, কেননা
এরি মধ্যে সে-জয়টিকা অপসারিত
হাওয়ার ভিতর, তার পরাজয় অবধারিত।

বহির্দ্বারে তোমার বেবি ট্যাক্সি উঠলো বেজে,
শুনে আচম্বিতে তোমার প্রতিনায়িকা
হাওয়ার ভিতর সঞ্চারিত, কিন্তু ঘরের চতুষ্কোণী মেঝে
থেকে ঘরের চৌখস আকাশ
তার পরিচয় ব্যাপ্ত করে, যেমন সারেঙ্গিতে
সাগিরুদ্দিন ধ'রে রাখেন লুপ্ত স্বরাভাস॥

স্মৃতি

আনন্দ বাগচী

কফির পেয়ালা জুড়ে রক্ত নাচে, বসে তাই দেখি।
বাইরে প্রদোষ মন অন্ধকারে কার্তিক রজনী
পিনকুশনের মত নিবিড় নক্ষত্র জ্বেলে রেখে
যন্ত্রণা পোহায়, সামনে কীর্তিকার দুটি হাত এ কি
রক্তে নাড়ে বিষের চামচ, যাকে ভালোবাসা বলে জানি
চুম্বন সদৃশ মৃত্যু হয়ে জ্বলে ওঠে থেকে থেকে।

কফির পেয়ালা জুড়ে রক্ত নাচে দর্পণের মত,
প্রথম মুখশ্রী ভাসে অতঃপর দেহ-মৃতদেহ,
সমস্ত ঘরের বাইরে, অন্ধকার, কলরব, স্মৃতি
দংশিত বিবেক যেন অকালবর্ষণ অবিরত
জানলার কাঁচে লেখে নখরেখা, অধর-সন্দেহ।
একটি রমণী শিল্পে লিপ্ত, নির্বাসিত প্রতিকৃতি
একা বসে আছি, একা, অনির্বাণ যৌবনের ক্ষত।

মৃত্যুর প্রত্যন্ত দেশে প্রেম জ্বলে শিল্পের বিভায়।

প্রেমের কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ও চুলে তোমার বেণীবন্ধন কিছুতেই মানাবে না
চুল খুলে দাও হাওয়ায় অন্ধকারে।
ও নীল বসনে ঝরুক লজ্জা, রেখাগুলি ওই কাঁপে
দাঁড়াও এখানে পিপাসার পারে
হাওয়ায় অন্ধকারে !

ভুলতে চাইনা নদীনীলিমার অশুভ কৌতূহলে
হাত বাঁধবো না গতজন্মের পাপে
তোমার চোখের তারার দ্যুতিতে পৃথিবীও বড় দীন ;
ও নীল বসনে ঝরুক লজ্জা, রেখাগুলি ওই কাঁপে
মুখ ঢাকব না গতজন্মের পাপে।

দাঁড়াও এখানে পিপাসার পারে হাওয়ায় অন্ধকারে
শরীরের ছায়া শরীরের লোভ করে
যদি ভুল হয়, ছায়ার সঙ্গ মনে হয় প্রেয়তর ?
তুমি তাই এসো রক্তেমাংসে, রভসে আকুল স্বরে,
শরীরের ছায়া শরীরের লোভ করে।

সীমান্ত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিশ্বাস স্থবির নয়, আমি সব সম্ভাবনা দৃশ্য দেখে চিনি।
যেসব বছর যায় অঙ্গে ধুলো ধারাবাহিকতা,
তার প্রান্ত পরিণতি তীব্র বেগে লাগছে সূচীমুখ
অসংখ্য পিপাসাদগ্ধ বলিরেখালুপ্ত এই ললাটপ্রচ্ছদে।

আমি জানি, পৃথিবীর সমস্যাপীড়িত এ সময়ে
শুধু পতনের শব্দ দম্ভে, লোভে, মূঢ় বিস্ফোরণে— স্বাভাবিক।
তবু শান্তি স্বপ্ন ; যেন আজন্মধারার কোনো বহমান ঋণে
মানুষ প্রধান অর্থে মানবতা ছিল একদিন।
দার্শনিক সক্রেটিস ; এ যুগে মহাত্মা গান্ধী যেহেতু হত্যার মত প্রচণ্ড ক্ষমায়
পড়ে যেতে যেতে তবু আকাশের অধিকার চোখে মুখে বক্ষে রেখেছিল ;
বুঝি তাই কেউ কারো চোখে স্থির তাকাতে পারছেনা।

অথচ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমি তুমি -চিন্তা প্রয়োজন
থাকা খুবই ভালো। তার মূল্যে এই প্রত্ন পৃথিবীতে
অনেক নতুন ভাষ্য শিল্পে, প্রেমে, সাহিত্যবোধনে
আমরা তো দেখেছি নিত্য কি করে গৌরব বেঁচে থাকে ;
বাঁচে মানুষের মন সময়ের প্রতারণা ভেঙে।
তবু যা রামের সত্য তা যখন রহিম না মানে
সেই ব্যক্তি-ব্যাপকতা ধ্বংসের কারণ হবে কেন ?

আসলে জীবন এক অন্তহীন ত্রিকাল ত্রিভুজ
যার কোনো দুই বাহু পরস্পর তৃতীয় বাহুর অবসান
হয়নি কখনো, তারা পারেনা কখনো হতে অদ্বিতীয় একা।

তবু কেউ অসম্ভব দর্পের প্রথম দাবি বৃহত্তম ভেবে
অন্ধকারে হাতড়ে ফেরে সত্যের অলীক কোনো কায়া,
যে সেখানে নেই, যা ছিলনা বলেই তার সীমা
সন্ধানী বাহুতে তার স্পর্শ দিয়ে বলেনি সে আছে।
আমরা সবাই সেই ভবিষ্যবিহীন অন্ধকারে
অন্ধের মতন শুধু হেঁটেই চলেছি— যার শেষ
স্পষ্ট কোনো শব্দ নয়; গতির গভীর কোলাহলে।

তবু আমি, আমরা যারা এখনো মানুষ অনায়াসে
পশুদের হিংস্র ডাকি, যদি না এ বুক থেকে প্রেম
অবনত নেমে যায়। বলি আমি একজন কবি
যুদ্ধ ক্ষয় মড়কের আন্তর্জাতিকতা ভুলে গিয়ে
বলি জয়, জয় তব বিশুদ্ধ আনন্দ উদাসীন;
ডাকি শ্রদ্ধা বুকে এসো কবিতার সবিতাসাধনে
এসো শান্তি, সম্ভাবনা, জীবনের প্রিয়কারী জয়।

আমি থাকি তুমি থাকো; স্থিতির অমোঘ ঘোষণায়
সীমায় সম্মত আমি অন্য সব সম্ভাবনা দৃশ্য দেখে চিনি॥

বিগত প্রেমিকের ইচ্ছা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

দৈবাৎ দর্শন ভালো। কোনো দিন ইচ্ছা হয়, চকিত বিদ্যুতে
অতর্কিত কোনো মোড়ে তোমাকে দেখেই সৌম্য ভদ্রতম মুখে
স্মিত দাঁড়ালাম। তুমি বয়সে খানিক ছোট, ঈষৎ শ্রদ্ধায়
কুশল জানিয়ে চলে গেলে। সেই অবাঞ্ছিত হাওয়া
কোনো কিছু ওড়ালোনা, অতীত কালের ক্রুদ্ধ শোণিতের কণা
পদ্মপাতায় শুধু কোলাহল করে থেমে গেল।
দিন চলে পূর্ববৎ সাদা স্রোতে নিরবধি অসীম ধৈবতে।

কোনো দিন ইচ্ছা হয়, খেলাচ্ছলে আফ্রিকান নৃত্যের মুখোশ
মুখে কিমাকার এঁটে, হঠাৎ তোমার একা ঘরে ত্রস্তে আসি।
স্বভাবে বালিকা, ভীত প্রবল চিৎকার করে উঠতে যাবে, দ্রুত
মুখোশ চকিতে খুলে হেসে উঠবো ; ততোধিক ভয়ে তুমি এবার বিস্মিত
শব্দ করে ভেঙে যাবে, মুখোশের থেকে আরো ভয়ানক লাগছে কি
আমার প্রত্যক্ষ মুখ পুনর্বার এত কাছে, অতর্কিত প্রেত!
হয়তো যুবক নিয়ে কল্পিত বিকেলে তুমি সমর্পিত সুখে
কোনো মাঠে বসে আছ। শিকারীর মত আমি উজ্জ্বল বন্দুকে
বৃক্ষের চূড়ায় দুটি পাখি স্থিরলক্ষ্যে রাখি। নকল বন্দুক দেখে
পাখিরা অনড় থাকে, তোমরা দুটি উড়ে যাও আতঙ্কিত ডানা।

আত্মপ্রতিকৃতি

ফণিভূষণ আচার্য

গুপ্ত প্রেমিকের মত আমি তার সংকেতিত দ্বিতীয় দুয়ারে
গোপনে দাঁড়াই এসে। দুর্বোধ্য অঙ্গুলি-স্পর্শে সময়ের একটি লহমা
খুলে গেলে জোনাকির দুঃখ-মৌন আত্ম-আবিষ্কারে
অজানা ভূগোলে এক দ্বীপের জরীপে রাখি সীমাহীন আত্ম-পরিক্রমা।

একটি ঘুমন্ত ছায়া অন্ধকার শয্যা থেকে উঠে কায়ক্লেশে
আত্মহননের ক্ষোভে আমার দুহাত ধরে তরঙ্গিত সমুদ্রের তীরে
নিয়ে গেল। চমকে উঠি, কে আমার যৌবনের রক্তে উঠল হেসে
অজস্র মৃত্যুর সিঁড়ি ভেঙে আমি নেমে যাই নরকের দুরন্ত গভীরে।

সেখানে নিজেকে খুঁজি কিংবা এক অভিশপ্ত ঈশ্বরের মুখ
কিংবা গ্রীক ট্র্যাজেডির আত্মঘাতী নায়কের মত
একটি সরল, ঋজু, দীর্ঘ ছায়া অনশ্বর বাসনা-উন্মুখ
কালের পাথরে আঁকি যদিও হৃদয় এক যন্ত্রণার নখরে বিক্ষত
নাটকের মায়াদৃশ্যে অভিনয় সাঙ্গ করি।
আমার মৃত্যুর মত কৃষ্ণচূড়া-দিগন্তের খনি
দুহাতে উজাড় করে অবোধ্য আঙুলে খুলি অনাহত বুকের নিভৃতি
দ্বিতীয় দ্বারের গুপ্ত ইশারায় রাখি এক নরকের রক্তপদ্মমণি
আমারই যন্ত্রণা দিয়ে তার অন্ধকার ঘর ভরে তুলি, অথবা সে আত্মপ্রতিকৃতি॥

ছায়াবাজি

মানস রায়চৌধুরী

মজিদ এসেছে কালকে সন্ধেবেলা, রাত্রে তার বিবি ;
সন্দেহবাতিক ওরা দুজনেই, কে নাকি ওদের মাঝখানে
উড়ে এসে জুড়ে বসে ভাঙছে সংসারী পরিণয়—
জলের গেলাসে কার আঙুলের হলুদে ছাপ দেখেছে মজিদ।

আমিনাও নির্বাক নয়। গলা খুলে বলেছে সে : 'সব মিথ্যে ওর
রাত্তিরে নেশার ঘোরে এমনি ভুল-দেখাটাই মিঞার স্বভাব।
সারারাত্রি পাশে আছি, পাখা টানি, তবু আ মরণ
বলে নাকি ভোরবেলা শরীর দিয়েছি অন্য কাকে।
বরং আমিই ওকে দেখেছি অর্জুন মণ্ডলের
বিধবা মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে, ও যে সারাদিনটাই
বাড়ির বাইরে ঘোরে, কি মতলবে, ভেবেছে কিছুই বুঝছিনা।'

আসলে ছায়ার সঙ্গে ছায়া হয়ে লড়ছে দুজনেই
সমস্ত পৃথিবী ভাঙে কমলালেবুর কোয়া স্পষ্ট আধখানা
চিরায়ু ত্রিভুজ এক, তরোয়াল-দ্বন্দ্বযুদ্ধ সব কল্পলোক।
আমি তার মাঝখানে কি করে দাঁড়াব বিচারক
মজিদেরা সবই বলে অনর্গল, আমরা কুণ্ঠিত।
বাইরে ওরা শুয়ে আছে— দুটি মুখ উত্তর-দক্ষিণে,
কেউ কাউকে দেখবে না, অবিশ্বাসী দুটি ছিন্ন দেহ
আমি ঠিক বলতে পারি। রাতটুকু খুনোখুনি না হলে আবার
শেষরাত্রে দুজনেই বুকে মিশে একতাল প্রেমিক শরীর।

চিত্রিত যামিনী

সুনীল বসু

নিদ্রাহত মৃতদেহগুলি
জমে আছে কালো অন্ধকারে
চিন্তার সক্রিয় কারখানা করোটি ও খুলি
ছড়ানো রয়েছে ছায়ার পাহাড়ে।
দেয়ালে দেয়ালে জলহস্তী-ছায়া
জানালায় জলস্তম্ভ-মেঘ
শয্যায় শায়িত নারী-অঙ্গ
কান্না-ধোয়া স্তূপাকার শরীরী আবেগ।
তিব্বতী নক্সার শবাধারে
সিগারেট-শব
গ্রেহাউণ্ডের আঁৎকানো চিৎকারে
ছিন্নভিন্ন মশাদের উৎসব।
উপবাসী ফুসফুসে ঢুকে পড়ে
অক্সিজেনে ভরা একরাশ হাওয়া,
অগ্নিদগ্ধ চাঁদ উঠে আসে
মেঘের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চিমনীর ধোঁয়া।
আমার চিন্তার সাম্রাজ্যে হঠাৎ
জাগে এক বিবস্ত্র বিদ্রোহ
রক্ত-কণিকায় যেন অগ্নির আঁতাত
মশালের মত জ্বলে রমণীর প্রতি মোহ!
বিড়ালের চক্ষু জ্বলে
ছাড়ায় নিঃশব্দে মুর্গীর পালক,
মেঘের গীর্জায় বাজে তারার ঘণ্টা
রাত্রি এক বৃদ্ধ যাজক।

উমা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

তোমাকে দেখেছি শয্যালীনা ব্যাধিতে অবশ অঙ্গ
মন তবু মানেনি বশ্যতা। গ্রন্থে গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে
মহতের সঙ্গে সঙ্গে আছে। রসের সিঞ্চনে নিত্য
সিক্ত যাঁরা করেছেন চিত্তভূমি সরস সুন্দর
তুমি.সেই স্রষ্টাদের দ্রষ্টাদের হয়েছ সঙ্গিনী।
যদিও গোপন দুঃখ আছে, সে দুঃখ দুঃসহতর
শঙ্কা ভয় নৈরাশ্যের স্তরে স্তরে প্রগাঢ় আঁধারে
নিয়ত বহন কর স্মিতমুখে সহনাতীতকে।

এ পাশে সংসার সুখী দম্পতীর নীড় ঘরে ঘরে
মানে অভিমানে ভরা, দাপাদাপি দুরন্ত শিশুর,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ উৎসুক উন্মুখ দুটি চোখে
জীবনতরঙ্গরঙ্গ। কান পেতে শোন তার ধ্বনি
আর-এক সমুদ্রনীল চাদরের আবরণে ঢাকা
উঠে পড়ে কত ঢেউ সংশয়ের স্বপ্নের সাধের।

পরিচয়

লীলাময় বসু

সেদিন হলো আমাদের পরিচয় প্রথম
হঠাৎ এক ঘটনার মঞ্জুরিত আন্তরিকতায়।
কম্পিত হলো ভীরু জীবনের চিন্তারাশি
যৌবনের অসংখ্য কম্পনের মাঝে।
সোনালি-নীল আকাশে লাল মেঘের সঞ্চরণ
সে কি আমাদের শরীরের রক্তিম বাসনা ?
ধীরে ধীরে ফেনায়িত হলো দিগন্ত ক্ষুধিত দেহে
শঙ্কিত কামনা উল্লসিত হলো বাস্তব-ধূসর মনে।
কোনো-এক বাসনা-দীপ্ত দুরন্ত সন্ধ্যায়
চলেছি ভেসে ঢেউয়ের পুলকিত আমন্ত্রণে,
উপরে বিশাল পূর্ণতায় চাঁদ সুগোল
পাশে চলমান বনের সবুজ গভীরতা,
অবসন্ন মনের ক্ষিন্ন প্রসন্নতা যত।
গতিশীল বর্তমান, ভবিষ্যতের সোনালি সংকেত
দৃশ্যমান হলো অন্তরঙ্গ রাজপথে
কিছুদিন ভাসমান মাতামাতির পর।
বিবেকের আনাগোনা শুরু এখন মনের দুয়ারে
বাস্তব-ভীত মন ছোটে প্রশ্রয়ের প্রান্তরে
সময়ের ঢালুপথে আমরা তখন খানিক চঞ্চল।
শুরু নীরবতার পর আকাশ ভেঙে পড়ে অজস্রধারে
মানুষের মনে জাগে ফসলের বিপুল সম্ভাবনা
সেই অজস্র মুহূর্তে পুষ্পিত হলো আমাদের পরিচয়।

স্বগত

অবিনাশ রায়

এই তো আমার দম্ভ, নীলকণ্ঠেরই মত হয়ে আছি নীল।
সমস্ত দুঃখের বিষ আমার অথচ তোমরা লক্ষীন্দর শব
ভেসে যাচ্ছ যমুনায়, কালো জলে ধূর্ত ছায়া অমৃতসম্ভব
অন্য কি রজনী ভোরে ডেকে উঠবে গৃহৈষণা কদম্বে কোকিল।
বারে বারে আলো নিভছে, লক্ষচূড়া মেঘে ঢাকে সমুন্নত দিন
চতুর্দিকে বালুচর তেপান্তর তেপান্তর ঝাপসা গাছপালা
শূন্য ঘটে হাওয়া আর স্রোতে দুলছে সুতীব্র গলিত চাঁচ্‌গালা
কয়লার মত পুড়ছি লোভে লোভে অভিমানী দুরন্ত হরিণ।

এই তো আমার দম্ভ, নীলকণ্ঠেরই মত হয়ে আছি নীল।
অন্য কি রজনী ভোরে ডেকে উঠবে গৃহৈষণা কদম্বে কোকিল।
বারে বারে আলো নিভছে, উজ্জ্বলতা মুছে যদি মৃত্যু দাও—মন
ক্রূর দেবতার মত : শ্মশানবৈরাগ্যে কাঁদবে শ্রান্ত ঝাউবন।

তোমরা তো দেবতা সব, আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি বৃদ্ধ মরা গাছ।

দ্বৈতরূপ

কৃতী সোম

চোখের পর্দায় ছায়া, পড়ন্তবেলার
রঙের আবির ঝরে, আর
ঘাসের প্রাণনা।
একটু সংশয় কই, কই আজ অস্থির বেদনা
চেতনা-রজ্জুতে সূত্র বীত অতীতের,
কিংবা কোন অশ্রুমুখী জের।

অশ্রুমুখী জের নেই পড়ন্তবেলায়
এ কথা নিশ্চিত বলা যায়
এমন ঋতুর গায় ?
দৃশ্যপটে অকস্মাৎ ছবি এক এলে
হৃদয়প্রতীতি কেন মেলে !

এখনো বোধের নীচে ঘুমায় বিভ্রম।
তরঙ্গিত আকাঙ্ক্ষার খেয়া
বাইরে আলোর স্তব, ভিতরে আলেয়া।

দূরের চিঠি

তুষার চট্টোপাধ্যায়

নিশ্চিত খুশির তীব্র তোমার হৃদয়ে
সমুদ্রের মুখরতা
দূরত্বের ব্যবধানে
আমি একা জানালায় কিংবা কোনো টিলার আশ্রয়ে
দেখি মৌন পাহাড়ের ক্লান্ত নীরবতা।
নির্বিঘ্ন স্মৃতির চিত্র। কত স্মৃতি বিষণ্ণ বানানে
আমাকে অস্পষ্ট করে।
হেমন্তে হলুদ আলো
সমবেত সবুজের সুদীর্ঘ প্রান্তরে
তৃপ্তির অতীত আমি। স্পর্শের নিকটে এসে জ্বালো
সমর্পিত নিবিড়তা
আলিঙ্গনে গোপন আদরে।

পাহাড় সমুদ্র সব অনাত্মীয়। আকাঙ্ক্ষার উদ্‌বর্তে তীক্ষ্ণ অবাধ্যতা
প্রীণনে নিভৃত সুখ অঙ্গে আঁকো স্পষ্ট ঘনিষ্ঠতা॥

তুমিও হারাবে

বন্দনা বসু

বাসার বাসনা নিয়ে যে পাখি আকাশে ছুটে যায়
মুখে নিয়ে খড়কুটো তোমার দুয়ারপ্রান্তে এসে—
তবুও পাবে না তাকে কোনো দিন তুমি ভালোবেসে।
সে পাখি হারায় যদি তার পথ ; গাছের পাতায়
যে ঝড় হঠাৎ জেগে বাসার বাসনা করে দূর
অকস্মাৎ সে পাখির কোনো দিন অথবা কখনো—
তবু তার জন্যে থাকে রাত্রি জেগে একা একজনও।
মানুষের মত তার বেজে ওঠে বিরহের সুর।
আরো তো অনেক পাখি বাসা বোনে বনের গভীরে।

যে পাখির ডানা ভাঙা, একদিন নিয়েছিল খুঁটে
তোমার অঙ্গন থেকে যে পাখি একটি কুটো ধীরে
তাকে আজ দাও ছেড়ে—হয়তো উঠবে হাসি ফুটে
তার মনে। আজো গাছ জেগে আছে ফুলের পরাগে—
সে পাখি না ছাড়া পেলে, সব-কিছু তুমিও হারাবে।

ত্রয়ী •

অমলেন্দু ঘোষ

১. লজ্জা

বিদ্যুৎও লজ্জা পায়
চমকে ওঠে !
ও যে দেখে ফেলেছে !
দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে
অসহায় ধরিত্রীর বুকে
ধূর্ত শিয়ালের মাতামাতি !
—অসহায় ক্রন্দন !
বিদ্যুৎ লজ্জা পায়,
—চম্‌কে ওঠে !

২. ফসল

পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার মেঘ
তারি 'পরে চেতনার বিদ্যুৎ- কশাঘাত ;
—বৃষ্টি এলো।
অঘ্রাণের ক্ষেত হাসে,
সোনার ফসলে।

৩. দুই পৃথিবী

তাই ভাবি,
একই তো হাওয়া—
কাশের বন যেন নেচে ওঠে !
বাঁশের বন কেন কাত্‌রে ওঠে।

তাই দেখি,
একই তো হাসি —
এক জন কেন ফেটে পড়ে।
আরেক জন যেন আঁত্‌কে ওঠে !
একই হাওয়া···
একই হাসি
অথচ দুটো আলাদা জগৎ !

সবুজ পাখি

সুশীল রায়

তাঁর কথা রোজ শুনি, প্রত্যেকের মুখে তাঁর নাম।
সময়ে কি অসময়ে তাঁর নাম প্রত্যেকের মুখে।
ভীষণ চঞ্চল লোক, ধরে রাখা ভীষণ কঠিন—
সম্মুখের ঝুঁটি তাঁর ধরেছে অনেকে, তবু তাঁর
গতি মন্দ হয়েছে যে, অদ্যাবধি পাইনি খবর।
ছোট হাতঘড়িটার সেকেণ্ডের কাঁটাটা যেমন
তর্ তর্ ক'রে চলে— ছটফটে তেমনি অবিকল।
তাঁকে পাওয়া দায়, তবু, তাঁকে যদি না পেলে, তাহলে
ছোট-বড়-মাঝারি যা হোক কাজ করা অসম্ভব।
কিন্তু সদাশয় অতি, সজ্জন, অতীব সহৃদয়—
এমনি অনেক বিশেষণ দিয়ে পরিচয় তাঁর।
পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে দরোজার কড়া নাড়া দিয়ে
ঘুম ভাঙাবার ভার নিজে মাথা পেতে নিয়েছেন—
প্রত্যেকের খোঁজ নেওয়া তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।
নিত্য পেণ্ডুলাম দোলে তাঁর পদশব্দের সংকেতে,
ঘড়ির কাঁটারা নাকি তটস্থ সর্বদা তাঁকে দেখে।
মারা গেল কারা, জন্ম কে কে নিল— কখন, ক'টায়
প্রতিটি হিসাব নখদর্পণে, এমনি যোগ্য লোক।
সুতরাং তাঁর নাম প্রত্যেকের মুখে যায় শোনা।

অথচ স্বরূপ তাঁর দেখলাম চাক্ষুষ সেদিন,
জীবনের লোকসান কি হয়েছে— হিসাব পেলাম।

আমি তাঁকে ভুলে থাকি, ভুলে-ভুলে ভুল করি রোজ
আমার যাওয়ার আগে রোজ তাই ছেড়ে যায় ট্রেন!

দেয়ালের ঘড়ি তাই দুই হাত প্রসারিত ক'রে
আপিসের তাড়া দেয়— সোয়া ন-টা সোয়া-ন-টা হল।
তাড়াহুড়ো করি, যাতে আজও ফেল না করি এ-ট্রেন।
পকেটে পানের কৌটো ফেলে, ছাতি গুটাতে গুটাতে
দরোজার চৌকাঠের ওই পারে ডান পা ফেলেছি
অমনি সম্মুখে বাধা— কে যেন উঠছে সিঁড়ি বেয়ে।

"আপনি কাঞ্চনবাবু?" তৎক্ষণাৎ শুধরিয়ে নিয়ে
যেন হেসে বললেন, "আপনি না। তুমি কি কাঞ্চন?"
মাথা নাড়ি: হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু তুমি অথবা আপনি
কিংবা ভাববাচ্যে— কোথা থেকে আসা হল— এই কথা
বলার আগেই তিনি বললেন, "আমাকে চেন নি।
চোখের চাউনি বলে দিচ্ছে তা। যাক, ঘরে চলো।
আপিসে নাহয় যাওয়া নাই হল মাত্র একদিন।
সময় সময় ক'রে এত-যে হাঁপানো, তার ফলে
কি লাভ হয়েছে শুনি? আজ বয়ে যাক-না সময়।"

চৌকাঠের পরপার থেকে টেনে নিই ডান পা-টা,
ঘরে ফিরি, টুলে বসি; বসাই চৌকিতে অতিথিকে।
কোনো দিন কোনো কালে কখনো যে দেখেছি কোথাও,
কিছুতে পড়ে না মনে। স্মৃতিকে মন্থন করি বসে।
কানের কিনারে চুল সাদা, সিঁথি যেন রাজপথ—
সে পথের দুই পাশে সময়ের পদচিহ্ন আঁকা।

"চেনা কষ্ট," বলল সে, "তবু আমি চিনতে পেরে গেছি,
কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে না। রামপুর-বোয়ালিয়া
মাস্টারপাড়ার রাস্তা, সাহেববাজার, সেই দিঘি—
কোনো ছিটেফোঁটা স্মৃতি নেই বুঝি একটু কোথাও?

মনের ভাঁড়ার বুঝি শূন্য ? পদ্মার কিনার থেকে
পাথরের রাস্তা এসে মুন্সিপাল-দিঘিটার গায়ে
মিশেছে শুরকির টুকটুকে রাঙা পথে ? তার বাঁয়ে
লোকনাথ ইস্কুল ? তার সম্মুখেই মাঠ— চাকিদের ?
যেখানে কাদার মধ্যে শূয়োরের পাল সারাদিন
কি খেলা খেলত কে জানে, শুঁকে শুঁকে বেড়াত মাঠটা
ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ক'রে ? ডোমেদের পল্লী তার পাশে ?
ঠিক তার গা ঘেঁষেই ঢেউতোলা টিনের চৌচালা ?
কে যেন থাকত সেখানে ? মধু-গয়লানি। তার পিছে
জামরুল-ছায়ার নীচে খড়ের দোচালা ঘরখানা
বেশ নিরিবিলি, ঠাণ্ডা ; কে থাকতেন ? বিনু-মাসী—
বিনু-মাসী থাকতেন সেখানে। তাঁর মেজমেয়ে চাঁপা ?
মনে পড়ে তার কথা ? এখনো পড়ছেনা বুঝি মনে ?
টাটা-রোদে গুলতি-হাতে একা বনটিয়ার পিছনে
ঘুরে-ঘুরে কাদা-মেখে ঘেমে-নেয়ে হয়রান হয়ে
দোচালার বারান্দায় এসে কে চ্যাঁচাত— 'বিনু-মাসী ?'
ডাক শুনে কালোকুলো ছোট্ট যে-মেয়েটা ঘটি নিয়ে
প্রথমে অনেক গাল দিয়ে, শেষে ঢেলে দিত জল—
আমি সে-ই— আমি চাঁপা।"

মাথার কাপড় ঠিক করে
বলল আবার, "তুমি তবু বুঝি চিনতেই পারছ না ?
অনেক দিনের কথা হল— সে কি আজকের ঘটনা ?
আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি, তোমার তখন ক্লাস সিক্স।"

দীর্ঘ আত্মপরিচয় মন দিয়ে শুনি স্তব্ধ হয়ে।
নিজেকেও চিনতে চেষ্টা করে চলি। শব্দহীন ঘরে
টিকটিক শব্দ করে দেয়ালঘড়িটা। চেয়ে দেখি—
প্রসারিত দুই হাত একত্র করেছে, মনে হল

যেন নমস্কার করে সম্ভ্রম জানাচ্ছে আমাদের
ঘড়ির কাঁটারা ; বুকে বিঁধে গেল যেন ওই কাঁটা

ইতিমধ্যে কেটে গেল ক'মিনিট— পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ,
দশটাই বাজে-বাজে। বাজে চিন্তা ত্যাগ করে বসি।

ইচ্ছে করে বন্‌বন্‌ ঘুরাই ও-দুহাত বাঁ পাকে
অনেক অনেক বার— লক্ষ শত পরার্ধ নিযুত।
বয়স আপিস সব দূরে ছুঁড়ে ফেলে, ঊর্ধ্বশ্বাসে
ছুটে গিয়ে একবার দাঁড়াই সে দিগন্তের পারে
যেখানে এখনো আছে হয়তো-বা চাকিদের মাঠ,
খোঁজ করি ডালে-ডালে বনে-বনে জামরুল-ছায়ায়
কোন্‌ ডালে উড়ে গেছে আমাদের সবুজ পাখিটা।

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কাল ছিল আকাশ উজ্জ্বল নীল, আজ মেঘভারাতুর। কিন্তু একই আকাশ। তেমনি কবিতা চিরদিনই এক, শুধু বাইরে রূপের আর রঙের খেলা বদলায়।

আধুনিক-অনাধুনিকে দ্বন্দ্ব অর্থহীন। বিচারের যদি কিছু থাকে, সে হচ্ছে কবিতা-অকবিতার। আধুনিকদের মধ্যে যাঁরা শক্তিমান, রসজ্ঞ পাঠক তাঁদের মেনে নিয়েছেন। কিন্তু নবীনতার নামে যেখানে ভাবে ও ভাষায় উৎকট স্বৈরাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতা, আপত্তি উঠছে সেইখানেই। অক্ষমদের অপরাধের দায় অনেক সময়ে পড়েছে গিয়ে ক্ষমতাবানের স্কন্ধে ; হয়তো তার কারণ, ক্ষমতাবান্ ঐ অক্ষমদের পোষকতা করেছেন। দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এমন-কি, সম্পাদকের আলোচনায় কোনও কবির নাম না করে যে-ধরণের রচনা নিন্দিত হয়েছে তাঁর পত্রিকাতেই সে ধরণের প্রচুর লেখা স্থান পেয়েছে, এও দেখছি। প্রাচীনপন্থীদের বিরূপতায় ক্ষুণ্ণ হয়ে কিংবা খ্যাতি অর্জনের লোভে তিনি দলপুষ্টিতে মন দিয়েছেন। তখন তাঁর মন রস-স্বর্গে নেই, নেমেছে স্তাবক-সংগ্রহের হাটে। তিনি কবি, কিন্তু প্রাচীনদের অস্বীকার করে নতুন দলে নেতৃত্ব করতে চেয়েছেন, প্রাচীনের অনুরাগীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাতে, নতুনদের প্রতি হয়েছেন আরও বিমুখ। ভুল-বোঝাবুঝির এই বোধ হয় ইতিহাস।

আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা কি ? তার লক্ষণ কি ? হাল আমলে যে-সব কবিতা লেখা হয়েছে, তাকেই আধুনিক বলতে 'আধুনিকেরা' নারাজ। তাঁদের স্বীকৃত অন্যতম প্রধান লক্ষণ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তি বা মুক্তির প্রয়াস। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রথম সংস্করণের অন্যতম সংকলয়িতা আবু সয়ীদ আইয়ুব ভূমিকায় লিখেছিলেন, "কালের দিক্ থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক্ থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্ততঃ মুক্তি-প্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।" এমন নেতিবাচক লক্ষণ দিয়ে কাব্যের স্বরূপ-নির্দেশ একটু অদ্ভুত সন্দেহ নেই ; অথচ তা ছাড়া ওর পরিচয় দেওয়া কঠিন। ঐ গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু প্রায় ঐ কথাই

বলেছেন অন্য ভাষায়, "এই কবিদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ কোন্‌টা তার আভাস দিতে যাওয়াও তর্কসাপেক্ষ ।...সহজ দৃষ্টিতে যেটুকু চোখে পড়ে তা এই— এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর ।"

মজা এই যে, পর পর দুটি সংস্করণেই 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি— "কোনো পাঠক হয়তো মনে মনে বলছেন—রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই। সে কথাও সত্য।" আরও সবিস্তারে তিনি বলেছেন অন্যত্র— "রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে···আর না তুললেও চলে। বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন।"

তা হলেই প্রমাণিত হচ্ছে, পুরোপুরি রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তি একালের বাঙালী কবির পক্ষে সম্ভব নয়। যা সম্ভব তা হল সজ্ঞান মুক্তির প্রয়াস। আর প্রয়াসসাধ্য রচনা স্বতঃস্ফূর্ত কি না। এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। প্রয়াস যে পরিমাণে প্রকট, কবিত্ব সেই পরিমাণে দুর্লভ হবারই সম্ভাবনা। তবে রবীন্দ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? আধুনিকেরা তাঁদের কবিমর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত কেন? তাঁরা কি রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনিই করে গেছেন? নতুন সুর তাঁদের কণ্ঠে বাজেনি?

বস্তুতঃ, নূতনত্ব বা মৌলিকতা কবির দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা থেকেই আসে। তা জোর করে আনবার দরকার হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বা নিকট-শিষ্যদের সে স্বকীয়তা আদৌ ছিল না, বোধহয় এ ধারণাও ঠিক নয়।

সত্যেন্দ্রনাথ যে রূপ-চপল মন নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের ধ্যানী বা তত্ত্বদর্শী মন নয়। ছন্দে আধুনিকেরা ধ্বনি-মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে যে পরীক্ষা করছেন, তার নজীর দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে আছে। শুধু বলা যেতে পারে, মহাযুদ্ধোত্তর মানস তাঁদের কবিতায় ছায়া ফেলেনি। সেটা কালের বিধান, কাব্যবিচারের মানদণ্ড নয়।

সন্দেহ নেই, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবল আঘাতে মানুষের বহু স্বপ্ন গিয়েছিল চূর্ণ হয়ে, সমাজে ধরেছিল ভাঙন, নবসমাজের কল্পনাও উদ্বুদ্ধ করেছিল অনেককে। 'শান্তির ললিত বাণী'তে সান্ত্বনা পায় নি অনেকের মন। 'দখিন

হাওয়া' আর 'ফুলের দোলা'য় তারা ভুলতে চায় নি, অন্যত্র অন্যতর কাব্যের সন্ধান করেছে। বিদ্রোহী নজরুল ভাবে এবং ভাষায় অনেকটা বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে হিংসাদ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে টেনে এনেছিলেন আমাদের মনকে। হয়তো সেখানেও রবীন্দ্রপ্রভাব অনাবিস্মরণীয় নয়। 'দুরন্ত আশা' বা 'গুরুগোবিন্দে'র ধ্বনি তাঁর অনেক কবিতায় লুকিয়ে আছে। তবু ফৌজী কুচকাওয়াজের তালে উত্তেজনায় উন্মাদনায় একে নূতন সংগীত বলেই মনে হয়েছিল। মোহিতলালের বলিষ্ঠ আপাতকঠোর বাচন-ভঙ্গীতে ও জীবনজিজ্ঞাসায়, যতীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম আদর্শের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপে নব পথযাত্রার আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছিল। পরবর্তী আধুনিকদের মধ্যে সে আগ্রহ ক্রমশঃ আরও প্রবল ও প্রয়াসশীল হয়ে উঠেছে।

স্বভাবতঃ মানুষ বৈচিত্র্যপিয়াসী। ভালো জিনিসও একটানা বেশিক্ষণ ভালো লাগেনা। সে স্বাদ বদলাতে চায়। সেই তাগিদেই নতুন কাব্য গড়ে উঠেছে। সমকালীন আঘাত সংঘাত হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে তাতে। কল্পনার রসপ্রবাহের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে বাস্তবের রূঢ় রুক্ষ রূপ। অধ্যাত্ম আদর্শ মিলিয়ে গেছে দূরদিগন্তে, ইহজীবনের স্বরূপ-চিন্তা করেছে তার স্থান অধিকার। কামনা বাসনা রোগ শোক জরা মৃত্যু এসেছে প্রত্যক্ষ হয়ে। কাব্যের সীমানা হয়েছে বিস্তৃত।

আমরা লাভবান হয়েছি এতে। স্বাদবৈচিত্র্য আমাদের রসোপভোগের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে যাঁরা নতুনকে নিয়েই আত্মহারা হয়েছেন, তাঁরা নিজেদের বঞ্চিত করেছেন আনন্দের বৃহত্তর অধিকার থেকে।

যা নিয়ে নতুনদের অভিযান তার আভাসও কি ছিল না পূর্বতন কাব্যে? ছিল। তবে নব পরিবেষে তা আজ নতুন ভঙ্গীতে দেখা দিয়েছে। অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরিবর্তে নবীন কবি দেহজ কামনায় বেশি বিশ্বাসী—

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে।
স্থান পাবে, হে ক্ষণিক, শ্লথনীবি যৌবন তোমার।
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার
আজি আর ফিরিবনা শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।

—সুধীন্দ্র দত্ত : হৈমন্তী

মূল কথা নূতন নয়। 'কর্পূরমঞ্জরী' থেকে 'বিদ্যাসুন্দর' পর্যন্ত বহুকাব্যে এ দেহবাদ আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়েছে। দেহাসক্তিকে আরও বেশি মর্যাদা দিয়ে বলেছেন গোবিন্দচন্দ্র দাস—

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস-সহ।

মোহিতলালের কণ্ঠেও শুনেছি—

ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করে জ্বালি কামানল।

শুধু আজ কথনভঙ্গী অন্যতর, বিদেশী কাব্যের ধ্বনি স্পষ্টতর।

ক্ষণবাদের যুগ আমাদের, শাশ্বতে আস্থা নেই। তাই সুধীন্দ্রনাথের মুখে শুনি—

অসম্ভব প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ;
অসঙ্গত চিরপ্রেম সম্বরণ অসাধ্য অন্যায়
বন্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায়।

—মহাসত্য

ভোগস্পৃহার কাব্য বলেই রসজ্ঞ পাঠক কোনোদিন মুখ ফেরান নি। 'অমরুশতক' 'শৃঙ্গারশতক' থেকেও একদিন আমরা রস আহরণ করেছি। তাই নবীনের ইহমুখিতা কাব্যরাজ্যে অপাংক্তেয় নয়। অপর পক্ষে বিষয়ের দিক্ থেকে সে সম্পূর্ণ নূতন কথা বলেছে, এ দাবিও স্বীকার্য নয়। পুরোনোকেই নতুন সাজে সাজিয়ে এনেছে বলা যেতে পারে। অবশ্য তাতেই মনে হচ্ছে অভিনব।

ভাবের ক্ষেত্রে কতটুকু আমাদের নবত্ব? অধ্যাত্মদর্শন আর লোকায়ত দর্শন অতীতেও পাশাপাশি চলেছে। বেদান্ত সাংখ্য ও চার্বাক দর্শনে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ মিলেছে। ক্ষণবিজ্ঞানবাদের কথাও কতবার শোনা গিয়েছে। স্থানে কালে শুধু তার প্রকাশের রূপান্তর ঘটেছে।

কিন্তু কাব্য তো বিষয়সর্বস্ব নয়। প্রকাশনৈপুণ্যেই তা আমাদের অনুভবগোচর। যে-ভাব নিয়েই লেখা হোক-না কেন আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিতে পারলেই কবিতা সার্থক। ভোগের কবিতাও কবিতা, ত্যাগের কবিতাও কবিতা, প্রেমের শান্তি আর হিংসার বিক্ষোভ কোনোটিই নির্বাসনযোগ্য নয়। কিন্তু 'হৃদয়ে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারলে'। ভাষায় সে শক্তি সে অনুপ্রাণনাশক্তি প্রকাশ না পেলে রচনা কবিতা পদবাচ্য হয় না।

আগেই বলেছি, আধুনিক কবিরা বিদ্রোহী, নবপথের সন্ধানী, রাবীন্দ্রিক-পন্থা-পরিহার-প্রয়াসী— রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ, ভগবদ্‌বিশ্বাস, ধ্রুবসত্যে আস্থা, আদর্শপ্রবণতা এবং ভাষার অবিচ্ছিন্ন লালিত্য ও সৌষ্ঠব— এ সবই বর্জন করবার ঝোঁক অনেকের বেলায় দেখা গিয়েছে। সকল বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে আত্মার যে অবিচল শান্তি, তার প্রতি এঁদের আগ্রহ নেই। হয়তো আজকের প্রলয়-কোলাহলের মধ্যে সে শান্তি রক্ষা করা কঠিন। আর হয়তো দুঃস্থ বিভ্রান্ত মানুষের কবি হয়ে মঞ্চে দাঁড়াবার বাসনাও এঁদের কাউকে কাউকে উৎসাহ জুগিয়েছে।—

> আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যাপ্রতিরোধ,
> আমার প্রেমের গানে দিকে দিকে দুঃস্থের মিছিল,
> আমার মুক্তির স্বাদ জানে নাকো গৃধ্নুরা নির্বোধ—
> তাদেরই অন্তিমে বাঁধি জীবনের উচ্চকিত মিল।

—বিষ্ণু দে : ২২শে শ্রাবণ

বর্তমান সভ্যতার জটিলতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন অনেক আধুনিক কবি— শহর-জীবনের কলুষ ও জৌলুষ, জনগণের দুঃখ দৈন্য হতাশা, প্রকৃতির পরিবর্তনশীল মূর্তি। বিষয়ের নূতনত্বের জন্য যেটুকু অপরিহার্য, সেটুকু প্রকাশ-ভঙ্গীর নূতনত্ব মেনে নেওয়া চলে, কিন্তু জোর ক'রে আনা নূতনত্ব রসসৃষ্টিতে বাধা ঘটায়।

তথাকথিত আধুনিকের একটি দুর্বলতার দিক আছে। কেউ কেউ এমন ভাবে শব্দযোজনা করছেন যা থেকে অর্থগ্রহণ করা কঠিন ; বহু চেষ্টায় কিঞ্চিৎ অর্থের আভাস পেলেও প্রায়ই দেখা যায়, ভাব অকিঞ্চিৎকর, অনুভূতি অনুপস্থিত। এ ধরণের নূতন প্রয়াসকে কাব্যের মর্যাদা দিতে মন আপত্তি

করে। বিভ্রাট্ বাধে তখন, যখন দেখি, প্রতিষ্ঠাবান্ কবি-সমালোচক তার উচ্চপ্রশংসা করছেন। হয়তো তাঁর ব্যক্তিপ্রীতি কাব্যবিচারকে ছাপিয়ে উঠছে।

এ যুগের কোন্ কবি কি নিয়ে লিখবেন, কি ভাষায় লিখবেন, তা তিনিই জানেন। নির্দেশ দেবার অধিকার আর কারও থাকতে পারেনা। কবিতা ফরমায়েশী জিনিস নয়।

বাস্তবতার যুগ, সংগ্রামের যুগ— এসবও একপেশে বিচার। জীবনানন্দের স্বপ্নদৃষ্টি কি এ যুগের নয়? 'সাতটি তারার তিমিরে' যুগসভ্যতার আর্তি এবং নবপৃথিবীর আশ্বাস বেজেছিল তাঁর কবিকণ্ঠে, কিন্তু তখনও তাঁর ভাষা প্রচার-প্রবণ কিংবা রুক্ষ-কঠোর হয় নি। তাঁর লেখায় প্রায়ই দেখেছি আত্মমগ্ন দার্শনিকের মনোভাব। যেখানে তাঁর রচনা দুর্বোধ বা অসংলগ্ন, আমাদের বিশ্বাস, সেখানে তাঁর চিত্ত বিভ্রান্ত, অনুভব অগভীর।

বাস্তবে-কল্পনায় চমৎকার মিলন হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়। ইদানীং শুনি, তিনি নাকি যথেষ্ট আধুনিক নন। কিন্তু, নতুন সুর শুনেছি তাঁর কবিতায়, 'রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর'।

আসল কথা, নতুনের প্রতি আমাদের বিরাগ নেই, কিন্তু পুরাতনের প্রতি বিমুখতায় আমাদের আপত্তি। আর আপত্তি ভাষার স্বাভাবিক রীতি -লঙ্ঘনে, ঐতিহ্য-অস্বীকারে, এবং নতুনত্বের নামে অক্ষম প্রয়াসের জয়গানে। 'নতুন কিছু করব' ব'লে পণ করে সাহিত্যসৃষ্টি হয়না। নবপরিবেশে শক্তিমান্ লেখকের মনে আনবে নব ভাবনা নব কল্পনা। নতুন রচনা-ভঙ্গী তাঁর কলমে আসবে অন্তরের তাগিদে। জোর করে ভাষাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে, অকারণে দুর্বোধ্য করে তাঁর অসাধ্যসাধন করতে হবেনা। যেখানে অনুভব সত্য, সেখানে সাংকেতিকতা থাকতে পারে, তবু ভাষা হবে ঋজু, জীবন্ত। ভাবের দৈন্যই আনে আবিলতা, দুর্বোধ্যতা।

নূতন শব্দ ব্যবহার মাত্রেই আপত্তির কারণ নেই, আবার ও নিয়ে বেশি বাহাদুরি করবারও কিছু নেই। 'আধুনিক কাব্য পরিচয়ে'র লেখিকার মতে কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ— আধুনিক কাব্য-প্রকরণের সর্বপ্রধান লক্ষণ। অলংকারপ্রয়োগে এই মিশ্রণের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু থেকে—

মড়ার খুলির মত চাঁদ।...

আঙুলের নিচে সাপের খোলসের মত ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আমার লেখা।
বাস্তবিক এ লক্ষণও কি নতুন? এ প্রসঙ্গে কি মনে পড়ে না দেবেন্দ্রনাথ সেনের—

নয়নে নয়নে কথা ভালো নাহি লাগে
আধ গ্রাস জল যেন নিদাঘের কালে—

অথবা গোবিন্দচন্দ্র দাসের—

রবির পরিধি লাল মাংসপিণ্ডপ্রায়
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়—

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাতেও উপযুক্ত উদাহরণ অনেক মিলবে।

বস্তুতঃ সুকবি মাত্রেই নতুন কবি, বিশিষ্ট কবি, স্বতন্ত্র কবি। একালের ভাব যাঁর লেখায় সুন্দর প্রকাশ লাভ করেছে তিনি অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু দাবিদার অকবিদের বিষয়ে সচেতন থাকা ভালো। বিবাদ নয়, সে ক্ষেত্রে অনুচ্ছ্বাস বা নীরবতাই রসজ্ঞের পক্ষে সঙ্গত।

অক্ষম অনুকরণ সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ; রবীন্দ্রনাথের হলেও যেমন, ভ্যালেরি, মালার্মে, বোদলেয়র, র‍ঁাবো, এলুয়ার বা ডাইলন টমাসের হলেও তেমনি। তবু সত্যকার বড় কবির অনুকরণে যদি-বা কিছু থাকে, নিকৃষ্ট কবির অনুকরণে উল্লেখযোগ্য কিছুই থাকেনা।

একটি বহুপরিচিত যুগ এবং কয়েকটি সুপরিচিত কবিতা

চতুর্দশ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সেসকো পেত্রার্কার সাফল্যে সনেট নামধেয় চতুর্দশপদী কাব্যরীতিটি সারা পশ্চিম-ইউরোপকে একদা প্লাবিত করে ফেলেছিল। সকলেই জানেন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এই মহৎ আদর্শটি স্থানান্তরিত হয়েছিল সার্ টমাস উয়াটের উদ্যমে, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে। তখন রিনেসেন্সের জীবনধারা এলিজাবেথান ইংলণ্ডকে নবনব দিগন্তের সন্ধানে সমুৎসুক রেখেছিল, সে সময়ের আশা ও আশ্বাসে তরঙ্গিত ভাবোচ্ছ্বাস একটি রীতির তটবন্ধন সম্মুখে দেখে আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধা করেনি। ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি এডমাণ্ড স্পেন্সারের প্রথম আত্মপ্রকাশ এই রীতিকে আশ্রয় করে, যদিও তাঁর পরিণতজীবনের সনেটসংগ্রহ থেকে অনূদিত কবিতা দুটি গ্রহণ করা হয়েছে। স্পেন্সার থেকে শেক্সপীয়র পর্যন্ত মধ্যবর্তী আরও চার জন কবিকে নিয়ে এই অনুবাদগুচ্ছ। পাঠকের মার্জনা ভিক্ষা ক'রে জানাই, এই নির্বাচনে শ্রেয়ের দাবী বড় কথা নয়, অনুবাদকের ইচ্ছার অনুমোদনই প্রধান।

এলিজাবেথান সনেটের মৌল অভিপ্রায়টি প্রেম। কেন্দ্রবিন্দুতে যে আরাধ্যা নায়িকা, তিনি নিঠুরা পরকীয়া স্বামীনী (midons), কবি তাঁর সম্মুখে করুণাভিলাষী বিনত নায়ক। পাঠক বিচার করুন, চারিত্র্যগুণে এরা একাদশ শতকীয় প্রভঁসাল গীতিকবিতার সগোত্র কিনা। পাঠক বিচার করুন, রিনেসেন্সের সচেতনতা এদের মনোবিকলনের ক্ষীণ প্রবণতার উপর কতখানি প্রভাব রেখেছে। আপাতভাবে, কতিপয় চরণের কয়েকটি ভাবনার চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণ ব্যতিরেকে এলিজাবেথান সনেট মূলত গতানুগতিক।

এই কথাটির উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি আপন অসামর্থ্যের কথা আমার স্মরণে আছে বলেই। এমনকি মূলে আমি নিজে অনুভূতির যে ভার পেয়েছি, অনুবাদে তা নিশ্চয়ই বজায় থাকে নি। অনুবাদক, শুনেছি, কবির সবচেয়ে বড় বিশ্বাসহন্ত্রী। অনুবাদক, শুনেছি, কবির বক্তব্য অস্পষ্ট ক'রে তোলেন, যেটুকু বাঁচানো প্রয়োজন সেইটুকুই হারিয়ে ফেলেন ভাষান্তরে। আমি নিজেই বুঝি তা সপ্রমাণ করতে বসেছি। —দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাতটি এলিজাবেথান সনেট : অনুবাদ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এডমাণ্ড স্পেন্সার (১৫৫২-১৫৯৯) ॥ আমোরেত্তি থেকে : ৩৪ সংখ্যক সনেট

যেমন অর্ণবপোত পাড়ি দেয় অকূল সাগরে,
সম্মুখ-আকাশে এক নক্ষত্রের বিশ্বস্ত নির্দেশে,
সে ধ্রুব নির্ভর যদি লুপ্ত হয়ে যায় ক্ষুব্ধ ঝড়ে,
কক্ষচ্যুত হয়ে ছোটে লক্ষ্যহারা দূরান্তে নিঃশেষে।
তেমনই আমারও ভাগ্য, যে নক্ষত্র সমুজ্জ্বল বেশে
লক্ষ্যাসীন ছিল মোর, সে মেঘবিলুপ্ত বলে আজ
হতাশ উন্মার্গে, অন্ধ তমিস্রায় আমি যাই ভেসে—
লক্ষ গুপ্ত ষড়যন্ত্রে চৌদিকে আমার সর্বনাশ।
তবু আশা রাখি, ঝড় থেমে গেলে প্রসন্ন আকাশ
ফিরাবে প্রিয়ারে মোর, হেলিস, আমার ধ্রুবতারা,
দীপ্ত হবে পুনর্বার মোর পানে প্রভাসম্প্রকাশ,
সুরম্য আলোয় ভ'রে দেবে হিয়া মেঘে আন্ধিয়ারা।
ততদিন শান্তি নেই, ততদিন উদ্বিগ্ন নিষ্ঠায়
আমি পথে পথে যাবো প্রচ্ছন্ন নিবিড় যন্ত্রণায়।

এডমাণ্ড স্পেন্সার ॥ আমোরেত্তি থেকে : ৪০ সংখ্যক সনেট

লক্ষ্য রেখো যখন সে মোহন হিল্লোল তুলে হাসে,
আমারে জানাযো কিসে ভালো লাগে সে হাসি তোমার ;
যবে দুই আঁখিপাতে শতধারে লাবণ্য বিভাসে
মধুর প্রচ্ছায়া তার মনে হয় স্থান বসিবার।
প্রাকৃত হৃদয়ে মোর মনে হয় মায়াবেশ তার
স্নেহশীল সূর্যাতপ বসন্তের রুচিরা দিবসে :
যখন ভীষণ ঝঞ্ঝা সমাপ্ত, বিশাল বসুধার
সদ্যমুক্ত বক্ষপট রূপোজ্জ্বল কিরণে বিহসে :

যা দেখে সকল পাখি সিক্ত শাখে যারা, ত্রাসবশে
গুহার আশ্রয়ে যত পলাতক পশু, ধীরে তারা
সব ভয় বিহ্বলতা ত্যাগ ক'রে আলোর পরশে
অবনত মাথা তুলে দাঁড়ায় আনন্দে দিশাহারা।
এমনই হিন্দোলা দোলে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আমার হৃদয়ে,
মেঘার্ত দৃষ্টির শেষে আলোর প্রসন্ন পরিচয়ে।

সার্ ফিলিপ সিডনী (.৫৫৪-১৫৮৫) আস্ট্রেফেল অ্যাণ্ড স্টেলা থেকে

স্বাগত জানাই নিদ্রা, অয়ি নিদ্রা, শান্তির আকর,
প্রজ্ঞার জীবনমূল, সন্তাপের পরম সান্ত্বনা,
দরিদ্রজনের বিত্ত; বন্দীর বন্ধনদুঃখহর,
সমদর্শী চক্ষে যার নাই উচ্চনীচের তুলনা;
আমারে বেষ্টিয়া তীক্ষ্ণ নিরাশানিক্ষিপ্ত লক্ষ শর,
অক্ষয় কবচে মোরে রক্ষা করো বিপদবারণা:
বন্ধ করো গৃহযুদ্ধ, মুক্ত করো বিপন্ন অন্তর,
আমি পূজা দেব, অয়ি, পূর্ণ করো আমার প্রার্থনা।
রেখো না আমার শুভ্র উপাধান, শয্যা সুমদির,
কোলাহলরিক্ত কক্ষ, আলোকনিষিদ্ধ যে নিভৃতে,
গোলাপে রচিত মালা, রেখো না রেখো না ক্লান্ত শির:
জানি এ সবই তোমার, তবু এ সবেরে সঙ্গ দিতে
বিপুল করুণা তবু যদি না মিলায়, জেনো তবে
স্টেলার প্রতিমা মোর অন্তরে উজ্জ্বলতর হবে।

সামুয়েল ডানিয়েল (১৫৬২-১৬১৯) ॥ ব্যথাবিমোহন নিদ্রা

ব্যথাবিমোহন নিদ্রা, শ্যামাঙ্গিনী নিশির জাতক,
মরণের সহোদর, জন্ম যার নীরব আঁধারে,
ঘুচাও আমার ক্লান্তি, প্রত্যর্পণ করো সে আলোক;
ফেরো সব অর্তি মম তমসায় পাসরি এবারে।

ঘটেছে যে নৌকাডুবি যৌবনের মূঢ় দুঃসাহসে
দিবসেই সাঙ্গ হোক তার তরে অঝোর বিলাপ :
কাঁদুক জাগ্রত আঁখি অনুতাপে সারাদিন ব'সে,
নৈশ অসত্যের তীব্র যাতনায় হেনো না সন্তাপ।
ক্ষান্ত হও আগামীর সংরক্ত বাসনা রূপায়নে,
ক্ষান্ত হও স্বপ্নাবলী : দিবসের ইচ্ছার প্রতিমা ;
দিয়ো না জাগরস্বর্গে মিথ্যা তোমা মিথ্যা সম্ভাষণে,
আরও দুঃখে বাড়ায়ো না আমার দুঃখের পরিসীমা।
আমারে ঘুমাতে দাও, বৃথা থাকি মেঘেরে জড়ায়ে,
যেন নিশি না পোহায় দিবসের পুঞ্জিত ঘৃণায়।

যশুয়া সিলভেস্টার (১৫৬৩-১৬১৮) ॥ সর্বত্রগামিনী প্রেম

নীচু যদি আমি ওই নিম্ন সমভূমিটি হতেম,
আর তুমি (সজনী গো) তুমি হতে উর্ধ্বের অমরা,
জেনো তবু আমি এই দীন প্রণয়ীর সব প্রেম
আমারই প্রেমের স্বার্থে স্বর্গারোহী হত, ত্যজি ধরা।
উঁচু যদি আমি ওই উর্ধ্বের স্বরগে সমাসীন,
আর তুমি (সজনী গো) তুমি হতে বিনত আবার
নীচু যত নীচু ওই সাগরের অতল গহীন,
তুমি যেখানেই মোর প্রেম যেত পশ্চাতে তোমার।
তুমি যদি মাটি হতে (প্রিয়া) আর আমি সে আকাশ,
মোর প্রেম দীপ্ত হত তোমা'পরে ভাস্কর যেমন,
তাকাতো তোমারে ঘিরে জেনো তার লক্ষ আঁখিপাশ
যতক্ষণ স্বর্গ অন্ধ না হত, পৃথিবী যতক্ষণ।
যেখানেই থাকি আমি, নিম্নে কিংবা তোমার উপরে,
যেখানেই থাকো তুমি, আমার এ-হিয়া তোমা তরে।

মাইকেল ড্রেটন (১৫৬৩-১৬৩১) ॥ প্রেমের বিদায়

যেহেতু অনন্যোপায়, এস চুমি বিদায়লগনে,
এই শেষ, তুমি আর আমারে পাবে না অতঃপর,

আজ আমি আনন্দিত, আনন্দিত সর্বান্তঃকরণে,
এমন নিরুপদ্রবে এল সেই মুক্তির খবর।
চিরতরে মুছে ফেলো আমাদের সব অঙ্গীকার,
যদি দূর-ভবিষ্যতে দেখা হয় কভু পুনরায়,
প্রাক্তন প্রেমের স্মৃতি অণুমাত্র যেন না আবার
ভুল ক'রে ভেসে ওঠে কারও ব্যগ্র আঁখির তারায়।
অনিঃশেষ চুম্বনের উদ্যত অধরে বর্তমানে,
যখন স্পন্দন স্তব্ধ, নিরুত্তর সমস্ত আকূতি,
যখন বিশ্বাস ব'সে মাথা কোটে মরণশয়ানে,
বিপুল অজ্ঞানে ধীরে মুদে আসে ক্লান্ত চোখদুটি,
যারে ত্যাগ ক'রে গেছে সকলে, এখনও যদি তারে
নিয়ে যেতে তুমি হায় মৃত্যু হতে জীবন মাঝারে।

উইলিয়ম শেক্সপীয়র (১৫৬৪-১৬১৬) ॥ অনুপস্থিতি

তোমার কিঙ্কর হ'য়ে আমি শুধু তোমার ইচ্ছার
পরম মুহূর্তগুলি সযত্নে সাজাতে পারি বসে।
যদ্যপি তুমি না ডাকো অগৌরবে নির্জিত আমার
নিষ্কর্ম প্রহর কাটে নিরুদ্যম নিশ্চেষ্ট আলসে।
ক্ষান্তিহীন প্রতীক্ষায়— তাও অসন্তোষের প্রমাদ
ঘটে না, স্বরাজ্যে যবে ঘড়ি দেখি তোমার আশায়,
তোমার অনুপস্থিতি তিক্ততায় হয় না বিস্বাদ
একবার এ-দাসেরে যদি তুমি জানালে বিদায়।
এখন কোথায় তুমি, কী কার্যে মগ্ন, সে পরিচয়
ঈর্ষুক চিত্তেরে তাও জিজ্ঞাসার করি না সাহস,
বিষণ্ণ ভৃত্যের মত শুধু মোর চিন্তার বিষয়
তোমার সঙ্গের সুধা কারে দেয় সম্প্রতি সন্তোষ।
এমন নির্বোধ প্রেম, তোমার অভীষ্ট স্বৈরাচার,
তাও তার নিষ্কলঙ্ক পরম প্রার্থিত পুরস্কার।

শোলেম আলাইকেম ১৮৫৯-১৯১৬

হরেন ঘোষ

বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে আমরা প্রায়শঃ ইতস্তত আলোচনা করে থাকি। এবং নোবেল প্রাইজ না পেলে অনেক প্রতিভা আমাদের মনের আড়ালেই থেকে যান। কোনো পুরস্কার না পেয়েও সমগ্র বিশ্বে পরিচিত প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়। আঁদ্রে মলরো এমনি-এক ব্যতিক্রম। সম্প্রতি আর-এক জন সাহিত্যিকের কথা আমরা জেনেছি, যিনি স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট পরিচিত হলেও ভারতবর্ষে তত পরিচিত নন। ইনি ইহুদি সাহিত্যিক শোলেম আলাইকেম Sholem Aliechem।

শোলেম বেন ঝেনাকেম রাবেনোভিচ সাহিত্যিক নাম নিলেন শোলেম আলাইকেম। রাশিয়ার পোল্টাভা জেলোর ছোট শহর পিরিয়াসলেভ-এ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শোলেম জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই বাল্যকালে স্কুলে লেখা-পড়া শেখেন। ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা করেছেন, ১৭ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। সাহিত্যরচনায় পিতার কাছে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছেন। প্রথম উপন্যাস ডিফোর রবিনসন ক্রুশোর অনুকরণে রচিত। জীবনে বিভিন্ন জীবিকায় তিনি লিপ্ত হন। কখনো ব্যাঙ্কার কখনো ব্রোকার কখনো ব্যবসায়ী। ফলে জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি লঘু ভাবে সাহিত্যে পরিবেশন করেছেন। ইহুদি জীবনের বিচিত্র কাহিনী তাঁর রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং সেখানেই শেষজীবন কাটে।

সম্প্রতি য়ুনেস্কোয় মহাসমারোহে শোলেম আলাইকেমের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। ইতিমধ্যে য়ুনেস্কো গ্যয়টে শেকভ ও শিলারের জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করেছেন। দেখা যাচ্ছে, এঁদের পাশে দাঁড়াবার মর্যাদা শোলেম আলাইকেম পেয়েছেন।

ইহুদি সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বরেণ্য সাহিত্যিক শোলেম আলাইকেম। সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই তাঁর কুশলী হাতের ছাপ পড়েছে। গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটকে তিনি ইহুদি সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ

করেছেন। তিনি যে যুগে জন্মেছিলেন সে যুগে ইহুদীয় ভাষায় নামমাত্র সাহিত্য ছিল। বাইবেল ও দু-চারটি ধর্মবিষয়ক পুস্তক ছাড়া আর-কিছু পাওয়া যায় না। ইহুদি ভাষা, শিক্ষিত ইহুদিদের কাছে মুখ্যতঃ কথ্য ভাষারূপেই ব্যবহৃত হত। ইহুদীয় ভাষায় প্রসাদগুণ ছিল, সাহিত্যও হয়তো রচিত হতে পারত কিন্তু তবুও সে ভাষায় সাহিত্য রচিত হয় নি। শোলেমের সঙ্গেসঙ্গে আরো দুজন ইহুদি সাহিত্যিক ইহুদি ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা হলেন মেন্দেলে ও পিরেতস্। এঁদের মধ্যে শোলেমই সবচেয়ে প্রতিভাবান। কেননা সাহিত্যের প্রতি বিভাগেই তাঁর সার্থক পদচারণা। তিনি ব্যঙ্গ ও হাস্য রসাত্মক রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক ব্যঙ্গ রচনায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইহুদি জীবনের সঙ্গে তাঁর এই রচনার ধারা এমন ভাবে একাত্ম যে বাইরের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে তার সবটুকু রস গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সেজন্যেই প্রথম দিকে ইহুদি-সাহিত্য ছাড়া বিশ্বের অন্য সাহিত্যে শোলেম সম্পর্কে বিশেষ চেতনার সঞ্চার হয়নি। একমাত্র য়ুনেস্কোর শতবার্ষিকী পালন তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে।

শোলেম তিনটি ভাষায় একই সঙ্গে সাহিত্য রচনা করেছেন। ইহুদি হিব্রু ও রাশিয়ান। কুড়ি বছর বয়সেই তিনি সাহিত্যিক স্বীকৃতি পান। একটি বিশেষ সুরুচিসম্পন্ন পত্রিকা প্রকাশ করে ইহুদি সাহিত্যে একটি নতুন যুগ সৃষ্টি করেন। পত্রিকাটির নাম Die Yiddische Folksbibliotek. আমাদের দেশে সবুজ পত্র যেমন বাংলা গদ্যকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সহায়তা করেছিল, শোলেম-সম্পাদিত পত্রিকাও ইহুদি সাহিত্যের অগ্রগতিতে সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

দৈনন্দিন জীবনের দুঃখবেদনার মধ্যেও নির্মল হাসি ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতায় সিদ্ধ ছিলেন শোলেম। ছোট শহরের জীবনধারার সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচয় হবে তাঁর রচনা পড়লে। স্বজাতীয় নরনারীর দোষগুণ সুখদুঃখ সব-কিছুর প্রতিই তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর।

শোলেম মানবতাবাদী লেখক। ইহুদীয় সাহিত্যে নতুন যুগের মানবতার প্রথম প্রচারক তিনি। এই গুণেই তিনি ইহুদি সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও

সাধারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এই সারল্য দিয়েই তিনি ইহুদি পাঠক-সমাজকে আকৃষ্ট করে রেখেছিলেন।

আমেরিকার সাহিত্যজগতে নাট্যকার হিসেবে শোলেম যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর একাধিক নাটক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে আমেরিকায় মঞ্চস্থ হয়েছে। রুশ ভাষায় তাঁর একটি নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে। তা ছাড়াও যেখানে যেখানে ইহুদিরা বাস করেন সেখানে শোলেম নাট্যকার হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়। বর্তমানে তাঁর রচনা রাশিয়া আমেরিকা বেলজিয়াম রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডে অনূদিত হচ্ছে। রাশিয়ান ভাষায় তাঁর অনেক রচনা অনূদিত হয়েছে। মনে হয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যানুরাগীদের কাছেও অদূরভবিষ্যতে শোলেম আলইকেমের সাহিত্যের প্রচার ব্যাপকতর হবে। আশা করছি বাংলা ভাষাতেও শোলেমের রচনার অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখা যাবে।

আলাইকেমের কবিতা : অনুবাদ

দুর্গাদাস সরকার

এখানে শয়ান এক সরল য়িহুদি শান্তমনে।
জীবন-রসিক তিনি, সামান্য লেখক, মানবক।
য়িহুদীয় কাব্য তার পড়ে আজো নারীরা গোপনে,
সাধারণ লোকজন সে কাব্যের একাগ্র পাঠক।
জীবন-রসিক তিনি দেখেছেন জীবনের ত্রুটি,
একদা পৃথিবী ছিল সুস্থ ভোরে সমান সমান ;
তবুও কী বোধে যেন করেছিল আশ্চর্য ভ্রূকুটি
নিংড়ে নিয়ে সব রস দুর্ভাগা সে অবাধ্য সন্তান।
জনগণস্তুতি করত, ছিল হাততালিতে মুখর
প্রশংসিত তার কাব্য, উপস্থিত বুদ্ধি ও কৌতুক ;
তবু আড়ালেও কেউ বলেনি (যা জানেন ঈশ্বর)—
দারুণ দৈন্যের দায়ে ক্লিষ্ট কত লেখকের মুখ।

কবির নিজ স্মৃতিফলকে ক্ষোদিত হবার জন্য লিখিত

আদিজনকৃতি : সাঁওতালি কবিতা

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

বাংলাদেশে আদিজনের সংখ্যা কম নয়। এবং তাদের মধ্যে সাঁওতালরাই সব চেয়ে বেশি।

পশ্চিম-বাংলার পশ্চিম-প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরা ছড়িয়ে আছে। নবাব আমলে যে ভূখণ্ডটাকে 'জঙ্গল-মহল' বলা হত, প্রকৃতপক্ষে সেটাই হল সাঁওতালদের বহুদিনের বাসস্থান। জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করায় এরা বরাবরই খুব ওস্তাদ। তাই স্থানীয় জমিদাররা শাল-মহুয়ার ঘন অরণ্য উচ্ছেদের কাজে গত শতকে এদেরকে বহাল করে। এভাবে এরা গঙ্গাধৌত সমভূমিতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো নদীপার হয়ে সুন্দরবন অঞ্চলেও বসতি স্থাপন করতে থাকে।

কিন্তু যেখানেই থাক, সাঁওতালরা তাদের আদিজনিক সমাজব্যবস্থা বিশ্বাস সংস্কার ও মনোবৃত্তি সঙ্গে নিয়ে যায়। যেমন তারা দল বেঁধে দেশান্তরী হয়, তেমনিই তারা বাধার সামনে দাঁড়ায় জোট পাকিয়ে। এই জোট পাকানো বা সামষ্টিক ক্রিয়াকলাপ সাঁওতালদের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে।

কিন্তু আর-এক দিকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ওরা যেমন প্রবেশ করেছে মন্থরগতিতে, বাংলাদেশের বিশিষ্ট গীতল মেজাজও সাঁওতালদের মানস-জগতের অভ্যন্তরে, বলা যায় অন্তর্জীবনে, ধীরে ধীরে নিজের আসন তৈরি করে নিয়েছে।

শুধু সাঁওতালদের ক্ষেত্রেই কেনই বা বলব। বাংলাদেশের ভূমি-লগ্ন বেশির ভাগ আদিজনরাই বাঙালীর মানসসুন্দরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে। এবং কেউ কেউ সার্থক ফসলও ফলিয়েছে। কোরা কুরমি ইত্যাদি উপজাতির গানের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোনো কোনো জনগোষ্ঠী তাদের আদিজনীয় সংস্কারাদি পরিত্যাগ করে সাধারণ বাঙালী সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে ব্রাত্যজন বলে পরিগণিত হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আর্থিক বা সামাজিক চাপের জন্যই হোক, বা কৃষ্টিগত মিশ্রণের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপেই হোক, বাঙালীর

সাঁওতাল-দম্পতি : হাট থেকে ঘরের পথে

ললিতকৃতির কোনো স্পর্শই পায় নি এবং নিজেদের পুরাণগুলোও খুইয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাগদীদের নাম করা যায়। যাদের বিভিন্ন আচারানুষ্ঠানের মধ্যে পুরনো দিনের ললিতক্রিয়ার অস্পষ্ট ছাপ এখনো দেখতে পাওয়া যাবে।

কোনো কোনো ব্রাত্যজনগোষ্ঠী এখনো তাদের ললিতমনোবৃত্তি জীইয়ে রেখেছে। যেমন বাউড়ীরা। সাঁওতালদের মত বা ছোটনাগপুরের ওরাঁওদের মত বা নাগপুর-অঞ্চলের গোঁড়দের মত এদের অনেক ক্রিয়ানুষ্ঠানই গানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। বাউড়ীদের জীবনে গান একটি মূল্যবান ভূমিকা রচনা করে আছে।

যাই হোক, আদিজনের মানসলোকে বাংলাদেশের নদী মাঠ জঙ্গল পাহাড় এবং বাঙালীর সুরেলা মনোভঙ্গী যেমন ললিতগত প্রতিবিম্বন ঘটিয়েছে ব্রাত্যজনের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটাতে পারেনি। আদিজনের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় থেকেছে। যেমন ভিতর-বাংলার ওরাঁওরা, যাদের স্থানীয় বাঙালীরা জানে ঢ্যাঁওড় বা ধাঙড় ব'লে।

সাঁওতালদের কথায় আসা যাক।

অস্ট্রিক বা দক্ষিণ-ভাষা পরিবার অন্তর্গত অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা দক্ষিণ-এশীয় শাখার একটি ভাষা হল সাঁওতালি। এর সঙ্গে বাংলা ভাষার কোনো দিক দিয়েই সম্পর্ক নেই। এই ভাষাই সব অঞ্চলের সাঁওতালদের মাতৃভাষা। এমনকি বাংলাদেশে দীর্ঘকাল বাস করে এবং কৃষি-অর্থ-ব্যবস্থায় বাঙালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থেকেও, অনুমান হয়, শতকরা ষাট ভাগের মত সাঁওতাল মাত্র বাংলা ভাষা মোটামুটি আয়ত্ত করেছে। কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে বাঙালী এবং বাংলা ভাষা আশ্চর্যভাবে সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে।

অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে সাঁওতালদের সাধারণ ললিতকৃতিতে তাদের আদিজনীয় ছাপটাই প্রকট।

সাঁওতালি ভাষায় গানের জন্যে লেখা এত কবিতা আছে যে, বলতেই হবে, তাদের কাব্যগত প্রেরণা তাদের আদিজনীয় ঐতিহ্য-জাত, এবং তা বাইরে থেকে প্রাপ্ত নয়। বাঙালীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই সহস্র সহস্র এ-জাতীয় কবিতা তারা রচনা করেছে। পাদ্রী স্ক্রেফরুদ সাহেব এই ধরণের পুরনো সাঁওতালি ভাষায় লেখা অনেক কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলি অতি সুপ্রাচীন কালের হতে পারে।

সাঁওতালি কবিতার বিপুল আয়তন যে-কোনো সভ্য জাতির বিস্ময়ের কারণ হবে। কিন্তু শুধু আয়তন নয়, তার বিভিন্ন ভাষা-মাধ্যম আত্মাভিমানী যে-কোনো জাতিকে আরও বিস্মিত করবে।

সাঁওতাল কবিরা বা সেরেঞ্‌ জোঃরাওইচ্‌-রা (গানের রচয়িতা-রা) তাঁদের মাতৃভাষায় চিত্ত প্রকাশ ঘটাবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের পড়শীদের ভাষা বাংলার মাধ্যমেও কবিতা রচনা করছেন। এবং এটা এত বেশি সংখ্যায় মাঝে মাঝে হতে দেখা যায় যে, মনে হয়, বাংলা তাদের দ্বিতীয় কাব্য-ভাষা-মাধ্যম। এবং বাংলায় লেখা কোনো কোনো সাঁওতাল-কবিতা আশ্চর্য অনবদ্য।

সাঁওতাল কবিতার বাংলা ভাষা নিরীক্ষণ করলে এই সিদ্ধান্ত করতে হয যে, সাঁওতাল কবিরা যে বর্তমানেই শুধু বাংলায কবিতা লিখছেন তাই নয়, পূর্বেও লিখতেন। কেননা এর ভাষা অচলিত ও অপ্রচলিত বাংলা প্রয়োগে ও শব্দে পরিপূর্ণ। সাঁওতাল কবিদের রচিত এ ধরণের কবিতাগুলি খুব সহজেই বাংলা লৌকিক কাব্যভাণ্ডারের অন্তর্গত হতে পারে।

সাঁওতাল কবিরা আরও একটি ভাষায় কবিতা রচনা করে থাকেন। এ ভাষা ভাষানুসন্ধানীদের কৌতূহলী করে তুলবে। বাংলা ও সাঁওতালির অদ্ভুত মিশ্রণে এই ভাষা বা অপভাষা গঠিত। সাঁওতালিতে রচিত কবিতায় স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা শব্দ স্থান পায়। কখনো কখনো কবিতার অর্ধেক সাঁওতালি, বাকিটা বাংলা— এমনও দেখা যায়। আবার বাংলা শব্দে সাঁওতালি পরসর্গ জুড়ে বাংলা বাচ্যরীতি অটুট রাখবার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। খাঁটি বাংলায় রচিত সাঁওতালি কবিতা তুলনায় কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সাঁওতালির কোনো-না-কোনো ধরণের প্রভাব এগুলির মধ্যে স্থায়ী ভাবে পড়েছে। এবং এই ভাষাকে একটি বিশিষ্ট পথে চালিত করেছে। মনে হয়, এই ভাষাকে অপভাষা বা Jargon আখ্যা দেওয়া চলে না। এ হল সাঁওতালদের কবিহৃদয়ের একটি খুব স্বাভাবিক ভাষা-মাধ্যম। অনেকটা আমাদের পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলির সঙ্গে কিম্বা 'গাথা' বা 'বৌদ্ধ সংস্কৃতে'র সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে।

বাংলায় সাঁওতালিতে বা মিশ্রভাষায় রচিত সাঁওতালি কবিতায় শাল মহুয়া পিয়াল হিজেল কোপাই অজয় দামোদর কিম্বা বন পাহাড় অড়হরক্ষেত

ইত্যাদির চিত্রকল্প স্বাভাবিক ভাবেই স্থান পেয়েছে। কাব্যবক্তব্য হিসেবে একটু তির্যক জীবনজিজ্ঞাসা বারবার ব্যক্ত হয়েছে। আদিজনদের মধ্যে যারা আর্য সংস্কৃতিকে মুক্ত মনে গ্রহণ করেছে, সাঁওতালরা তাদের অন্যতম। ঐ সঙ্গে আদিজনীয় সমাজবিন্যাস ও অন্যান্য সংস্কার অব্যাহত রয়েছে সাঁওতালদের মধ্যে। ফলটা হয়েছে দ্বিবিধ। একদিকে আদিম মনোবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত উপকরণগুলিকে তারা যেমন অবহেলা করেনি, অন্যদিকে নূতন দিনের পরিপার্শ্বকে তারা গ্রহণ করেছে আপনার বলে। জঙ্গল ছেড়ে যখন তারা রুক্ষ ডাঙায় পদার্পণ করেছে তখনই শুকনো ঝুরঝুরে বালি পূর্বপুরুষের মৃত আত্মার মত তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। নদী-কাঁদরের ভিজে বালির চরে গর্ত খুঁড়ে জল পান করতে করতে বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে তারা ভেবেছে—

চোখের কোণে কালি
নাকের দু পাশে দুটো ভাঁজ
ভাঁজ নয় তো
দু দুটো সাপ
গিলে খাচ্ছে মুখটাকে
হায় হায়
ড়হড় ফুলের থেকেও সুন্দর এই মুখটাকে।

কিছু শরৎকালীন গান ছাড়া বেশির ভাগ সাঁওতাল গানের কথাংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আকারে ছোট এসব কবিতার বক্তব্যও তাই হ্রস্ব হতে বাধ্য। চীনে কবিতায় যেমন বিশিষ্ট মনোভঙ্গীজাত স্বল্পকালীন আবেগ অনবদ্য সরলতা হার্দ সাবলীলতা ও নির্জট বাঁধুনির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়, প্রায়শই একটি দীর্ঘ সংযুক্ত বাক্যে বা দু-চারটি মাত্র ছোট বাক্যে সম্পূর্ণ হয়, সাঁওতাল কবিতাতেও তাই। তবে চীনে কবিতা যেমন চিত্রপ্রধান, এগুলি তা নয়। চীনে কবিতায় ফ্রেমে-আঁটা ছবির মত ভাবনা অনেক সময় আটকে যায়। বলা যায়, চীনে কবিতা স্থির হ্রদের মত যেন, পাঠকচিত্তকে যা পরিম্লান করে রাখে তার নিস্তরল সৌন্দর্য ও নাতিহ্রস্ব প্রসার দিয়ে। অন্যদিকে সাঁওতালি কবিতা গীতি-প্রধান। ছবিগুলি এখানে ঢেউয়ে-নাচা নৌকোর

মত দোল খেতে খেতে এক সময় দূরদিগন্তরেখাকে অতিক্রম করে যায়। পাঠক তখন শুধু অভিভূত হবার সার্থক সুযোগ পায়, বিচার করবার অবকাশ পায় না।

একই নদীর নাম, ফুল বা গাছ বা পাহাড়ের চিত্রকল্প বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সাঁওতালি কবিতায়। তবু বলব, বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই। সংস্কারজাত উল্লেখের পুনরাবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে মনোগত ভাবনার এত প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায় যে নতুন নতুন সাঁওতালি কবিতা রসপিপাসুকে পরিতৃপ্ত করবেই। শুধু তাই নয়, একই কবিতা বারবার যখন পড়তে ইচ্ছে করে, এবং পড়েও চিত্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, তখন বলতেই হয় এ কবিতা শুধু ভালো নয়, তা উৎকৃষ্ট, তা সার্থক। এবং এ জাতের রচনা সাঁওতালদের ভাণ্ডারে অপ্রতুল নয়—

উড়ুনি বনে মুনসি
সোনার বাঁশি কুড়িয়ে পেলুম।
সেই বাঁশির ভিতরে
চিনি ছিল
সেই চিনি খেয়ে রে
মনে রইলো॥

এ কবিতা যে-কোনো সাহিত্যের সার্থক সংযোজন।

কয়েকটি সংগৃহীত সাঁওতালি গান

১

হড়মো হোপন মই লেই লেকা।
ডাণ্ডা হোপন মই চুমুক লেকা।
নানদা হোপন মই তোকয় বানালেন
আইও কেরিগল বাবা বদি
চাঁহুগি জিব দান এমাডিঁয়ে।

॥ অনুবাদ ॥

তার শরীর এত নরম যেন ঢ'লে পড়বে,
আর কোমর চাবুকের মত সরু।
'কে তোমাকে গড়েছে?'
'মা বাবা আমাকে গড়েছে,
আর ঈশ্বর আমার প্রাণ দিয়েছেন।'

হু বিহেই দেলা বিহেই
উড়ুনি বন বিহেই কুটুম টেণ্ডি
ওড়া গাবন বিহেই দুয়োরাব
এ তুম আবন বিহেই শহর বাজার।

॥ অনুবাদ ॥

এসো বিহাই
উড়ুনি বন কেটেকুটে সাফ করব।
ঘর করব, দোর করব,
আর নাম দেব তার শহর বাজার॥

[দক্ষিণ-পশ্চিম বীরভূম থেকে সংগৃহীত। এদের ভাষা উত্তর-সাঁওতালি।]

ছাড়ি দেহ মাঁদারিয়ে
ছাড়ি দেহ গয়নাহা
গোহালিনি গোবর সমে সুকি গেল্
গাড়সাড়ি গেইলে সুকি গেল্॥

[গানটি দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমে সংগৃহীত। ভাষার দিক থেকে এর বাক্য-রীতি বাংলা, এবং প্রত্যেকটি বাক্যেই একটি-না-একটি সাঁওতালি শব্দ বা সাঁওতালি পরসর্গযুক্ত বাংলা শব্দ বাংলা শব্দের সাঁওতাল অনুসারী রূপান্তর প্রাপ্তব্য।

ম্যাঁদারিয়ে = মাদলিয়া ; গয়নাহ্ = নর্তক ; গোহালিনি < গোহাল + রিনি = গোহালের ; স্থকি = শুকাইয়া, শুকিয়ে ; গেল্ = গেলো ; গাড়সাড়ি = জলের কলসী।]

॥ চড়কের গান ॥

সরগ হতে জল নাই পড়ে রে
পৃথিবীতে চাষ নাই চলে।
চাষার বেটা কোদাল নিয়ে দাঁড়ায়
পৃথিবীতে চাষ নাই চলে ॥

[গানটি মধ্য-বীরভূম থেকে সংগৃহীত।]

৫

তুমি যাইছে কুলি কুলি,
আমি যাইছে বাড়ি বাড়ি।
লোকে বলে পীরিতি বা আছে গো।
আমি বড় সরমে মুরি।
চি জ্বালা মিছে গো
আমি বড় সরমে মুরি ॥

[দুমকা-অঞ্চলের গান। কুলি কুলি = রাস্তায় রাস্তায় ; মুরি = মরি ; চি = চির।]

৬

ওপরে মেঘ ডাকে,
জোড়া লুদি বান আসে,
চোখের জল আসে
মনে মনে ॥

[বোলপুর-অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। লুদি = নদী, (এখানে) নদীতে।]

জীবনানন্দের কবিতায় বিকাশের ধারা

তন্ময় বসু

যখন সন্ধ্যা নামে নিচু জমিতে, মাঠে-ঝোপঝাড়ে অন্ধকার জমাট বাঁধে, উঁচুউঁচু গাছগুলোয় তখনো সূর্যের লাল আভা। তারপর রাত্রি জমে গাঢ় হয়, তখন অন্য-এক দৃশ্যপট। অন্ধকারে উঁচু গাছগুলোই পাথুরে কালো স্তূপের মত দাঁড়িয়ে আছে মনে হয় ; আর মাঠে-ঝোপে তখন আবছা তরল অন্ধকার।

প্রকৃতির এই দৃশ্যান্তরের মত কবি-প্রতিভার বর্ণান্তর ঘটতে দেখা যায় কখনো কখনো। প্রথম অবস্থায় যে বস্তুগুলো উঁচু হয়ে চোখে পড়ে তাতে হয়তো অস্তোন্মুখ অন্য প্রতিভার আভা। তখন নূতন কবির ব্যক্তিত্ব বুঝতে হলে দেখতে হয় ছোটখাটো খুঁটিনাটি, খুঁজতে হয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে। তারপর সেই স্বাতন্ত্র্য যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন প্রধান বস্তুগুলিতেই সেই প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' থেকে শুধু কবিতাগুলির নাম পড়ে গেলেই দেখা যাবে, বিষয়নির্বাচনে সে যুগের সাধারণ কবি-চেতনার কি নিদারুণ আনুগত্য ছিল সেখানে। দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ, হিন্দুমুসলমান, আমি-কবি, আলেয়া, ডাহুকী, পিরামিড, ইত্যাদি সাময়িক ও বিষয়মুখ্য পদ্য— যা সে যুগের এমনকি বর্তমানেও কবিতার সবচেয়ে প্রবল ধারা—তাই লেখা হয়েছিল। সে যুগে জীবনানন্দের কবিপ্রাণের বিশিষ্টতা বিষয়নির্বাচনে অথবা প্রয়োগদক্ষতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা লুকিয়ে আছে কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা নিষণ্ণ-বেদনা অথবা উপমা-নির্বাচনের নিপুণ বিশেষত্বে। কিন্তু এইসব সাময়িক আবেদনের কবিতা যে আদৌ কবিতা নয়, অথবা অন্য কবির অনুচারণায় যে সত্যকারের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, এ কথা অনুভব করা মাত্রই এ জাতের লেখা জীবনানন্দের রচনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এগুলি সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ ছিল না— তার প্রমাণ এমন কবিতা তিনি আর কখনোই লেখেন নি। যে-কোনো সৎ-কবিই জানেন এগুলির সৃষ্টিপদ্ধতি যান্ত্রিক, প্রকরণ রীতি-নিয়ন্ত্রিত এবং প্রেরণা অনৈসর্গিক। 'ঝরাপালক' বহুদিন

নিঃশেষিত হলেও পুনঃপ্রকাশ না হবার হেতুও অবশ্যই এখানে। এটি প্রকাশ না করে জীবনানন্দ পরিণত কাব্যবোধের প্রমাণ রেখেছেন।

তাই হঠাৎ দেখলে 'ঝরাপালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মধ্যে যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান আছে তাকে ক্রমবিকাশ ভাবা কঠিন। এই ব্যবধানের উপর আমরা জোর দিতে চাই, কারণ এই অধ্যায়েই তাঁর জীবনের জটিলতম গ্রন্থি। হান্স অ্যাণ্ডারসনের গল্পের নোংরা পাতিহাঁস হঠাৎ একদিন যেমন রাজহাঁস হয়ে উঠেছিল তেমনি রূপকথার গল্প যেন একটি। ঝরাপালকের কবি আত্মচারী উচ্ছ্বাসী কিশোর পদ্যকার। নামী কবিদের অনুচিন্তাই যাঁর অভিজ্ঞতার পরিবর্ত, কি মায়ামণির স্পর্শে সেই আত্মসর্বস্ব আত্মমুখ কবি এক নূতন প্রত্যয়ে জেগে উঠলেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র চেয়েও বিস্ময়কর সেই আত্ম-অবিষ্কারের ঘোষণা—

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বয়ে আনি ;
একদিন শুনেছ যে-স্বর—
ফুরায়েছে, পুরানো তা—কোনো এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তার পরে আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ— আর সব হারানো-পুরোনো।

চিরায়ত উৎসবের কথা নয়, ব্যর্থতার গান নয় ; এক ব্যথার জাগরণের কাহিনী এই কাব্য। সেই ব্যথা প্রেম। 'ঝরাপালকে'র নায়ক কবির অহং —'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি নয়, পৃথিবী নয়, প্রকৃতি নয়, প্রিয়া নয়—প্রেমেরই

মুখ্য ভূমিকা। আর এই প্রেমের উচ্চারণ যে ভাষায় তা আগের মত প্রচলিত কবিতার ভাষা নয়, কবির মুখের ভাষা নয়, কবির অনুভবের ভাষা। মন্ত্রের পবিত্রতা সেই ভাষায়। মনে হয়, কোনো গভীর ব্যথাকে রক্তের মধ্যে আস্বাদ করতে হয়েছে বলেই শিল্পীপ্রাণের এই জাগরণ। অথচ সেই ব্যথাই ক্ষতের মত তাঁর মনে জেগে থেকে কাজ করে গেছে। সেই আত্মচারীর উচ্ছ্বাসময় দৃঢ়তা আর নেই—এক ক্রন্দন থেকে থেকে বাজে। কবিতায় প্রেমেরই মুখ্য আসন, অথচ পরিপূর্ণ আবেগশায়ী হতে ভয়। এক জায়গায় পৌঁছে কবি আর এগোতে চান না। বিচিত্র কৌশলে কবিতা শেষ করে দেন। নানা কারুকর্মে, ইন্দ্রিয়বৈভব দিয়ে এক রূপজগৎ সৃষ্টি করে আমাদের চমকে দেবার খেলা খেলেন।

শেলী-কীট্‌স্‌-ব্রাউনিং যদি কবিতায় 'প্যাশান'কে এমন কৌশলে পরিহার করতেন ইংরেজ পাঠক তাঁদের ক্ষমা করত না। জীবনানন্দের 'ঘাস' বা 'হরিণে'র মত কবিতা যেখানে প্রেমের প্রসঙ্গই নেই, 'পাখিরা' অথবা 'পরস্পরে'র মত কবিতা যেখানে প্রতীকী ভাবনাই মুখ্য, অথবা 'বনলতা সেন' 'শঙ্খমালা'র মত কবিতা যেখানে আবেগকে আড়াল করে রয়েছে 'মিস্টিক'-দীপ্তি, সেখানে কবিতার সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু যেখানে 'প্যাশন'ই মুখ্য হওয়া দরকার সেখানে তিনি নির্মমভাবে অদক্ষিণ। 'পিপাসার গানে'র দেহ-পিপাসাও সেই অভাব মেটাতে পারে না।

মহৎ কবিতা মাত্রেই একটা উত্তরণ আছে। প্রতিটি সার্থক কবিতা আমাদের আত্মাকে অনধিগত এক চেতনাক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়। কবির আবেগ-গভীরতা অথবা মনন-দীপ্তি থেকে এই চেতনাক্ষেত্রের জন্ম। কিন্তু জীবনানন্দ স্বভাবত মননশালী কবি নন, আবেগশায়ী কবি। তাই তাঁর যাত্রা আরো নিশিত দূরত্যয় পথে। মননশীল কবি নিজের জীবনের উপলব্ধিকে তত্ত্বের আলোতে নূতন রূপে দেখতে অভ্যস্ত। অভিজ্ঞতা মননে বিস্রুত হয়ে নূতন নূতন চিন্তার সংস্রবে এলে কবিতাসৃষ্টি প্রচুর ও অনায়াস হতে পারে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল। কিন্তু আন্‌কোরা আবেগ-অভিজ্ঞতা যাঁর উপকরণ তাঁর সৃষ্ট কবিতা অনুভূতিতে গভীর কিন্তু সংখ্যায় পর্যাপ্ত নয়। যিনি আবেগশায়ী, দুর্মর বন্ধনের আনুগত্য থেকে তাঁর মুক্তি নেই—আত্মার সততার বন্ধন। ধরা যাক্ প্রেমের কবিতা, একই প্রেম মননধর্মী কবির

দার্শনিক চিন্তার আলোকে অসংখ্য কবিতা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু আবেগবান কবি নিজের অনুভূতিকে একবার মাত্রই স্ফুট রূপ দিতে পারেন—নয়তো তা পুনরুক্তি-দুষ্ট হবেই। প্রেমের এক চরম আবেগ-অভিজ্ঞতার লগ্ন হয়তো কোনো কোনো মানুষের জীবনে আসে, তখন সেই বজ্রাহত দগ্ধশেষ আত্মার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই সত্য-মৃত্যুর পরে প্রেমের অনুভূতি আবার আস্বাদ করা যায় না। যদিওবা সেই অসম্ভব সম্ভব হয়— স্মৃতির আকারে ব্যথার আকারে যদিবা সেই আবেগ পুনর্জাত হয়— তবে তার স্বাদ ভিন্ন রকমের, আর তা নিয়েও বহুবার কবিতাসৃষ্টি দুঃসাধ্য।

আবেগের এমন উত্তরণময় নিটোল বলযিত কবিতাও জীবনানন্দের খুব বেশি নেই। এক দিকে যেমন তিনি মননের সেই চেতনালোক সৃষ্টি করতে পারেন নি যেখানে প্রেমিক প্রিয়ার অন্তরের স্পর্শ পেয়েও বলে—

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেযে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়॥

—'শ্যামা' : রবীন্দ্রনাথ

অন্যদিকে তেমনই আবেগের বিহ্বল আবেশ -রচনাও তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি যখন কণ্ঠলগ্না প্রিয়াকে পুরুষ বলে—

তবে বলবো না কথা, তবে আমি চুপ করে থাকি
তোর অগ্নিচুম্বনে এ ঠোঁট দুটি জুড়ে,
তোর দুটি চোখে মোর শূন্যদৃষ্টি রাখি—
যে চোখ বিধ্বস্ত আবেগের, অন্বেষার—
তবু বোবা কামনারা ঘুরে ঘুরে ভাসে
উড়ন্ত মেঘের মত লাভাস্রাবী আগ্নেয়গিরির চারপাশে।

—ইংরেজি কবিতা থেকে

জীবনানন্দ এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কবি হয়েও কবিতায় এমন প্রগাঢ় উন্মাদনা সঞ্চার করেন নি। দু-একটি খণ্ডিত উক্তি-প্রত্যুক্তি, স্মৃতি, আক্ষেপ, ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি আবেগগর্ভ পংক্তি রয়েছে, কিন্তু পূর্ণ পরিণত ভাববলয় নেই ;

পরিণতিতে কোথাও পৌঁছে দেয় না। ‘দুজন’ ‘অঘ্রাণ-প্রান্তরে’ অথবা ‘জার্নাল ১৩৪৬’-এর মত কবিতাতেও সেই ব্যর্থতা, সেই স্নায়ুর ব্যথার মত বাজে। মনে হয়, ব্যক্তিগত জীবনের কোনো রূঢ় আঘাত, কোনো স্মৃতির তীক্ষ্ণ জ্বালা তাঁকে সম্পূর্ণ আবেগাশ্রয়ী হতে বাধা দিয়েছে। তাঁর সেই প্রথমযৌবনের অপরিজ্ঞাত ইতিহাসের উন্মোচন এখন প্রায় অসম্ভবই। তাই ‘প্যাশান’কে আশ্রয় ক’রে স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে যেতে তাঁর বাধে। বরং প্রেমের প্রসঙ্গে কুড়ি বছরের পরে চলে গিয়েই তাঁর স্বস্তি, যেখানে—

ব্যস্ততা নেই কো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে, মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল !

—কুড়ি বছর পরে

‘চোখের পাতার মত নেমে কোথায় চুপি চুপি চিলের ডানা থামে’ ‘সোনালি সোনালি চিল শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে’— এইসব অমূল্য ইন্দ্রিয়বৈভবের কাছ দিয়ে কবিতার স্বাভাবিক পরিধি থেকে দূরে এনে তিনি আমাদের ভুলিয়ে রাখতে চান। পারেনও।

তবু এই পারাটাই সব নয়। এমন ইন্দ্রিয়ময়তার পরিচয় দিয়েও তিনি যদি কবিধর্মে মহৎ হতেন, সেইটেই পরম শ্লাঘনীয় হত। যা হয়নি তা নিয়ে ক্ষোভ নেই। বাংলা সাহিত্যে এক নূতন বর-রীতির জনয়িতা তিনি রইলেনই ; —ক্ষোভ সেই অনন্যযাত্রী পথে পরাসিদ্ধি তাঁরও অনায়ত্ত রইল।

২

প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’তে কবি আবেগে গভীর ও প্রকরণে বিশুদ্ধ। সেই গভীরতার সঙ্গে বরাবরই বিষয়ের বৈচিত্র্য ও পটভূমির ব্যাপ্তির সাধনা ছিল। সচেতন শিল্পী মাত্রেরই পুনরাবৃত্তিতে স্পৃহা নেই। তাই অবিরত সঞ্চরণের নূতন নূতন ক্ষেত্র এষণা। ‘রূপসী বাংলা’র পটপ্রেক্ষিত ও ভাবপ্রকরণ ভিন্নতর। তবু এই প্রকৃতিনিষ্ঠাও যখন একঘেয়ে লাগল তাও বাদ চলে গেল। ‘মহাপৃথিবী’তে আবার ব্যাপ্তির সাধনা। এবার বস্তুপৃথিবী ও আধুনিক জীবনকে প্রদক্ষিণ করেছেন কবি। অত্যন্ত

রূঢ় এই অভিজ্ঞতা। তাই মৃত্যুকামনাও দেখা দিয়েছে সাথে সাথে। 'রূপসী বাংলা'তেও মৃত্যুর কথা ছিল। সেখানে জীবন যেমন সহজ স্বচ্ছন্দ, মৃত্যুও তেমনি সুন্দর, শোভাময়; স্বাভাবিক অবসানের ব্যথামাখা জীবনের নিটোল পরিণাম। অথচ 'মহাপৃথিবী'তে জীবন তিক্ত, ক্লান্তিকর, গ্লানিময়, অসহভারাতুর। কবির মননে তাই মৃত্যুর মধ্যে মুক্তিস্পৃহার তামসী বিলাস। মৃত্যু এখানেও আকাঙ্ক্ষিত, কারণ তা জীবনের দিকে পিঠ ফেরানো পলায়নের পথ।

'মহাপৃথিবী'তে কবি সনাক্ত করেছেন মানুষের বিকৃত জীবন ও বুদ্ধিকে। যে ভয়ানক নির্জন মুখের রূপ মানুষের ভোগের জন্য নয়, উপভোগের জন্য, সৃষ্ট হয়েছিল সেই—

রূপ কেন নির্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত-ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল:
'ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়?'

—আদিম দেবতারা

মানুষের রক্তে এই মাছির মত কামনা; রূপকে স্থূল হাতে এমনি মাংসের মত ব্যবহার ক'রে ক'রে, স্বপ্নের সম্পদকে কামনার কলুষতা মাখিয়ে মাখিয়ে, বারবার মাখিয়ে শূয়ারের মাংসের মত ঘৃণ্য অস্পৃশ্য অশুচি ক'রে তোলাই মানুষের ধর্ম।

পৃথিবীর এই কদর্য বামন মানুষগুলোর মধ্যে এই ক্লেদাকীর্ণ যন্ত্রের বিষ স্পর্শমাখা শহরের গর্ভে বাস করেও কেউ কেউ অনুভব করে মহাকাশে সূর্য উঠছে, পঙ্কিল সভ্যতাকে ঘিরে নিজের অখণ্ড সজীবতা নিয়ে নিত্য আবর্তিত হচ্ছে মহাপ্রকৃতি। সঠিক মূঢ়তায় কবি-মন শ্লেষে বিদ্রূপে মর্মভেদী হয়ে উঠলেও হৃদয়ের গভীরে সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পাওয়া যায়।

'মহাপৃথিবী'র সঙ্গে 'বনলতা সেন' বইটির অধিকাংশ কবিতার কালগত কোনো ভেদ নেই হয়তো। কিন্তু মনোভঙ্গির দিক থেকে প্রভেদ দুস্তর। মনে হয়, 'মহাপৃথিবী'র যে কবিতাগুলি 'বনলতা সেন' গ্রন্থে গ্রথিত হয়নি

তার কিছু কিছু প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা 'রূপসী বাংলা'র নিকটবর্তী সময়ের, আর বাকি কবিতাগুলি 'সাতটি তারার তিমিরে'র আমলের কাছাকাছি। 'বনলতা সেনে'র কবিতাগুলি সঙ্কলিত হয়েছিল প্রেম প্রকৃতি এবং ইতিহাস-চেতনার দিকে লক্ষ্য রেখে, তাই এই গ্রন্থের আবেদন ভিন্নতর।

'বনলতা সেন' কবিতাগুচ্ছে যে শিল্পশ্রী উন্মেষিত হযেছে তার মধ্যে কবি-চেতনার সক্রিয়তা ছিল। এখানে এক নূতন ইন্দ্রিয়লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যা ইতিপূর্বে বা পরে তাঁর লেখায বা অন্য কারো লেখায় এত সুস্পষ্ট আকারে ধরা পড়েনি। কবি নিজের চেতনাকে সংহত করে, মননকে দমন ক'রে কেবল ইন্দ্রিযগ্রামের মধ্য দিযে এক রূপরাজ্য আবিষ্কার করে নিয়েছেন, তার মধ্যেই তন্ময় হযে রযেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বিহ্বলতা, 'মহাপৃথিবী'র তিক্ততা, 'সাতটি তারার তিমিরে'র প্রাখর্য এবং অন্তিম পর্যায়ের সুদৃঢ় মনন ও মরমীচেতনা— সব-কিছু মিলিয়ে জীবনানন্দের যে বলিষ্ঠ বিষণ্ণ কবিসত্তা, তাকে আচ্ছন্ন করে এক সুরেলা মিষ্টি মেজাজ প্রকাশ পেয়েছে এখানে। কারণ, কবি কিছুই বুদ্ধি দিযে বিশ্লেষণ করছেন না, মন দিয়ে লক্ষ্য করছেন না, গভীর মমতার সঙ্গে শরীর দিযে ছুঁযে চলেছেন সব-কিছু।

'বনলতা সেনে'র পরেই 'সাতটি তারার তিমির'। এক জায়গায় সিদ্ধির পরে অন্য জায়গায় সাধনা। জনপ্রিয়তার মোহ যাকে পায় সে আপন সকল সৃষ্টির অনুবর্তন করতে বাধ্য। কিন্তু বাংলা কবিতার সেই শোচনীয় অবক্ষয়ের যুগে 'বনলতা সেনে'র আশ্চর্য অভ্যর্থনার পরেও চিন্তার জটিলতার মধ্যে, সুররিযালিস্ট কবিতার দুর্বোধ রহস্যগূঢ়তার মধ্যে নূতন অনিশ্চিত নিরীক্ষার পথে যে-কবি অগ্রসর হতে পারেন, তিনি সাধারণ নন।

অথবা, এই তাঁর নিয়তির নির্দেশ। ইতিহাস সেই নিয়তি। যুদ্ধের সেই প্রচণ্ড বিভীষিকার মধ্যে মানুষের আত্মা যখন ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত, তখন শৌখান ইন্দ্রিয়ময়তার মধ্যে কাব্যবিলাস তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। চেতনা তখন প্রবল উত্তেজিত, বেদনা তখন দিগন্তপ্রসারী—আবার সেই বেদনার মধ্যে অন্তরে এক দুর্নিরীক্ষ প্রত্যয় মাথা তুলে উঠছে, কোনো সৎকবির পক্ষে তখন কি আর পুরোনো পথে হাঁটা সম্ভব? সেই দুর্বোধ আগন্তুক দুর্বার আবেগে কবিকে নূতন পথে চালিয়ে নেবেই।

'মহাপৃথিবী'র বিক্ষিপ্ত বস্তুপৃথিবী ও জীবন-জটিলতার মধ্যে মননের যে

কবিতা ফেলে রেখে এসেছিলেন এখানে কবি আবার তা তুলে নিলেন। প্রেতিটি বড় কবির জটিল মননের স্তরে স্তরে চিন্তার এমনি পুনরাবর্তন দেখা যায়। কিন্তু জীবনানন্দের ক্ষেত্রে পুরানো ভাবনার সঙ্গে নূতন উপলব্ধি মিশেছে, তাই নূতন প্রকাশপদ্ধতি, নূতন প্রতীক, নূতন সঙ্কেত দেখা দিয়েছে। বহির্বিশ্বে তখন যুদ্ধের নান্দীরোল, সর্বব্যাপী সঙ্কট, আত্মঘাতী বুদ্ধি, রুচিহীন বিলাস আর প্রকারহীন নৈরাশ্য। রাজনীতিবিদ্‌রা নানা ইজমের তাড়নায় স্বার্থের মোহে বিভ্রান্ত, চিন্তাশীলেরা বিমূঢ়, সাধারণেরা সর্বস্বান্ত—তখন জীবনানন্দ প্রজ্ঞার মাধ্যমে জীবনের জটিল দিকগুলোর পরিপূর্ণ ব্যাপ্তি নিয়ে জিজ্ঞাসামুখর কবিতা লিখছেন সমাধানে পৌঁছানোর প্রত্যাশায়। জীবনের যে কোনো দিক যে কোনো সমস্যাকে যে কবিতায় যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে—এবং ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব কবির আছে সে সম্পর্কে অন্তত জীবনানন্দের কোনো সংশয় ছিল না। সে কথা বিবৃত হয়েছে তাঁর 'কবিতার কথা' বইটিতে। কিন্তু এসব কবিতা সিদ্ধ হয়েছে কি? দূর যুগান্তরে এইসব সমস্যাকেন্দ্রী কবিতা আপন রসমূল্যে কি বেঁচে থাকবে? এ তর্ক উঠুক। কবি অন্তত জেনেছিলেন এ পথে আসা, এই দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর ব্যর্থ হয়নি। এই বিষয়ে কবিতার বাইরে নয় একেবারে, এখানেও কবির পরাসিদ্ধি সম্ভব।

এ ছাড়াও 'স্যুররিয়ালিস্ট' কবিতা— অবচেতনার সেই আশ্চর্য সঙ্কেতগূঢ় উদ্ঘাটন— এক নূতন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে বাংলা কবিতাকে, তারও উন্মেষ 'সাতটি তারার তিমিরে'। সেই ঐতিহ্য বহন করার মত উত্তরসূরী আসেনি আজও। জীবনানন্দ সবচেয়ে অনুকৃত কবি, তবু এসব কবিতার অনুসারক নেই কেন?

—

কবিতার নবজন্ম

ভুজঙ্গভূষণ অধিকারী

বছর পাঁচেক আগেকার কথা। তিরিশের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকজন তরুণ কবি সম্পর্কে বললেন, এরা সব জীবনানন্দ।

অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় জীবনানন্দের কাব্যিক চলমানতা তখন কিছুদিন আগে চিরস্তব্ধ হয়ে গেছে। একজন প্রতিষ্ঠিত কবির মুখে এই অশ্রদ্ধেয় ভাষণে আধুনিক কবিতার শ্রদ্ধাশীল পাঠক হিসেবে ব্যথিত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝেছি, সেই অপ্রিয় ভাষণ অপভাষণ নয়—সত্যের বেদনা রয়েছে তাতে। জীবনানন্দের নিঃসঙ্গ নির্জনতার রোম্যান্টিক আবহ বহু তরুণ কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁদের কবিতায় জীবনানন্দের আত্মসংস্থ নিঃসঙ্গ জীবনক্লান্ত কবিমানসের বর্ণলিপি মুদ্রিত না থাকলেও নির্জন একাকীত্ব বোধ, বোধ করি, দুর্লভ নয়। সেই সঙ্গে একটি ব্যাধিত বিষণ্ণতার সুর বিস্তারও। অবশ্য মুগ্ধতার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে তরুণ কবিদের সেই কয়েকজন ইদানীংকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু প্রাগাধুনিক কালের কবিদের তুলনায় প্রতিষ্ঠার বিস্তৃততর পরিধি থেকে তাঁদের জগৎ সংকুচিত হয়ে একেকটি ক্ষুদ্র বৃত্তে সীমায়িত হয়েছে। সর্বগ্রাসী পরিপার্শ্বের হাত থেকে কবির স্বাধিকার রক্ষা করবার জন্যে এই ক্ষুদ্র গুহবাস স্বীকার না করে উপায় ছিল না। বিগত শতাব্দীতেও এই নিঃসঙ্গ নির্জনতার বেদনার স্পর্শ আমরা পেয়েছি ম্যাথু অর্নল্ডে—

> We mortal millions live alone.
>
> —Isolation

এবং তারও আগে কোলরিজের কণ্ঠে। বাংলা সাহিত্যে চর্যাগীতিকা-গুলিতেও এই বেদনার প্রকাশ উজ্জ্বল বর্ণ—

> টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।

গুহ্য সাধনার রহস্যাস্তীর্ণ জগতের নাগরিক চর্যাগীতিকারগণও সমগোষ্ঠীর বৃত্তায়তনের মধ্যে স্ব স্ব সাধনালব্ধ অনুভবগুলিকে স্থাপিত করে পরোক্ষে এক

দুর্ভেদ্য নির্জনতার জালে বাঁধা পড়েছিলেন। তাঁরাও ভিতর-দুয়ার খুলে রেখে কপাট লাগিয়েছিলেন বাহিরের দুয়ারে।

আসল কথা, কবির সঙ্গে পাঠক এসে হাত মিলালে তবেই রসের ভিয়ান উপচিয়ে পড়ে। কবি আর পাঠক দুই স্বতন্ত্র পৃথিবীর নাগরিক। কিন্তু উভয়কেই একই রসের সঙ্গমে আসতে হবে। একের বেদনা আরিস্টটলের 'ক্যাথারসিস্' প্রক্রিয়ায় অথবা এলিয়টের 'process of depersonalization' -এর সাহায্যে অন্যের বেদনায় রূপায়িত হবে। যিনি 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী', তিনিই প্রকৃত পাঠক। কিন্তু কিছুকাল হল কবি আর পাঠকের মধ্যে এক দুঃখজনক বন্ধন-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। যেন জাহাজ ডুবির পর দুজনেই ছিটকে পড়েছে দুই নির্জন দ্বীপে। রসের ভিয়ান তাই জমছে না।

কবিতার জন্মলগ্নের অনুসন্ধানে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক মন প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাড়ি দিয়েছে। গান কবিতার পূর্বজ। এবং প্রাগৈতিহাসিক যুথচারী মানবসমাজের মানসিক প্রক্রিয়ায় গানের জন্ম। দিনান্তিক আনন্দ-উল্লাসের অন্যতম উপকরণ ছিল যৌথ নৃত্য-গীত। বাদ্যবাজনাও তার আনুষঙ্গিক হত। যৌথ বিবাহ ইত্যাদি নানা সামাজিক প্রক্রিয়ার মত তৎকালীন গানও ছিল যৌথ-সৃষ্টি। বর্তমান আদিম কৌম সমাজের নৃত্য-গীতের বৈশিষ্ট্য এই সিদ্ধান্তের অনুগামী। আবার যুথচারী হলেও প্রতিটি মানুষের মানসিক সংগঠন তো ভিন্ন। ব্যক্তি বিশেষের রচিত বিশেষ কোনো গান এক সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রচনাগত উৎকর্ষ থেকেই সামাজিক প্রতিবেশে কবির সৃষ্টি এবং অনন্যনির্ভরতা থেকে তাঁর শ্রদ্ধেয় আসনে প্রতিষ্ঠা। ধীরে ধীরে কবি স্থাপিত হয়েছেন যাদুকর পর্যায়ে, তারও পরে যাজক-পুরোহিতের পদে। দুর্বোধ্য যাদুমন্ত্র এবং দেবারাধনার যাজন মন্ত্রে সমাজিক মানুষের সম্মোহন এবং সভয় আত্মসমর্পণ। কখনো বা যাদুর বশীকরণ, কোনো এক সময়ে আবার প্রকৃতির সান্নিধ্যে এক গভীর উপলব্ধির ধ্বনিময় বিস্তার।

"এমন এক সময় ছিল, যখন পুরুতদিরি ঝাড়ফুঁক থেকে শুরু করে কাব্যচর্চা পর্যন্ত সব কিছুই ছিল বিশেষ এক শ্রেণীর অধিকার ভুক্ত। আবার পাশ্চাত্যের কোনো গণ্ডগ্রামে,—কুয়োতলার জল-ভরনি মেয়ের গুনগুনানি শুনেই জনৈক সমাজতাত্ত্বিক তার মধ্যে যাবতীয় কলাশাস্ত্রের উৎস আবিষ্কার

করেছেন। তার মধ্যে মানে, জৈবিক এবং জীবিকার পরিশ্রমের মধ্যে। আমরা এতদূর উৎসাহিত না হয়েও অনুভব করতে পারি যে, প্রাক্কালে সাহিত্যকর্ম ছিল বহুলাংশেই একটি সম্মিলিত সামাজিক কর্ম— সমস্ত দেশের আত্মার (খেত খামারের, নদীর, ভূত ছাড়ানো, শস্যের উৎসবের জন্মমৃত্যুর রহস্যের) প্রমূর্ত প্রকাশ হত মস্ত মস্ত গাথা-কবিতায, গল্পভরা ছড়ায়, ভরা গলার মন্ত্রপাঠে। কিন্তু পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে আমাদেরও যথেষ্ট বয়স বেড়েছে। তারপরের সামাজিক অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক ইতিহাস আমরা জেনেছি, জানতে হয়েছে য়ুরোপের অন্ধকার যুগ, গির্জের রাজত্ব, এবং ক্রমবিবর্তনের অন্যান্য অভিব্যক্তি : সামতন্ত্র রাজতন্ত্র সাম্যবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা।" —শিল্পীর ভূমিকা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। শতভিষা, ২৩শ সংকলন

মধ্যযুগের কাব্যেতিহাস ধর্মনিয়ন্ত্রিত। বাংলা সাহিত্যেও প্রাগাধুনিক যুগে ধর্মের একাধিকার বিস্ময়কর। মঙ্গলকাব্যে, পদাবলী সাহিত্যে, অনুবাদ ও জীবনী কাব্যে— সর্বত্রই ধর্মের শামিয়ানা বিস্তৃত। সেই ধূপ-সুরভিত শামিযানার নীচে মিলিত হতেন শ্রোতা এবং গাযক। কবির অনুভবগুলি গায়কের কণ্ঠে সুরের ধারায় ঝরে ঝরে পড়ত বিমূর্তরূপে। সাক্ষর-নিরক্ষর বিরাট জনসমাজ ছিল কবির সংবেদনায অনুভূতিশীল। কবি কখনো রাজসভার বিদগ্ধ চিত্তের উদ্দেশ্যে রস-পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, কখনো বা বৃহৎ গণসমষ্টির। কবির ভাববৃত্তের আবহমণ্ডলে পাঠক অর্থে শ্রোতারা বসতি স্থাপন করেছেন। বৈষ্ণব ও শাক্তের কাব্য-সভা গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্যের মত পৃথক হলেও স্ব স্ব কেন্দ্রে শ্রোতৃ-মানস ছিল সমজাতিক। কবি এবং পাঠক একই ভাবানুভবের স্পর্শবিন্দুতে মিলিত হয়েছেন। অর্থাৎ তখনও জাহাজ-ডুবির মত কোনো অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা ঘটেনি। এই প্রসঙ্গের সঙ্গে আমরা মৈমনসিংহ-গীতিকার অপূর্ব গাথাকাব্যগুলির রসসম্ভোগের কথা সংযোজিত করতে চাই।

উক্ত যুগের ক্রান্তিপর্বে কবিওয়ালাদের আবির্ভাব এবং তাঁদের রস-বিতরণের আয়োজন শ্রোতৃ-সংখ্যার বহুলতাই প্রমান করে। 'চাপান' 'উৎরাই' বা উত্তর-প্রত্যুত্তরের আমোদ অনেককে আকৃষ্ট করলেও বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। কবিওয়ালাদের ঠুনকো চটকদারি অবিলম্বে অপগত

হল। কিন্তু দেবালয়ের একাধিকারের হাত থেকে বাংলা কাব্যকে বিমুক্ত করে লোকালয়াভিমুখীন করার পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কবিওয়ালারা। সেই সঙ্গে ধর্মানুকূল্য হারিয়ে বাংলা কবিতায় আধুনিক যুগের আত্মসংস্থ নির্জনতার সূচনা চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু এই যুগ-স্বাক্ষর প্রকটিত হওয়ার আগেই আধুনিক কালের যাত্রা সূচিত হল।

আধুনিককাল আত্মস্থতায় বিশিষ্ট। ব্যক্তিসর্বস্বতার প্রথম প্রকাশ ব্যক্তিস্বাধীনতারূপে মধুসূদনের কাব্য-বিদ্রোহে। ইতিমধ্যে মুদ্রণশিল্পের প্রবর্তনায় বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব হল। কাব্যের পসরাকে বিকিকিনির বাজারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিল উক্ত পত্র-পত্রিকাগুলি। বলা বাহুল্য, এই বিকিকিনির বাজারে ক্রেতা হলেন সাক্ষর পাঠক। কবি তাঁর কাব্যের নিরক্ষর শ্রোতার হৃদয়-সংবেদনা হারিয়ে আবহ-বৃত্তকে সংকুচিত করতে বাধ্য হলেন। প্রাগাধুনিক কালের কাব্য-সভা ভেঙে পত্রিকাগোষ্ঠী গড়ে উঠল। উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক মহৎ কবি-চিত্ত কোনো না কোনো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে স্বীয় বৃত্ত অঙ্কিত করেছে। কালানুগতিক অগ্রস্থিতির আনুকূল্যে স্বাধিকারপ্রমত্ত কবি-মানস পাশ্চাত্য শিক্ষার নিশ্চিত পরিণামে উত্তুঙ্গ মননশীলতায় সমারূঢ় হল। উনিশ এবং বিশ শতকের বাঙালী কবিগণই দেশের উজ্জ্বল 'ইনটেলিজেন্‌সিয়া'। বাংলা কবিতায় আবেগের সঙ্গে মননশীলতার সমাহার ঘটল। এবং বাংলা কবিতার সাক্ষর পাঠকের মধ্যে বাছবিচার করে মুষ্টিমেয় সংখ্যাল্পতা অঙ্গুলিমেয় হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য ইদানীংকালে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনায় সেই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু আত্মসংস্থ কবিচেতনার নির্জনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ক'জন ভাঙতে পেরেছে?

সম্প্রতি যান্ত্রিকতার ঔদার্যে এবং রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বোঝাবুঝির ভিত্তিতে আমরা বিদেশী কাব্যের মহৎ ফসলগুলিকে ঘরে বসেই পাচ্ছি। উনিশ শতকে ইংরেজি কাব্যের মত বর্তমান শতকে ফরাসি কাব্য বাঙালি কবি-চিত্তকে নাড়া দিয়েছে বেশি। রবীন্দ্রনাথও ফরাসি কাব্য-আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কিন্তু প্রভাবিত হন নি। কারণ সম্ভবত উপনিষদ্‌-পরিশুদ্ধ রবীন্দ্রচিত্তের শুচিতা বোধ। তথাপি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসনের চেয়ে ফরাসি-শাসন যে আমাদের পক্ষে অধিকতর ফলদায়ক হত, তা

ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে গেছেন। বাংলা দেশের সাম্প্রতিক কবিসমাজ ফরাসি কাব্যসাহিত্যের সান্নিধ্যে বসতি স্থাপনাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এতে বাংলা কবিতা লাভবান হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই লভ্যাংশকে যে ক্ষতিমূল্যে স্বীকৃতি জানাতে হচ্ছে তাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

সতেরো শতকে ফরাসি ভাষার শুদ্ধীকরণ এবং কাব্যায়নের (purification ও abstraction) ফলে কাব্য-মান উন্নীত হলেও ভাষাগত কৃত্রিমতার জন্যে পাঠকসমাজ সীমাবদ্ধ হয় কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাষণে ফরাসি ভাষা করল অতুলন সুষমার সৃষ্টি। একেকটি শব্দ একেকটি অর্থের দ্যোতক হয়ে দাঁড়াল। যেমন, 'house' যে-কোনো বাড়িকে দ্যোতিত না করে নির্দেশ করলো দিগন্তের নিঃসঙ্গ গৃহটিকে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রোম্যান্টিক আন্দোলনের শুরু। রুশোর আত্ম-সংস্থতা (subjectivity) যে উত্তরসূরী রোম্যান্টিকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ফরাসি রোম্যান্টিক কবিদের মনে স্বাধিকারপ্রমত্ততা জাগিয়ে তুলেছিল শেলির বৈপ্লবিক বাণী : Poets are the unacknowledged legislators of mankind.।

বোদলেয়ার মালার্মে র‍্যাবো-র কাব্যে ঈষৎ ঘোরালো ভাবে হলেও এই মনোভঙ্গির প্রতিভাস। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ছায়ায নবগঠিত সমাজ থেকে দেখা গেল কবিদের ক্রমবর্ধমান অপসরণ। ১৮৪৮ এর পর অতৃপ্ত ফরাসি 'ইনটেলিজেনসিয়া' প্রভাবশালী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেখানে সম্ভব হতে পারত সেখানে দেখা দিল সমাজ থেকে শিল্পরসায়নের দিকে প্রস্থিতি। বোদলেয়ার-এর কাব্যে এই নির্জন শিল্পাত্মিকতার বেদনার প্রথম প্রকাশ। র‍্যাবোর অরুন্তুদ যন্ত্রণামথিত কবিতার উৎসার একান্ত আকস্মিকভাবে উনিশ কুড়ি বছর বয়সের সময় শুরু হয়ে গেল। যে পৃথিবীর মূল্য তিনি অস্বীকার করেছিলেন, 'নরকে এক ঋতু'তে *(Une Saison en Enfer)* তারই এক টুকরো মাটির জন্যে তিনি অহরহ ক্ষতবিক্ষত। সভ্যতার ভাঙনের দিকটা তাঁর চোখে যে ভাবে ধরা পড়েছিল, এমন আর কারো কাব্যে নয়। কিন্তু র‍্যাবোর ট্র্যাজেডি, তিনি নিজে তার হাত থেকে রক্ষা পান নি। র‍্যাবোর কাব্য ভাষার উপকরণে রচিত ইমারত : কিন্তু মালার্মের কাব্য ভাষার নির্মিতি। তাঁর মতে সুন্দরের প্রকাশ একমাত্র

ভাষাতেই সম্ভব। "There is only Beauty— and it has only one perfect expression—Poetry."

মালার্মের পর তাঁর ভাষা-সৌধ ভেঙে পড়ল। বর্তমান শতকের সূচনায় '*Ecole Romane*'এর অভ্যুদয়ে ক্লাসিসিজমে প্রত্যাবৃত্তে উনিশ শতকীয় ফরাসি কবিতার আন্দোলনের ব্যর্থতার ইতিহাসই লিখিত হল।

এবার সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় ফিরে আসা যাক। বাংলা কবিতায় আন্দোলন এসেছে প্রধানত তিরিশের কাল থেকে। কবিতায় রূপগত এবং আত্মাগত সংস্কার-ভাঙার প্রবণতা তীব্রভাবে দেখা দেয় বর্তমান শতকের তিরিশ এবং চল্লিশের কোঠায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনের নামতালিকায় স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। তাঁর শেষের দিককার কবিতায় এই আন্দোলনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এই কবিতাগুলি সম্পর্কে বর্তমান আলোচকের সংকোচ রয়েছে, তেমনি সংকোচ আছে তাৎকালিক কবিদের অনেকের কাব্যকৃতি সম্পর্কে। বিশ শতকের পঞ্চাশের সীমারেখাকে সাম্প্রতিক কবিতারূপে চিহ্নিত করা যায়। পঞ্চাশোত্তর বাংলা কবিতায় ছন্দে প্রত্যাবর্তন অন্যান্য সুলক্ষণগুলির অন্যতম। কথিকা-ভূমিক কাব্যায়নে, গদ্যধর্মী সংক্ষিপ্ত ভাষণে, ললিত সংগীত-প্রসন্নতায়, ভাব-বৃত্তের স্বচ্ছতায়, স্পষ্ট উপমা—রূপকল্পের প্রসাধনে সাম্প্রতিক কবিতা উজ্জ্বল।

উনিশ শো পঞ্চাশের পর থেকে বাংলা কবিতা তার মর্যাদার আসন ফিরে পেয়েছে। বাংলাভাষার সঙ্গে ছন্দের আত্মিক যোগ পুনর্স্বীকৃতি লাভ করেছে। বলা যেতে পারে, ঝড়ের পর ঢাকনা খুলে দিয়ে আকাশের শান্ত মুখ দেখা যাচ্ছে। "Poetry of the earth is ne'er dead"—বিশ্বাস করি, কবিতার মৃত্যু নেই।

নদী

দিলীপ রায়

নদী ওগো, তুমি এখন এত শান্ত কেন ?
বৃষ্টি সারাদিন ছিল বন্ধ ঘরে বন্দী মন, এখন উদাস সন্ধ্যা।
নদী, তোমার বুকে দুরন্ত ঢেউ জাগে কখন
ঝড়ের মত বাতাস মাতাল জাহাজ দোলায়, তখন
আমি তোমার রূপ দেখতে চাই, মূর্তি ভীষণ সুন্দর।

স্নাত সবুজ মাঠের ধারে অন্ধকারে সিক্ত গাছ
দাঁড়িয়ে নীরব পাহারা দেয়, প্রেমিক যুবক সুন্দরীদের
অন্বেষণে নদীর ধারে ভ্রমণ করে ; এখন নদী
সমুদ্র নয়, প্রবল বেগে ওঠেনা ঢেউ মুহুর্মুহু
মত্ত যেমন মাতঙ্গ তার শুণ্ড নাচায়, তেমন নয় প্রকাণ্ড,
এখন নদী প্রশান্ত।

যেমন তোমার রুদ্রাণীরাগ রৌদ্রে জ্বলে হীরক, হলুদ বন্যা বস্ত্র
ভ্রূকুটিতে কপটকোপকম্পমান কামিনীর চোখের শাসন
বারণ মানেনা, এত ঢেউ নৃত্য করে চঞ্চল
এখন, প্রসারতায় প্রসন্ন আলিঙ্গনের আকর্ষণ
তোমার অপরূপ আশ্রয়ে একটু পরে আসবে ঘুম
অলক্ষিত।

রজনীগন্ধা

ফণিভূষণ আচার্য

রাতের হৃদয় ভেঙে কে কোথায় কেঁদে উঠল ঘরে।

আঁধারের সিঁড়ি বেয়ে বিনিদ্র শয্যার হ্রদ থেকে
স্বপ্নসিক্ত দুটি তনু উঠে এসে তীরে মুখোমুখি
দাঁড়াল অবাক। যেন পরস্পরকে দেখল দুজনেই
স্থির নক্ষত্রের মত। তারপর কেঁদে উঠল নীলরাত গলায় জড়িয়ে
ভিক্ষু আকাশের মন শব্দহীন বৃষ্টি হয়ে ঝরে।
বৃষ্টিতে ভিজুক মন। অপ্রমত্ত অক্লিষ্ট নায়ক
অমিতাভ রায় দেখল রজনীগন্ধার নাম লেখা
আঁধারের সূচীপত্রে এবং বাতাসে এক গোঙানির মত আর্তস্বর
সহসা বিধ্বস্ত করল রাত্রির বিস্তৃত হৃদয়
রজনীগন্ধার মত বৃষ্টি হল আকাশের মন।

অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে কে কোথায় কেঁদে উঠল রাতে
আমার নির্জনে কেন অশরীরী কান্না মেলে দাও
ঘুমে তার মুখখানি পাছে দেখে ফেলি, ঘুমোবো না
তবু সঙ্গোপনে এক কান্নার কাকলি রাখে আমার পৃথিবী
নিঃসঙ্গ ঘরের পাশে। আলো মুছে গেছে দুটি চোখে
নিষ্ঠুর দুহাতে আমি উপড়ে এনেছিলাম সূর্যকে।
না। শুধু সূর্য-ই নয়, তোমার আকাশ মেঘ তোমার জগৎ
নিশ্চিহ্ন করেছি এই দুহাতের কিশোর আঙুলে
তবু জানো এ হৃদয় ভালোবেসেছিল
রজনীগন্ধার গন্ধ আর সূর্যোদয়
ভেবেছি, কঠিন শোকে, উন্মুখ কান্নায়
তোমার হৃৎপিণ্ডে আমি লিখে দেব গভীর স্বাক্ষর
কিংবা চোখে রাখব এক আগুনের মেঘ

তোমাকে জ্বালাব, জ্বলব, বৃষ্টি হব যন্ত্রণার ঝড়ে
ফিরে ফিরে আসব যাব তোমার ঘরের পথ দিয়ে
রজনীগন্ধার গন্ধ আলো হবে সূর্যমুখী-ভোরে।

আঁধারে ডায়েরী লিখল অমিতাভ রায়।

কালো পাতা ওল্টালো যদি কোথা আলো থাকে বাকি
যদি কোথা সূর্যনট আলোর বিহারে কোণারক
গড়ে থাকে, সেই পথে ফিরে যাবে, খুঁজবে এক কিশোরীর মুখ
রজনীগন্ধার নামে যার অভিজ্ঞান মিশে আছে।
বুকের গভীর থেকে কে কোথায় কেঁদে উঠল ফের
তোমাকেই দেব বলে সায়াহ্নের বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে
একটি স্বপ্নকে এনেছিলাম গোপন দুঃখে রজনীগন্ধায়।
না। শুধু স্বপ্নই নয়, উন্মুখর আমার হৃদয়
উজ্জ্বল আলোর স্নানে কিশোরী নদীর ভাটিয়ালি
তোমাকেই দেব বলে বুকে করে এনেছি সেদিন
তোমাকে দিই নি কেন, শোনো তবে, অমিতাভ, হৃদয় আমার
নিষ্ঠুর দুহাতে তুমি কেড়ে নেবে আমার অঞ্জলি
সম্মানিত করবে তুমি যৌবরাজ্যে তোমার পৌরুষ।
পলাশ চৌধুরীকে কি মনে পড়ে? অবশ্যই জানি
তুমি তাকে কোনোদিনও ভুলবেনা। কাহিনী যেহেতু
তাকেই বেষ্টন করে কল্লোলিত তোমার জীবনে
সে প্রথমে মূল্য দিতে চেয়েছিল ফুল, পাখি, গান
এবং গোধূলিচিন্তা, প্রভাতের কারুকার্যময়
যন্ত্রণার স্মৃতিচিহ্ন। তাকেই গিয়েছি দিতে রজনীগন্ধার
সাবলীল অনুভব, জানি ভালোবাসার প্রত্যয়ে
তোমার হৃদয়ে জাগবে ফাল্গুনের দুঃসহ পিপাসা
আমাকে ছিনিয়ে নেবে দস্যুর মতন কিংবা ঝড়ের আগ্রহে
রজনীগন্ধার গন্ধ হয়ে আমি ঘিরে থাকব তোমার পৃথিবী।

অন্ধকার ভেঙে পড়ল অবিশ্রাম কান্নার দেহাতী

না, তুমি বোঝোনি কিছু। কুমারী নদীটি
তোমাকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিল, অন্তহীন জলের বিবৃতি
তোমাকে করেনি স্পর্শ। স্পর্শাতুর যুগ্ম বাহুমূলে
ঘনীভূত বিস্ময়ের ভাষা তুমি পড়তে পারো নি।
কিংবা পেরেছিল তাই কৈশোরের লক্ষ্যভেদ ছলে
ধনুকে যোজনা করলে কি কঠিন দস্যুর আক্রোশ
নিমেষে ছিনিয়ে নিলে আমার সূর্যকে।
না। শুধু সূর্যই নয়, আমার আকাশ মেঘ আমার জগৎ
এবং তোমাকে। তুমি স্বেচ্ছা নির্বাসনে
কাকে যে ফিরেছ খুঁজে তা তো আমি জানি
আমার আঁধার ঘরে আলো হয়ে, গান হয়ে তুমি
এসে ফিরে ফিরে গেছ কত বার, আমার নির্জনে
রেখে গেছ অনুভব। দশটি বছর
জীবনের কতখানি, যৌবনের কতগুলো ঢেউ
বেলাভূমি ভেঙে ভেঙে নিয়ে গেছে সময়ের ঘনিষ্ঠ উৎসাহ।
আকাশ নিয়েছ কেড়ে, আমার আকাশ ফিরে দাও—
অমিতাভ, অমিতাভ, কতদিন তোমাকে দেখিনি।

নিভৃত দুঃখের খুশি আসন্নপ্রসবা ক্লান্ত হরিণীর মত
আদিগন্ত ঘুরে ঘুরে শুব্ধ হল বনরাজিনীলা
আকাশ বিস্তৃত হবে নাকি দুটি চোখের তারায়
কিংবা আষাঢ়ের মুখে ক্ষীয়মান রোদ্দ্,রের ছায়া
সানুবর্তী বনভূমি কান্না মুছে বৃষ্টির রুমালে
দাঁড়াল একক আর্ত সান্ত্বনার মতন স্বাধীন।
তোমার চোখের আলো হয়ে আমি ঘুরেছি সতত
কান্নায় ধূসর সেই আমার পৃথিবী
তার প্রতি পথপ্রান্তে ধূলিকণা তোমার রূপক

বৃষ্টির কাকলি তাকে সাজিয়েছে কান্নার সেঁজুতি।
তুমি তো জানোনা আমি যে নিভৃতে তোমার কলিত
নীলকান্তমণিটিকে ভেঙে ফেলে দেউলে হয়েছি,
তখনই আকাশলগ্ন তুমি অন্য আকাশের মত
একান্ত আমার হয়ে আমাকেই ঘিরে আছ সুকঠিন ব্রতে
নিজেকে পুড়িয়ে বাঁচি দিবসের মুমূর্ষু আগুনে
রাত্রির শুশ্রূষা যেন তুমি এসে দাঁড়াও একাকী
অবিন্যস্ত দেহময় কাঁপে এক বিশাল ফাল্গুন
আমাকে তোমার করো কৃষ্ণচূড়া-বনবেদনায়
তাই তো তোমার বুকে খুঁজি আমি মন্ত্রের বিস্ময়
প্রভাতের অঙ্গীকারে। তার পর দিন আর রাত্রিদের সিঁড়ি
ভেঙে আমি নেমে গেছি অনন্ত নির্জনে
ভোরের শিশির নিয়ে গোধূলির চোখে
আঁকব এক অতীতের স্বপ্নার্পিত মুখ
জানি তুমি একদিন মূল্য দেবে চরিতার্থতায়
আমার সকল দুঃখ রজনীগন্ধার চোখে স্বপ্ন হবে গানে।

তাই হোক, অমিতাভ, ভোরের সর্বস্ব নিয়ে তুমি
আলোর নায়ক হয়ে জেগে থাক আমার পৃথিবী
আমাকে জ্বালাও নিত্য সূর্যাস্তের মেঘে
আমাকে জালাও তুমি— দাবদাহে সহজ নির্মিতি
তোমার দুচোখে আমি আলো নিয়ে হব এক গানের দীপালি।

অন্ধকারে অমিতাভ বুকের গভীরে
রক্তের প্রবাহে কিংবা নীলকান্ত আকাশের সুদূর ব্যথায়
শুনল এক নিরুদ্দেশ সঙ্গীহীন হাঁসের সংলাপ
আত্মবিবরণে তার মুখ থেকে ললিত মৃণাল
মাটিতে লুটিয়ে হল রজনীগন্ধার পরিশুদ্ধ প্রতিভাস।

পুবের জানালা দিয়ে একটি আলোর রেখা দীর্ঘায়ত হল॥

কার্তিক ১৩৬৭

স্বগত

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

এ ঘরে তার নিয়ত যাওয়া-আসা
হাওয়াতে তার পাশে বসার খবর
ভাবতে ভালোই ভালো লাগে মনে
অবসরের ছোট্ট একটু বাসা।

নির্ভাঁজ পর্দা হাওযায় উড়ছে ধীরে
বেড়ালটা ঘোরে এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর
টিকটিকি সাথী, দেওয়ালে পরম আরাম
প্রসঙ্গে মন আবার এসেছে ফিরে ;

হাতের ঠিকানা হাতের কাগজে লেখা
আলস্য বুঝে ঘড়িটা দিয়েছে দৌড়
একটু আগেই কে যেন গিয়েছে চলে
প্রবাসে। এখন বর্ষা-ঋতুর কাল ;

কেননা অশোক-শাখায় আবির লাল
ফাল্গুনে এনে দিয়েছে নতুন স্বাদ
পরবাসী গৃহে ফিরবার দ্রুত পালা
জোয়ারের টানে নদী-সমুদ্রে বান ;
দিনপঞ্জীর অনুভবে গাঁথা মালা—

কী খবর দেবে আকাশ আগামী কাল।

প্রেম

আশিস সান্যাল

আমি তাকে ভালবাসি—এ কথা বলার সাথে সাথে
অনুরাগী ধূলিঝড়ে অতিচেনা নিথর আকাশ
অনুরত প্রত্যাশায় এক যুগ পার হয়ে গেল।
দিকে দিকে প্রার্থনায় পরিচিত গ্রহতারা-দল
দাঁড়াল নিশ্চল শীর্ষে। অন্ধকার নীরবতা ছিঁড়ে
নামল করুণ বৃষ্টি। একটানা আলোড়িত স্বর
গভীর বিনত স্পর্শে হৃদয়ের নিভৃত এষণা
করে গেল প্রসারিত। চেনা পথ অতল অচেনা।

এরই নাম প্রেম। এই উৎসারিত গভীর বিস্ময়ে
বিমুগ্ধ সজল কণ্ঠে স্নিগ্ধতায় অপার আশার
ব্যাকুলতা দীপ্ত হয়; আকাঙ্ক্ষার অভিনব প্রাণ
প্রাত্যহিক জীবনের অনাবিল উন্মাদনা ঘিরে
মুখরতা নিয়ে আসে; সপ্রতিভ চোখের মমতা
পল্লবিত করে দেয় অন্ধকার প্রাণের দীনতা।

সামান্য ভূমিকা

শিবশম্ভু পাল

আমারও ভূমিকা আছে তোমাদের তরঙ্গিত চলার নাটকে ।
ঘরের আত্মীয়সূত্র ওই হোথা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয় ;
কেবল তরণী ভাসে নদীস্রোতে ; দুই পারে জনপদ স্থির,
চোখের সমুখে নিত্য ভাসমান দেশকাল উজ্জ্বল আলোয় ।

রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশ, শ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখে তীক্ষ্ণ দুটি চোখ :
তোমাদের বুকে বাজে— গান নয়— তীব্রতম প্রতিবাদ শুধু,
দিগন্তে মেলেছ আত্মা হাওয়ার আনন্দ নিয়ে কুসুমের মত,
আমি শুধু চেয়ে দেখব লুব্ধ চোখে এই দৃশ্য অন্ধকার থেকে ।

আমারও ভূমিকা আছে তোমাদের তরঙ্গিত চলার নাটকে ।
দেহের ভিতর থেকে বাসনার রত্নগুলি চয়ণ করেছ ।
নেপথ্যে কালের মত গৃহস্থের অকরুণ অমোঘ চুম্বক ;
তাই দেখব লুব্ধ চোখে ; মেনে যাব দর্শকের সামান্য ভূমিকা ।

এপিসোড

মোহিত চক্রবর্তী

তখনো আকাশ ছিল স্বপ্ন-সরীসৃপে আঁকা
তখনো মননে ছিল সবুজ ছায়ার কল্পনা ;
এমনি সময়ে কোন বিবাগী সুরের জালবোনা—
(এ যে) আরো সুন্দর কোন অশ্রুহাসিতে ঢাকা !

কখন সকাল হবে ? সকালপ্রত্যাশী মন বলে।
বিনিদ্র রজনীতে প্রাক্তনী হৃদয়ের সুর
করে না করে না আজি সে-হৃদয়কেই ভরপুর,
যে-হৃদয ছিল কত মেঘমেদুর অঞ্চলে।

ইঙ্গিত পেলাম না তাই অজানা সুরের ইঙ্গিত—
সকালের সূর্য এনে দিল নাকো আলো-হাসি-গান,
আলোকিত পৃথিবীতে সে-সুর পেল না আজ মান,
যে সুর রচনা করে জলতরঙ্গ-সংগীত।

হয়তো এ-সকাল আনে কোনো এক সূর্যমুখী রঙ ;
ফিঙে পাখির ডাকে মুখরিত পৃথিবীর পট,
হয়তো সুদূরকেই হরবোলা করেও নিকট ;
তবু মনে হয় কেন : প্রাক্তনীরা ভালো যে বরং।

অনন্তর কোনো এক পুরাতনী হৃদয়ের গান
এল না এল না এই হৃদযকোণেতে আজো, তাই
আমার হারিয়ে যাওয়া সুর খুঁজে দেখি, ও যে নাই ;
তাই বুঝি এল না এ-হৃদয়েতে আষাঢ়ের বান !

যে আকাশ এনে দিত সন্ধ্যাতারায় আলো-ডালি
আপন হৃদয়কোণে জাগাত স্বরূপ তারাফুল,
ওরাও কি চলে গেল ? ওরাও কি হল আজি ভুল ?
সে-আকাশ হবে না কি কোনোদিনও স্বরূপ সোনালী ?

রাত্রি আজ আমাকেই জানায় না যেন সে-স্বাগত,
উপহার দেয় নাকো আমাকেই আর ভালোবেসে ;
অনন্তর সে-রাত্রি জাগে অন্য এক হৃদয়ের দেশে।
রজনীগন্ধা বুঝি তাই এত লজ্জা-আনত !

পৃথিবী আকাশ, এ মিনতি মম রাখো—
অন্তত এই বিবাগী হৃদযে আজো জাগ্রত থাকো।

বিজয়িনী

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

রক্তাক্ত করেছে মেয়ে শঙ্খসাদা আমার হৃদয়
কেড়ে নিল তপস্যার গিনিগলা সোনালী সময়
জেলে দিল দীপ্ত দীপ—সে আগুনে সব কিছু ছাই,
তবু হায় শক্তি নেই তাকে ছেড়ে সুদূরে পালাই।

সর্বনাশ আঁকা ছিল কেশবতী মেয়েটির চুলে
সর্বনাশ লেখা ছিল তার চোখে : ঢেউ তুলে তুলে
আমার সমুদ্র-মন তার কাছে করে সমর্পণ
অনেক প্রবাল-মুক্তো : রূপবতী হাসছে এখন।

সূর্য-প্রণাম করা হল না আমার এ সকালে
চেয়ে থাকি চোখ তুলে রক্তছোপ শিরীষের ডালে।

·চালশে

গোরাচাঁদ নন্দী

চোখে যখন চালশে পড়ে,
দূরের দৃষ্টি যায় খুলে,
কাছের জিনিস ঝাপসা শুধু
যদিও ঘরে এক-শো আলো।

মনে যখন চালশে লাগে,
অতীতকে হায় আঁকড়ে ধরি,
ভবিষ্যতের ধাক্কা-ভয়ে
বর্তমানে হোঁচট খাই।

মায়া-চশমায় জগৎটা
পরিষ্কার ও জমকালো,
সদর-দোরে কড়া বাজায়
কাবলিওলা যম-কালো!

হারুশেখের আয়না

শান্তি লাহিড়ী

দেখ দেখ, জমেছে কত সোনা
স্নিগ্ধ সবুজ মাঠের রেকাবীতে,
মুগ্ধ মনের ধূসর অগ্নিকোণা
দেখ দেখ, জমেছে কত সোনা।

দীঘল কালো। পৃথিবী, তুমি দেখ
দু-মুঠো তোলা ফসল-লক্ষ্মী— সোনা
চূর্ণপরাগ শরীরে-মনে মাখো,
জননী হও। জননী তুমি দেখ

গভীর হৃদয় স্বচ্ছ ভালোবাসা
কেউ কি ডাকে আর্তি— ফটিক জল ;
মুছো না তুমি ললাটে কারো আশা,
চন্দনের লিখনে ভালোবাসা।

কি তুমি দেখ, মরারোদে মরীচিকা ?
তবু তো মাঠের আঁচলে সাতটি কড়ি
সিঁথেয় সিঁদুর, বধূ ঘরে যাবে একা
হারুশেখ জানে মাঠে জলে মরীচিকা।

নাম

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

মুখ তোলো, একবার মুখ তুলে তাকালে সবিতা
আমি হব সকালের গাঢ় প্রসন্নতা।

এখন গভীর রাত্রি— গভীর গভীর।
একদা যাদের শুধু সোনার হরিণ বলেছিলে
আজ দেখি তারা সব মিশে গেছে সংসারের হাটে।

স্মরণের প্রান্তে সেই প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রত্যয়
'সবিতা' 'সবিতা' —সূর্য বলে যেন একদা তোমায়
সংযত দুহাত দিয়ে প্রেমের আশ্বাসে গড়েছিল।
সেই নাম অর্ধস্ফুট এখন শুধুই
একমাত্র স্বপ্নের শরীর শর্বরীর।

তবু তুমি কোন্ সুখে সোনার হরিণ হলে নিজে।

এখন গভীর রাত। কেউ নেই কাছে কিম্বা দূরে
মুখোমুখি শুধু দুটি মৃতপ্রায় আলো ;
একবার মুখ তুলে জ্বলো ফের সুন্দর সবিতা
স্থির জেনো, আমি তবে প্রথম প্রসন্ন প্রিয় নাম।

অভিনয়ান্তে

প্রফুল্লকুমার দত্ত

তোমাকে ভুলিনি আজো আলো থেকে অন্ধকারে এসে।
নেপথ্যে, আকাশময় সপ্রত্যয়ে লিখে যাই ফের :
নাটকীয় মন নিয়ে তোমাকে ক্ষণিক ভালবেসে
অনেক পেয়েছি শাস্তি, বিনিময়ে কাঁদিয়েছি ঢের !

সেসব কান্নার রাত ফিরে আসে আমার জগতে ;
শাস্তির মুহূর্তগুলো ধূসর স্মৃতির সূক্ষ্ম টানে
মিশে যায় তোমাতেই— স্বভাবস্থ মন কোনোমতে
গড়িয়ে ছড়িয়ে চলে জীবনের অমৃত-সন্ধানে !

জানি, সে-অমৃত-ধ্যানে তুমিও রয়েছ সমাহিতা।
একই গন্তব্যের নেশা এবং জৈবিক প্রেরণায়
তুমি তো স্থবিরা নও, প্রতিবদ্ধ-প্রজ্ঞাপারমিতা,
তৃতীয় চোখের খোঁজে দেখা হতে পারে পুনরায়।

পরকীয়া

গোবিন্দ গোস্বামী

হৃদয় ঈশান কোণ। চেয়ে দেখ অরুণাংশু রায়
ঈশিতা চৌধুরী নামে দূরচিহ্ন যৌবনার দেহে
বিধৃত কালের গতি। সময়ের পিঙ্গল ব্যথায়
শহরে ফ্ল্যাটের গন্ধে ভাড়া-করা বিসর্পিল স্নেহে
কত গলি, ডাস্টবিন, শেষরাত-লাইটের থামে
উজ্জ্বল কান্নার চোখ। কোনো-এক ঈশিতা চৌধুরী
আজো তার ছিন্নভিন্ন অতীতের প্রকল্পিত নামে
শ্লথ হেসে খুঁজে দেখে জীবনের যা গিয়েছে চুরি।

তুমি তো নায়ক ছিলে। বলো দেখি অরুণাংশু রায়
কত শব্দ ধার করা! নোনাধরা স্মৃতির দেয়ালে
বিবর্ণ পোশাকি-মন, তবুও তো উচ্ছিষ্ট খেয়ালে
বার বার হেরে যাও অসংলগ্ন ইচ্ছার সীমায়।

যন্ত্রণার মুক্তি নেই। খুঁজে দেখ চরিত্রের ঠাঁই
কদাচ সম্ভব নয় অন্ধকার শহরের ভিড়ে।
তার চেয়ে এই ভালো, অরুণাংশু-ঈশিতাকে ঘিরে
সংস্কার বিধ্বস্ত হোক, সত্য শুধু যা ঘটেছে তাই।

ইচ্ছামতী

অনিরুদ্ধ কর

কেউ কেউ জানে না তা, কেউ কেউ জানে—
কী করে পৃথিবী আর আকাশ পাতাল
অনিবার্য ভাবে বয় ইচ্ছার উজানে
আকাঙ্ক্ষার নদী হয় উথাল পাথাল।

দিনান্তিক বৃত্ত ঘিরে মুগ্ধ আনাগোনা
দৈবাৎ দোকান থেকে একগুচ্ছ ফুল
কিনে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে অর্চনা
নিজের সৌন্দর্যপ্রীতি, অথবা বর্তুল
উরসের সঙ্গে কোনো পুরোনো উপমা
দিযে একটি তৃপ্তি পাওযা। ঈশ্বর! ঈশ্বর!
এরা কেউ জানল না যে কে সে তিলোত্তমা।

আবার অনেকে আছে সুগম্ভীর স্বর
চলতে ফিরতে ঝরে পড়ে অপার মহিমা
শোনেন সংবৃত হযে রবীন্দ্র-সংগীত
ভাবটা এই—অহো ত্যাখো জানি সব সীমা।
(এদেরও আগের মত আচ্ছন্ন সংবিৎ)।

অথচ আমরা যারা পলে অনুপলে
যন্ত্রণায় পুড়ে মরি ইচ্ছার আদেশে
আবিষ্ট চক্ষুকে ঘিরে নির্বোধ তরলে
ভাবি অলৌকিক দৃশ্য দূরতম দেশে।
তখন বারান্দা ঘিরে মেয়েটি সাজালে
দিগ্বিজয়ী লুব্ধতার কোমল শরীর,
কেমন আবৃত্তি করি বন্ধুর আড়ালে
প্রাচীন আসঙ্গপ্রীতি পূর্ব পৃথিবীর।

নিষ্ঠুর কৌতুকে সেই লুকায়িত স্রোত
জন্মের মুহূর্ত থেকে নিঃসঙ্গ যৌবনে
চূর্ণ করে বিশ্বাসের বিশাল পর্বত
এবং প্রবাহ দেয় গোপন নির্জনে।
তিলে তিলে গড়ে ওঠে তার অবয়ব
বিপুল দুঃখের মত, দৃপ্ত ইচ্ছামতী,
তার উপকূল ঘেরে সান্দ্র অনুভব
সে অতীত, ভবিষ্যৎ এবং সম্প্রতি।

জানলা

পৃথ্বীশ সরকার

এই তো বেশ ভালো
বাতাস আসে, জানলা খোলা রাখো,
তোমার মুখে আলো-
ছায়ার খেলা এমনি ধরে থাকো,
বাতাস আসে, জানলা খোলা রাখো।

এই যে রোদ থাকবে কতকাল,
ফুরিয়ে যাবে, ফুরাবে শেষে সব
সূর্য ডুববে, দিগন্ত হবে লাল
তার পরে যে আঁধার-উৎসব।
আঁধারে জানি, হারিয়ে যাবে সব।

হারাবে তুমি, হারাবে ওই মুখ,
জরায় জীর্ণ, শরীর শীর্ণ হবে—
বাঁচার তবে কোথায় বল সুখ
হারালে মুখ মরার বাকী তবে।
শরীর যদি জরায় জীর্ণ হবে।

এখন রৌদ্র জলছে, তীব্র আলো-
বাতাস আসে, জানলা খোলা রাখো
দুচোখ দিয়ে তোমাকে দেখে ভালো-
বাসছি, তুমি জানলা খুলে থাকো,
বাতাস আসে, জানলা খোলা রাখো।

এসো তবে

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

সেখানে পাবে না দেখা! শুনবেনা গান কোনোদিন,
গোলাপের গুচ্ছে গুচ্ছে স্বপ্নঝরা রোদে প্রভাতের,
মিলনের স্বরলোকে— বিবশ বাতাসে ফাগুনের,
পদ্মকলি-জাগা বনে— রূপে রসে গন্ধে অমলিন।
সেখানে পাবে না দেখা—শুনবেনা গান কোনোদিন,
পুষ্পাসবে মদালস বিলোল বিভঙ্গে নয়নের
কৌতুকীর ফুলশরে সুখাবিষ্ট দেহে বিহঙ্গের—
অথবা উন্মত্ত কোনো বাসনার পাত্রে স্বরহীন।

এসো তবে এইখানে, যেখানে শ্রাবণ ভেঙে পড়ে।
নীড় কাঁপে শাখা দোলে বৃন্তখসা জুঁই মুখ গুঁজে,
ব্যথিত মাটির বুক— সেইখানে এসো সঙ্গোপনে।
কেতকীর পাবে দেখা নিরালা বনের এককোণে,
পাপিয়া আকুল গানে নিশিদিন যাকে খুঁজে খুঁজে,
সে জানেনা, উদাসীনা তাকে চেয়ে রাজ্য ভাঙে গড়ে

মুখের মেলা। মণীন্দ্র রায়। পুস্তক প্রকাশক। ৮/১ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দেড় টাকা।

নামেই স্পষ্ট, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র রায় বর্তমানে সুচিহ্নিত সাধারণের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। সমাজমনস্কতা তাঁর আজন্ম সহচর, কিন্তু আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রবণতা আরও বিচিত্রমুখী। আত্মরতির সুরবিহারে তিনি কখনোই সন্তুষ্ট নন, কিন্তু এখানে তিনি আরও লৌকিক নিবিড়তায় নিবিষ্ট, আরও জগৎনিষ্ঠ, সমাজের সকল চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ে তাঁর বিপুল আগ্রহ। এক অর্থে হয়তো বিষয়নির্ভর, মনে হয় উপন্যাসকারের শস্ত্রসজ্জায় তাঁর মনোযোগ, অন্য দিক থেকে কবিতার এই বিশেষ ধরণের মুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর কবি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও পাঠকের সামনে ধরা পড়ছে।

'মুখের মেলা' কাব্যগ্রন্থের বাইশটি কবিতার কেন্দ্রে বাইশ জন নায়ক (তার মধ্যে চারটি মহিলাচরিত্র)। বংশপরিচয়ে প্রত্যেকেই বিভিন্ন: কেউ উচ্চকুলজাত, কেউ অন্ত্যজ। যদিও পৃথক পৃথক কাহিনীর বক্তা, তবু একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রণার সূত্রে সকলে সধর্মী (বলা চলে, সে যন্ত্রণা সাম্প্রতিক কালের), সেখানে পাইলট অজিত নাগের সঙ্গে ক্যানিঙের সিন্ধু মাঝির পংক্তিভেদ নেই। কিংবা এ কথাগুলি ভুল: কাহিনী এখানে একটিই, আনুপূর্বিক অক্ষরবৃত্তে বিবৃত, তার বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন মানুষের দেখা পাচ্ছি, কেন্দ্রে একজন নায়ক; তিনি মণীন্দ্র রায়। আর, যদিও গ্রন্থের নামকরণে বিপথের নির্দেশ আছে, তথাপি স্পষ্টতই ধরা পড়ে কবি এখানে মেলার মাঝখানের নিস্পৃহ দর্শকমাত্র নন, তিনি প্রতিনিধি, মেলার মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নিচ্ছেন তাদের কথা, কখনো নিজেই তাদের কথা বলছেন, এবং সমকালীন জীবনের সব অন্ধকার পথে অনুভূতির আলো গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

কাহিনী এবং নাটকীয়তা সমস্ত দেশের প্রাচীন কাব্যেরই মৌল উপাদান, এখনকার কাব্যে অন্যভাবে এবং আরও সতর্কভাবে তার পুনরুজ্জীবন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এলিয়ট যে objective correlativeএর কথা বলছেন, মণীন্দ্র রায় এই কাব্যগ্রন্থে সম্ভবত সেই নিরীক্ষার কথা ভাবছেন না। তাঁর

একটি প্রচ্ছন্ন অভিলাষ এখানে ধরা পড়ছে, কবিতার জন্য বিস্তৃততর পাঠক-পরিসরের কথা তিনি ভাবছেন, হয়তো সেজন্যেই এখানকার কবিতাগুলির মূল সুরটি ঈষৎ ডিডাকটিক। ডিডাকটিক কথাটি শুধু মাত্রই চরিত্রনির্দেশের প্রচেষ্টা, এবং সামান্যতম নঞর্থও এখানে অকল্পনীয়। কিন্তু 'মুখের মেলা' অন্তত কয়েকবার পড়বার পর আমার মনে হল, এতে যদি কাহিনীর সংখ্যা আরও কম থাকত, যদি আর-একটু রীতিবৈচিত্র্য থাকত, (বলা বাহুল্য রীতি বলতে আমি একান্ত ছন্দোবন্ধ বুঝছি না) তবে এর আবেদন হয়তো আরও তীব্র হত। প্রতিটি কাহিনীতেই এই ধরণের নাটকীয় অভিযোজনা এবং ডিন্যুমেণ্টের পরে কবির একইভাবের সোচ্চার কণ্ঠস্বর, যাকে পূর্বকালে নীতি বলতে পারতাম, এখন কী বলব ভাবতে পারছি না। এবং একই ধরণের প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত। প্রথম তিনটি বা চারটি কবিতায় গ্রন্থখানির প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করি, পরবর্তী কবিতাগুলিতে তার ভার তার উজ্জ্বলতা অনেক নিষ্প্রভ মনে হয়। মণীন্দ্র রায় অনেকবার বসে যা লিখেছেন এবং তাঁর কাছে যে গ্রন্থ অনেক অভিজ্ঞতা ও অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি, পাঠকের কাছে, দুঃখের বিষয়, তা একখানিই গ্রন্থ, একই অনুভবের বিভিন্ন প্রতিফলন, এবং শতকরা নিরেনব্বই জন পাঠকই একবারে ব'সে গ্রন্থ শেষ করতে অভ্যস্ত।

কিন্তু অনেক উজ্জ্বল পংক্তি আছে গ্রন্থের মধ্যে, তার থেকে দু-একটি উৎকলন করি :

যে পথে আমরা যাব, ভবিষ্যৎ যেন
ঘুমন্ত রাজার মেয়ে, জেগে উঠবে তারি আবিষ্কারে

হারাণ মিস্তিরী, পৃ ১৭

রাত্রে চোখে যেই ঘুম নেমে আসে,
মুহূর্তে সে পায় যেন যুবার শরীর ;
আর ধমনীর স্রোতে অভীপ্সার রঙে অবিরত
দেখে— নারী নয়— ধান, ধানের পাহাড় চারিপাশে,

মাঝখানে সে রয়েছে স্থির
উচ্ছল সর্ষের ক্ষেতে নেশাধরা মৌমাছির মতো !

রজবালির স্বপ্ন, পৃ ২৭

যেন কোন বাস্তিলের পাথুরে কেল্লায়
পাশাপাশি কুঠরিতে বন্দী থেকে আমি তার সাড়া
দেয়ালে ঘা দিয়ে খুঁজি, অথচ সে তাতে শুধু পায
প্রহরীর পদশব্দ,

চৌধুরী-বিলাপ, পৃ ৪০

একটি চরণের ছন্দোব্যবহার :

কিন্তু কী অবিশ্বাস্য যুদ্ধ যে তখন,

ক্যানিঙের সিন্ধু মাঝি, পৃ ১৫

এর প্রয়োগ সচেতন কিংবা অনবধানবশে যে-কারণেই হোক আমার সমান দ্বিধা।

মণীন্দ্র রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কবিতা লিখছেন। 'মুখের মেলা' তাঁর নবম কাব্যগ্রন্থ। কবিতারচনায় তিনি সতত নিষ্ঠাবান : সৎকবির কাছ থেকে এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষিত আর কিছু হতে পারে না। আমাদের আগ্রহ : ভবিষ্যৎ তাঁকে আবার কোন পথে নিয়ে যায়।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের কথা

অনেকের মনে এই রকমের ধারণা আছে যে, কোনো একটি বিষয়ে অধিকারী বলে গণ্য হতে হলে বিখ্যাত খ্যাত কিংবা কমপক্ষে অর্ধখ্যাত হতে হবে। খ্যাতি এবং অধিকার— এই দুইটি বিষয় তাঁদের কাছে তাহলে একার্থক।

অধিকার ব্যাপারটিকে আমরা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস বলে মনে করি। অধিকার অর্জন করা যায় চর্চা ও অনুশীলনের দ্বারা। খ্যাতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নেপথ্যচারী এমন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অনেক আছেন যাঁরা খ্যাতির ধার কখনো ধারেন না। নামের লোভ তাঁদের নেই বলেই তাঁরা খ্যাতি সন্ধানের জন্যে সময় ব্যয় না ক'রে সেই সময়টা নিয়োগ করেছেন চর্চায় ও অনুশীলনে।

এবং সেই সঙ্গে এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন যাঁরা চর্চায় সময় নষ্ট না করে খ্যাতি-অর্জনের জন্যে বিস্তর সময় ব্যয় করে থাকেন। এবং তার ফলে, যথেষ্ট সাময়িক হলেও, তাঁদের খ্যাতি একটু হয়। সেই খ্যাতি ভাঙিয়ে তাঁরা অনেক বিষয়ে অনধিকার-চর্চা করেন। তাঁদের সেই খ্যাতির দাপটে অনেক সময় সাধারণের পক্ষে ধরা কষ্ট হয়— তাঁদের চর্চাটা অনধিকার কিনা।

এই বিষয়ে আলোচনার কারণ এই যে, ধ্রুপদীর একজন নিয়মিত পাঠক সেদিন খোলাখুলি ভাবেই বলে গেলেন যে, ধ্রুপদীতে এমন কয়েকজন লেখকের রচনা ছাপা হয়েছে যাঁদের নাম আগে তিনি কখনও শোনেন নি। তাঁর কথা ঠিক। আগে তেমন শোনা যায় নি এমন অনেকের লেখা আমরা প্রকাশ করেছি। খ্যাত বিখ্যাত বা অর্ধখ্যাত হতে হলেও তো কোনো একজন লেখককে একদিন প্রথম লিখতে হবে, খ্যাত হয়ে কেউ ভূমিষ্ঠ হয় বলে শুনিনি। এবং খ্যাত নয় বলেই লেখকের রচনায় কোনো বস্তু নেই বা বক্তব্য নেই, এ ধরণের বিচার যদি কেউ করেন তাহলে তাঁর— অন্য বুদ্ধির কথা বলছিনে— বিচারবুদ্ধির উপর ভরসা রাখা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন।

খ্যাতিমানদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁদের মতকে সব সময় অভ্রান্ত বলে মনে করি নে। অখ্যাতদের আমরা চিনি নে, কিন্তু তাঁদের রচনায় বস্তু পেলে আমরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি। অখ্যাত বলেই ধ্রুপদীর দ্বার তাঁদের জন্যে রুদ্ধ নয়।

সুশীল রায়

সাঁ জ প্যর্স

সিদ্ধার্থ সেন

ফরাসি কবি সাঁ জ্ঁ প্যর্স এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন।

তাঁর মুদ্রিত রচনার পরিমাণ এক হাজার পৃষ্ঠাও হবে না। ফ্রান্সে জন্ম, কিন্তু লেখক-পরিচিতি বৃটেন ও আমেরিকায় বেশি—বই বিক্রীও। কেউ বলেন "Despite appearances the poetry is as little literary as the images of a front page of a newspaper," আবার কেউ কেউ "poet of poets" বলেও খুশি না হতে পেরে "greatest in French language" বলা অবধি উৎসাহিত বোধ করেন। কিন্তু সাধারণ ও অসাধারণ পাঠক সমভাবে আকৃষ্ট হলেন যখন এলিয়েট নিজেকে এই কবির ব্যাপক প্রচারে নিযুক্ত করলেন। কবির *Anabase* কাব্যের অনুবাদ করলেন এলিয়ট (১৯৩০)। শুধু তাই নয়, বছর-কয়েক আগে (১৯৫৫) নোবেল কমিটি পর্যন্ত গেলেন পুরস্কার-যোগ্য হিসাবে কবির নামের সুপারিশ নিয়ে। সম্ভবত এই *Anabase*ই কবি সাঁ জ্ঁ প্যর্সের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। অতি স্বল্প আযতনের এই কাব্যগ্রন্থটিকে অনেক অভিজ্ঞ সমালোচকরা এপিক বলে অভিহিত করেছেন। বিস্তারিত বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়েও বলা চলে— কল্পনা বোধি এবং যুগজিজ্ঞাসার সার্থক সাযুজ্য এ শতকে খুব কম লেখকের হাতেই হয়েছে।

১৯৪০ সালের এক ঐতিহাসিক সন্ধ্যায যখন নাৎসি পুলিশ পারীর এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে তাঁর সমস্ত রচনার পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলছিল তিনি পাথরের মত অপলক চেয়ে ছিলেন সেই দিকে। প্রতিবাদ করেননি। জানতেন, অন্ততঃ তাঁর ক্ষেত্রে নাৎসিবাহিনী সামান্যতম মমতাও দেখাবে না। তিনিও যে কূটনীতিবিদ্! দিনের রাজনীতিগত রুক্ষ জটিলতা-আচ্ছন্ন মানুষটির যে রাত্রির নির্জনতায নক্ষত্রের দিকেও তাকানোর অভ্যাস আছে, তা বেতনভূক জর্মন অনুচরদের জানবার কথা নয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Eloges* প্রকাশিত হওযার পর দীর্ঘদিন কিছু লেখেনি, এমনকি *Eloges* নিঃশেষিত হযে যাওয়া সত্ত্বেও তার পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেননি। ফলে দেশের লোকেরাও তাঁকে একরকম প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এইদিক থেকে

বিচার করলে মঁসিয়ে ব্রিয়ান্দের সঙ্গে পরিচয় তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্যর্স ব্রিযান্দের অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বে এতদূর আচ্ছন্ন হয়ে পরেছিলেন যে, কবিতা লেখা পর্যন্ত ছেড়ে দিযেছিলেন। ফরাসি সাম্রাজের পতন তাই প্যর্সের কাছে শাপে বর স্বরূপ হয়েছিল, কেননা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমেরিকা পালিযে যান এবং স্বাভাবিক কারণেই ব্রিয়ান্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয। কবি আবার নতুন উদ্যমে কাব্যরচনায ব্রতী হলেন। কবি কোযাসিমোদোর মত তাঁর বাল্যকালও এক নির্জন দ্বীপে কেটেছিল, পরে চাকরীর প্রযোজনে তাঁকে চীন গোবি-মরভূমি দক্ষিণ-সাগর ফিজি-দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে বেড়াতে হযেছিল। কবি এসব অভিজ্ঞতাকে মিলিত করলেন তাঁর কাব্যরচনায। সেটা যুদ্ধের মাঝামাঝি কাল।

১৯১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হল *Eloges*। বোধ হয কবির সহজাত অসীম কুণ্ঠার জন্য প্রকাশকসংস্থা Nouvelle Revue Francaise মলাটে কবির নাম পর্যন্ত ছাপেননি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একই কবি ভালেরির অনুরোধে এগারো বছর পরে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *Poeme*-এ মূল হস্তলিপি ব্লক করে ছাপায আপত্তি করেননি। যতদূর জানা যায় এ গ্রন্থেই তিনি তাঁর ছদ্মনাম সাঁ জঁা প্যর্স প্রথম ব্যবহার করেন এবং পূর্ব পৈত্রিক নাম সেন্টলিগার লিগার ত্যাগ করেন। প্যর্স নামক এক ল্যাটিন ক্লাসিকাল কবির প্রতি অন্ধ অনুরক্তি ছিল তাঁর। সুতরাং প্যর্স শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে উক্ত ল্যাটিন কবির সঙ্গে তাঁর মানস সম্পর্ককে তিনি অবিচ্ছেদ্য করে রাখলেন। এই মানসসঙ্গই সম্ভবত তাকে *Anabase* রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। নাম দাঁড়ালো St. John Perse, এলিযট ফরাসি উচ্চারণ-প্রথায় তাঁকে St. Jean Perse-এ (সাঁ জঁ প্যর্স) রূপান্তর ঘটালেন।

মোট উনষাট জনের নাম এ বছর নোবেল কমিটির কাছে গিযেছিল ; তার মধ্যে প্যর্সকে তাঁরা বেছে নিলেন এই কারণে "the soaring flight and evocative imagination of his poetry, which in a visionary fashion reflects the condition of our time"। তাঁকে নিয়ে ফরাসিদেশ দশ বার এই পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করল। তাঁর কবিতার বিচিত্র আঙ্গিক-কৌশল যতিচিহ্নের যত্রতত্র ব্যবহার অসাবধানী পাঠককে বিব্রত করলেও অভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তা খুব বড় সমস্যা নয় ; অন্তত নোবেল-

কমিটির অন্যতম সদস্য ও প্যর্স-এর সুইডীশ ভাষার অনুবাদকারী, ইউনাইটেড. নেশনের সেক্রেটারিজেনারেল দাগ্‌ হামারস্কোল্ডের তো তাই মত। গত বছর দ্য গল্‌ সরকার তাঁকে ফরাসিদেশের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার গ্রাণ্ড প্রিক্স দেওয়ার পরই তাঁর নাম আবার নতুন করে নোবেল-কমিটির কাছে প্রস্তাবিত হয়েছিল। সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী ও ফরাসি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক আঁদ্রে মলরো প্যর্সের হাতে সেই পুরস্কার তুলে দেবার সময় তাঁকে বলেছিলেন "For all the writers of my generation, your work had never ceased to express poetry in what it seems to contain of the invincible."।

সাঁ জঁ প্যর্সের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ক্লাসিকালধর্মী মানবিকতা ও দৃশ্যধর্মিতা। প্রাচীন যুগ যে বর্তমান যুগেও বিধৃত, এ কথা, মনে হয়, তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। পূর্বসূরীদেব মধ্যে স্তেফান মালার্মে ও পল্‌ ক্লোদেলের প্রভাব তাঁর মধ্যে লক্ষ্যণীয়। যোরোপের কবিদের মধ্যে প্রধানত এলিয়েট ও আমেরিকার ওয়াল্ট লুইটম্যান তাঁকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন বলে সমালোচকদের ধারণা। বর্তমান যুগের সমস্ত যন্ত্রণা ও গ্লানি যখন আমাদের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তিনি তখন শোনালেন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। তুচ্ছ সাম্রাজ্য-লোভ, মদগর্বী রাজার সাময়িক দর্প, কোনো কিছুই যে মানবিকতার চিন্তা-আচ্ছন্ন মানবহৃদয়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়, প্যর্স আরেকবার তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। একজন সত্তর-উত্তীর্ণ বৃদ্ধের ডাকে বহুদিন পরে আমরা আবার সমুদ্রের নিলীমানিমগ্ন বিস্তৃতির দিকে তাকালাম। ভুলতে পারলাম তিনিও একদা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, দলাদলির সংকীর্ণতায় তাঁকেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে এই স্বার্থান্ধ বিকার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কবিতার আলোকে গিয়ে আবার দাঁড়াতে পেরেছিলেন, বলতে পেরেছিলেন *J' Honore les vivants* (I honour this living) সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

বিজ্ঞানের এই সার্বিক অগ্রগমনের দিনে বস্তু যখন বোধিকে গ্রাস করছে, যখন গদ্য-পদ্যের সীমারেখা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে বলে পণ্ডিতদল সোচ্চার, তখন কবিতার এই আত্মপ্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ সংঘটন।

.গত চার বছরের মধ্যে তিন বছরই নোবেল কমিটি পুরস্কৃত করেছেন কবিদের। এমনকি এ সংবাদ যখন প্যার্সকে জানানো হল, সংবাদিকদের কাছে তিনি প্রথম যে কটি কথা বলেছিলেন তা হল "More than myself, it is poetry that is honoured in this choice for nobel prize. It is a comforting thing in a materialistic world"।

রচনাবলী : Eloges (1911), Poeme (1922), Anabase (1924)
Amitie du Prince (1924), Exil (942)
Vents (1946), Amers (1957), Chronique (1960)।

সাঁ জঁ প্যর্স-এর কবিতা : অনুবাদ

অভিযান

জগন্নাথ চক্রবর্তী

তিনটি দীর্ঘ ঋতু পার হলাম, প্রতিষ্ঠা করলাম নিজেকে— মর্যাদায় ;
জানি, ফলন্ত হবে এই জমিন যেখানে আমার শাসন কায়েম হল,
সকালের রোদে তলোয়ার, দেখ, কী সুন্দর, কী সুন্দর সমুদ্র,
আমাদেরই অশ্বখুরে অর্পিত এই পৃথিবী— নির্বীজ
নিষ্পাপ আকাশটুকু আমাদের হাতে তুলে দিল ;
সূর্যের নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু তার তেজ আমাদের মধ্যে রয়েছে
আর ভোরের সমুদ্র, যেন কিছুই নয়, মনের এক কল্পনা, অনুমিতি।

হে তেজ ! তোমার গান ধ্বনিত হয়েছে আমাদের রাত্রির পথে পথে···
ভোরের পুণ্যাহে আমাদের স্বপ্নের— ঐতিহ্যের— কীই বা জেনেছি আমরা ?
আরও একটি বৎসর তোমাদের সাহচর্য পাব ;
হে ফসলের প্রভু, নুনের প্রভু, এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এই হুকুমত,
ডাকব না অন্য কোনো সমুদ্রতীরের মানুষকে ; না, একেবারেই না ;
প্রবালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকব না বড় বড় পৌরপল্লীর নকশা পাহাড়ের ঢালুতে,
তোমাদের মধ্যেই থাকব, বাস করব— এই আমার বাসনা।
তাঁবুর দ্বারদেশে রইবে আমার শ্রেষ্ঠ গৌরব,
তোমাদের সকলের মধ্যে আমার শক্তি,
এবং নুনের মত শুভ্র শুদ্ধ ভাবনা আমার দিবালোকের বিবেক।

সাঁ জঁ প্যর্স-এর কবিতা : অনুবাদ

চলে যাব

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আর নয়, এবারে নিঃসঙ্গ চলে যাব।
চলে যাব বাহিরে। আমার
বাহিরে রয়েছে কাজ। সেই ছোট্ট পোকাটির কাছে
চলে যাব, সে আমার প্রতীক্ষায় আছে।
আমি তার চক্ষুর বাহার ভালোবাসি।
বৃহৎ কৌণিক চোখ। অতর্কিত। সাইপ্রেসের ফলের মতন।
অথবা সেইখানে যাব, নীলশিরা রাশি রাশি পাথর যেখানে
ছড়িয়ে রয়েছে। গিয়ে, বসে থাকব আমি
নিজেরই হাঁটুতে মাথা রেখে।

রাজার গল্প

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিজয়ী! হে বিজয়ী! কি সুন্দর এই শোণিতপাত,
এবং সেই করতল
যা শাণিত অস্ত্রের তীক্ষ্ণতাকে কোষমুক্ত করেছিল!
অনেক
চান্দ্রসময় আগে, যখন আবহাওয়া ছিল তপ্ত, আমি স্মরণ করতে পারছি
সবুজ পাখির খাঁচা হাতে পলায়নরত রমণীদের, খঞ্জের আর্তনাদ, আর
শান্তিপ্রিয় ঊর্ধ্বশ্বাস জনতার, এলাকার সবচেয়ে বড় হ্রদের দিকে অসংবদ্ধ ছুটে যাওয়া।
ধর্মযাজক এক একচক্ষু উষ্ট্রের আরোহী— ছুটে যাচ্ছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের আড়ালে;
এবং একই সন্ধ্যায়, আগুনের চারিপাশে, সেইসব মানুষই জড়ো হয়েছিল
যাদের নিপুণতা বাঁশিতে, বাদ্যযন্ত্রে, এক সংগীতের ধারাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মানবিকতার ফসল ছিল আগুনে ইন্ধন। সম্রাটেরা নগ্ন শুয়ে ছিলেন
মৃত্যুর সৌরভে আচ্ছন্ন। এবং সৌরভ যখন
অন্তিমভস্মে বিলুপ্ত হল
আমরা সেই পবিত্র মদে স্নাত শুভ্র হাড়গুলি একত্র জড়ো করলাম।

তোতাপাখি

কমলেশ চক্রবর্তী

এখানে আরো একটি।

তোতলা এক নাবিক এটা দিয়েছিলো সেই বুড়িকে, বুড়ি বিক্রি করেছে তাই। দেওয়ালের ফোকরের বারান্দায় ব'সে আছে সে, যেখানে অন্ধকার মিশে গেছে দিনের নোংরা কুয়াশায়, চোরাগলির রং।

রাতে, দুষ্ট চিৎকারে সে তোমায় সম্ভাষণ করে, ক্রুশো, যখন, উঠোনের স্নানঘর থেকে উঠে আসো, তুমি গলির দরোজা খোলো আর তুলে ধরো তোমার প্রদীপের চঞ্চল নক্ষত্র। তার চোখ ঘোরাতে সে মাথা ঘোরায়। প্রদীপ হাতে মানুষ! তুমি কি চাও তার কাছে?…
তার পাপড়ির পচা রেণুর নীচে গোল চোখের দিকে তাকাও; তুমি দ্যাখো দ্বিতীয় বৃত্ত তা যেন একটা মরা রসের আংটি। আর অসুস্থ পালক টানে তার ক্ষীয়মাণ জলে।

হে দুঃখ! নিবিয়ে দাও তোমার দীপশিখা। পাখি দেয় তার ক্রন্দন।

প্রশস্তি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একে একে আর সকলেই ওরা উঠে এল ডেকের উপরে,
আমি তখনও তাদের বলছি তোমরা পাল তুলে দিও না…কিন্তু
ওই লণ্ঠন, তোমরা নিবিয়ে দিতে পারো অনায়াসে…
শৈশব, আহা আমার ভালোবাসা! এই প্রভাতবেলা, কত-
কিছুর মিনতি সেই মধুরিমার, যে মধু গানের
তিক্ততায়,

রেখাসার অস্ফুট বক্তব্যের, অধরের কম্পিত লজ্জায়
যে মধু,
ওগো মধুর, ওগো মিনতিময়, পুরুষের মধুরতম কণ্ঠস্বর,
তার রূঢ় কঠোর হৃদয় যখন সে ইচ্ছামতী রমণীর দিকে অভিলাষে
নোয়াতে সম্মত…

আর এখন আমি তোমাকে সুধাই বলো, এই কি নয়
প্রভাতবেলা… ওই নিশ্বাসের সহজ
আর দিবসের একরোখা শৈশব, গানের মত এই পরম
মধুরিমা, যে গানে দুচক্ষু মুদে আসে ?

ঘণ্টাধ্বনি

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

লগ্ন হাত, বুড়ো লোকটাকে
আবার মানুষের ভিড়ে আনা হলো, ক্রুশো।
কল্পনায় দেখি তুমি কাঁদছিলে
মঠের চূড়া থেকে ভেসে আসা ঘণ্টাধ্বনি
যখন শহরের বুকের উপর অশ্রুর মত ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছিল,
যেন জোয়ারের স্রোত…

হায় রে লুণ্ঠিত !
তোমার চোখে জল এনেছিল
চাঁদের আলোয় উদ্বেল সমুদ্রের ঢেউয়ের স্মৃতি ;
আরো সব দূর সমুদ্রতীর থেকে ভেসে-আসা শিসের ধ্বনি,
সেই বিচিত্র সংগীত যা জন্ম নেয়
আর রাত্রির ডানার ভাঁজে ভাঁজে আবৃত থাকে,
বৃত্তমালার মত পরস্পর গাঁথা
যেমন শঙ্খের আবর্ত,
কিম্বা যেন সমুদ্রের অতলের আর্তনাদ
ক্রমবর্ধমান…

পরিক্রমা

দুর্গাদাস সরকার

বিশ্বাসঘাতিনী তুই। নরকেরও দু চোখের বিষ।
আমাকে ভুলিয়ে যাস পরপুরুষের সঙ্গলোভে।
বাহুর বন্ধনে তোর ছলনায় যদি কাঁদি ক্ষোভে
বিধাতার দরবারে হার মানে আমার নালিশ।
অথচ বয়স তোর বিশ, আর আমার বত্রিশ।
আমি মুগ্ধ ফুলে, তুই ছিপি-আঁটা শিশির সৌরভে
সাজানো দোকানে যাস মাছিদের মতন গৌরবে।
তবুও নিজেকে তুই অসূর্যম্পশ্যাই বলিস!

দোয়াতের সব কালি ঢেলে ফেলি। ডুবে যায় যাক
অক্ষর-বীণায় বাঁধা মিথ্যা তোর রূপের রাগিণী।
ছলনায় ভুলি আমি আর কেন বিশ্বাসঘাতিনী?
রূঢ় কথা বলতে গিয়ে বেদনার দহনে নির্বাক
যত হই, তত যেন ভালবাসি। হায় রে বিপাক,
অবিশ্বাসী সে-নারীকে কেন আমি চিনেও না চিনি!

তুই না কুলটা? তবে বল্ কেন লুকাস নিজেকে
মিথ্যা প্রবচনে। তোর বাইরে নকল সতীপনা
আমার অসহ্য লাগে। ভিতরের অসতী-কামনা
কীভাবে লুকাবি বল? ছল কেন তাই সত্য ঢেকে।
না, তোকে চাই না আমি। শুদ্ধ হবি কখনো কি সেঁকে
মনের আগুনে তোর অশুচি রুচিকে? ক্রূর ফণা
কখন ছোবল মারবে আমি তা কখনো জানব না;
মনটা লুকাবে তোর তারপর গর্তে এঁকে বেঁকে।

আবার নতুন কেউ প্রকাশ্যে আসবে তোর কাছে
হয়তো পড়বে তারও চোখে তোর লুকানো চিঠিটা,
বুকের ভিতরে তোর দেখবে সে পিঞ্জরের ভান,

উপরে যে মোল শৃঙ্গ অবিরাম রসে রঙ্গে নাচে
মূল্য তার মনে নেই, দাম তার শুধু পাঁচ সিকা।
কুলটা বলে কি সত্যে সে হয না সাবিত্রী-সমান!
আমি সৎ পুরুষপ্রধান ভেবে গর্বে নই স্ফীত।
আদিরিপু বলীয়ান আমারও শরীরে। কোনো নারী
রূপরঙ্গে আসে যদি, সঙ্গে তার দুঃখ জাগে ভারী;
জানি আমি— শেষাবধি নাটক জমে না, হই ভীত।
তবু সে জীবন নিয়ে রঙ্গমঞ্চে হলে অভিনীত
আমার নাটক,—আসে মুদ্রা, লোক জমে সারি সারি।
জীবনের সব দুঃখ তবু কি গোপন করতে পারি?
যে-বেদনা পাই, অন্যে সুখ তার করুক সঞ্চিত।
তোকেও বলেছি আমি আমার কাহিনীক্ষতি সবি,
কুলটা ভেবেও তোকে ছিল না তো ভালোবাসতে ভয়।
সত্যের কঠিন মূল্যে সব দৈন্য দূর হয় যদি
ভাবীকে আপন ভেবে সঙ্গ ফেলে সে-ই হয় কবি।
তবুও কুলটা তুই এমনি, আমাকে অভিনয
দেখালি কেবল। তোর ছল দেখি আমি নিরবধি।
মিথ্যা আমি বলছি না তো, নয় ব্যর্থ স্বগত ভাষণ,
দূর হয়ে যাও তুমি। লজ্জিত কোরো না ইতিহাস।
বিপন্ন করেছ তুমি শুচিস্নিগ্ধ আমার বিশ্বাস।
অনূঢ়া তোমার মধ্যে আত্মার অরুচি প্রলোভন।
আমি যে মৃগয়াপ্রেমী। সেই মৃগ আমার মরণ
আনে তার ছদ্মরূপে। ফেটে হয় চৌচির আকাশ
তার চোখের বিদ্যুতে। আজীবন কেন হাহুতাশ!
ভালোবাসে বলে নাকি সে দেখায় কঠিন শাসন।
সমস্ত সংশয় ভয় সে করেনি দূর কোনোকালে।
সে চেয়েছে রতিসুখ দিতে। আমি ভয় করি নিতে।
তাই যাবো। কেননা সে চিনবে নিজেকে। কেঁদে সুখ

হয়তো চাইবে পেতে, তখন যে-দাগ পড়বে গালে
ঢাকা তা যাবে না লীল পদ্মফুলে। দুবেলা আর্শীতে
ঠোঁট দেখে চোখ ঢাকবে। ও-মনে ভাসবে এই মুখ।
তাহলে আমি কি পাব? শুধু কি জাতীয় গ্রন্থাগারে
বইয়ের ভিতরে থাকব বাঁধা? শুধু কথা হবে জমা
কালির আঁচড়ে?—করব সব দেশ একা পরিক্রমা।
আমার বাংলার ঘর, গ্রাম, মাঠ, সমস্ত সংসারে
এক করে যে মেলাবে বন্দী হব তারি কারাগারে।
ভঙ্গিমাতে না ভোলাক, রূপে সে না হোক অনুপমা,
কথাতে না থাক্ তার ভদ্রতার যতিচিহ্ন কমা।
সব কাজ সাঙ্গ হলে জয়ী করে মৌন অহংকারে।
যে-চিত্র এখনো কেউ আঁকেনি কথার তুলিকায়,
যে-মুখ দেখেনি শিল্পী— তাই শূন্য আজো চিত্রপট,
পৃথিবীর দূর্বাদলে পড়েনি যে চিহ্ন, পটভূমি
তারি স্পর্শে আমি আঁকব। তুমি রবে যে-যবনিকায়
সেখানে যে ছবি দেখবে কাগজে তোমার, অকপট
মৃত্যুর গভীর মুখ এঁকে গেছি কার জানবে তুমি।

স্বগত

বটকৃষ্ণ দাস

সমুদ্র যেন যামিনী রায়ের পট,
রঙে ও রেখায় অপরূপ ব্যঞ্জনা :
রুখু-রুখু চুলে অনাদিকালের জট,
যেন কোনোদিন বিনুনি হয়নি বোনা,
রভসে গোঙায়, আহা, বিরহিণী নারী !

মনোভার বুঝি বইতে পারে না দেহ,
দুঃসহ পীড়া প্রবাহিত ধমনীতে,
স্তনযুগে তার বেদনামথিত স্নেহ,
বিগলিত ধারা উদরের ত্রিবলীতে,
বাহুভুজে প্রেম দিগন্ত-সঞ্চারী।

সমুদ্র, আমি সুদূর মফঃস্বলে
দুঃখিত এক অন্ধগলিতে থাকি :
শিক্ষকতায় কোনোমতে দিন চলে,
অবসরে দেশী-বিদেশী কবিকে ডাকি,
একযোগে কোনো দূরান্তে দিই পাড়ি।

পাড়ায় পাড়ায় লোনা হাওয়া এসে ডাকে-
সমুদ্র, তাই তোমার কাছেই আসি ;
কিছু পাই, কিছু ভাবনায় মিশে থাকে,
কিছু দিই তার হাতে যাকে ভালোবাসি,
কিছু কেড়ে নেয় জীবনের বালিয়াড়ি ॥

পরস্পর

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

কয়েকটি আবছা মুখ, আলোর তরঙ্গ চতুর্দিকে
তরঙ্গিত প্রতিঘাতে চূর্ণ করে প্রতিটি দর্পণ,
সুসজ্জিত কক্ষে মৃত্যু কম্পমান, সংহত শোভন ;
নির্জনে নিহত করে অন্ধকার একান্ত সঙ্গীকে।

দেয়ালে বিচিত্রবর্ণ চিত্ররাশি, সাজানো ঘরের
প্রকাশ্যে বিভিন্ন দৃশ্য, মাংসপিণ্ড, অংশত শরীর।
রেডিয়ো, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ফুলদানী, নগরীর
বহুমূল্য আসবাব, প্রসাধন, বিভিন্ন স্তরের
চাটুবৃত্তি, তোষামোদ, প্রবঞ্চিত প্রাণের উল্লাসে
সমার্থক শব্দপুঞ্জে একই কেন্দ্রে ঘন হয়ে আসে।

যদিচ নিহিত অর্থে এই স্বপ্নরাজ্যে অধীশ্বর
আমি নই, কারণ তা অসঙ্গত, অতি নাটকীয় :
তবুও লৌকিক রূপে উক্ত দৃশ্যপুঞ্জ পরস্পর
সংঘাতে আমারই স্নায়ু ক্লান্ত করে ; এবং যদিও
আলোচ্য সংলাপ কিংবা দৃশ্যাংশের মধ্যে বারংবার
আমারই রক্তের স্রোত ঢেলে দেয় নগ্ন অন্ধকার।

তথাপি এ রক্তবর্ণ কক্ষে শুয়ে আছি সারাক্ষণ
কয়েকটি প্রতীকী মুখ, অবসন্ন শরীর ক-জন ;
দুর্যোগ ক্রমশ বাড়ে— দেহের মনের নানা দাবি
বর্ণনীয়, তবু জানি এ বর্ণনা নিরর্থ, কেতাবী।

আলোর আড়াল থেকে সরে আসি। অন্ধকার মুখ
তরঙ্গের উপকূলে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের রং
স্পর্শ করে। শোণিতের অভ্যন্তরে অদৃশ্য অসুখ

কোনো ধ্রুব প্রত্যয়কে প্রতিভাত করে না, বরং
আমারই দ্বিতীয় সত্তা গোধূলির তিমিরাভিসারে
রক্তাক্ত স্মৃতির কক্ষে ফিরে আসে বিভিন্ন আকারে

সেই স্তব্ধ গাঢ়তম নির্বিকল্প পাথরের স্তূপ
বুকে নিয়ে শুয়ে আছি নির্ভেজাল মূর্খ, প্রতারক ;
চতুর্দিকে বস্তুপুঞ্জ আলোকিত আশ্বাসে নিশ্চুপ
স্বয়ং আমিই তার স্রষ্টা, দ্রষ্টা, পালক, ঘাতক।

অন্ধকার হয়ে এলে অন্ধকারে ডোবে চারিদিক,
আমার প্রতীক মৃত্যু, কিংবা আমি মৃত্যুর প্রতীক ॥

এ-মল্লার

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মেঘের বুক	বাদল-ভার
সইতে নারে	দুর্নিবার
হিম-অঝোর	ঝরছে আর—
স্তব্ধ ওই	দূর-পাহাড় !
স্তব্ধ আমি	সঙ্গীহীন
এই বাগান	মৌন দিন
মৌন মন	মৌন প্রাণ
মুখর শুধুই	এই বাগান !
পাতায়-পাতায়	কার নাচন ?
নাচে পাতায়	মন-পবন।
কোন্ নারদ	তন্ত্রীহীন
পাতায়-পাতায়	বাজায় বীণ ?
এ-কোন্ সুর ?	এ-মল্লার !
তান কোথায় ?	অন্তরার
নাই ষড়জ—	নাই নিখাদ—
হৃদয়-তলে	কান্না-স্বাদ !
হৃদয়-তলে	এক বাগান,
একটি তরু,	একটি গান,
একটি পাখি,	একটি নীড়,
হৃদয় কাঁদে।	আর পাখির
উদাস-নয়ন।	আর আকাশ
ভস্ম মলিন—	তার উদাস
গণ্ড বেয়ে	অবিশ্রাম
বইছে সুর	বইছে গান !

যাচ্ছে ভেসে
সুরের স্রোতে,
কাঁপছে কেন ?
পাতায়-পাতায়
ঝড়ের বেগ !
থামাও জল !
একটি তরু,
বুক কঁপে

হৃদয়-তলে
কোন্ পাখির ?—
মেঘের বুক
সইতে নারে।
হিম-অঝোর
স্তব্ধ ওই

সৃষ্টি তার
দূর-পাহাড়
কাঁপছে গাছ—
প্রলয় নাচ !
ঝড়ের বেগ !
কাটাও মেঘ।
একটি নীড়,
মোর পাখির।

বুক কাঁপে
মেঘ ডাকে !
বাদল-ভার
দুর্নিবার
ঝরছে আর—
দূর-পাহাড় !

তিমিরান্তক

অমলেশ ভট্টাচার্য

অন্ধকারের শান্তরস দিয়ে তৃষ্ণার ভৃঙ্গার
পূর্ণ করতে না পেরে ব্যর্থকাম আমি
আলো দিয়ে দাহ করি মধ্যরাত্রির স্তব্ধতাকে।
একদিন শেষরাতে
নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর মত ক্ষৌমবাস প'রে
লোভের বৃন্তে আঁকা রূপসী রেখার
জাদুকরী চিহ্নগুলি মুছে
বীতশোক হাওয়ার কাছে অভয়-ভিক্ষা মাগি।
অনেক লালিত ইচ্ছা তুয়ার ধ'রে কাঁদে—
শব্দের শরীর থেকে অর্থের আলো নিভে গিয়ে
পটভূমি নিথর নির্বেদ।—
অনেক কান্নার জল উদ্গত স্তাবকে
নিভৃত মিনতিভরা চোখে তাকিয়ে থাকে।
আমার বিপন্ন রক্তে এক সময়
তাদের অশান্ত পদশব্দ থামে।—
তার পর
প্রপিতামহের চলমান পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে
মৃত্যুর রক্তপদ্ম রহস্যের সীমা পার হয়ে
দাঁড়াই আলোকিত উৎসের সম্মুখে।

গাড়ি চলে

সলিল মিত্র

প্লাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে, এখনি সে যাবে দূরে চলে
একটি নিশ্চিত সত্য, সীমা তার আগেই চিহ্নিত—
তুমি-আমি যাত্রী তার, কতক্ষণ ? কত আর পথ !
চলমান এ জীবনে আমাদেরও গণ্ডি যে সীমিত।
পরিমিত সময়েই তুমি-আমি মুখোমুখি, আর
তার পর কে কোথায় ? জীবনের জিজ্ঞাসা অপার।

গাড়ি চলে, ধোঁয়া ওড়ে—অনন্ত চিন্তার মত ধোঁয়া,
আকাশের পথ ধরে অনন্তেই হচ্ছে সে উধাও,
স্মৃতির ছায়ার মত আকাশেও থেকে যায় ছাপ,
গাড়ি চলে গেলে পর ক্রমশ মিলিয়ে আসে তাও !
গাড়ি চলে দূরে-দূরে ; তবু সেই দূরের ঠিকানা
যাত্রী যারা তুমি-আমি তাও তো নিশ্চিত আছে জানা।

সময়ের পরিধিতে গাড়ি চলে, চলি তুমি-আমি
আরো যারা চলে তারা ধৈর্য আর স্থির সংযম
-পরীক্ষার পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ তখনই সেথা গেলে
যেখানে ঠিকানা মেলে, আর মেলে প্রাপ্তি ও পরম !
গাড়ি চলে, বাঁশি বাজে, ধোঁয়া ওড়ে ; আমরা যাত্রী শুধু
সমুখে জিজ্ঞাসা কত, পিছনে অস্তিত্ব মরু-ধূধূ।

রাত্রির বয়স

বিনয় হাজরা

এইখানে চোখ রাখো, দেখ নীল-নির্জন আকাশে
সূর্য নেই ; রঙীন-ছলনা দেখে হে তরুণ পাখি
আর ডানা মেলো না, মেলো না ; সব নীল মুছে আসে
নৈরাশ্যে-ধূসর দিন শেষ হল (মৃত্যু হল নাকি !),
এইখানে কান পাতো, শোন রাতের বয়স কত
ঝিঁঝিঁ পোকা বলে দেবে ; কান্না তার হঠাৎ যখন
চুপ, বুঝো প্রথম জননী তার কমলার মত
অন্ততর প্রলোভনে শিশুকে থামায় : তার স্তন।

এইখানে হাত রাখো, বোঝো ঘড়ির কাঁটার গতি
দ্রুততর হবে ; স্বস্তির প্রগাঢ় ঘুম থেমে যাবে
এ রাতকে বৃদ্ধ ক'রে দিয়ে, কোনো অসুস্থ-মিনতি
আর এনোনা, এনোনা, এই রাত এখনি ফুরাবে।

যন্ত্রণার জীবনের তৃষিত কামনা চোখে নিয়ে
রাতের কবিতা শেষ, বাসনার মৃতদেহ কত
জমে গেছে, প্রত্যহের প্রাঙ্গন-পসরা সাজিয়ে
অরণ্য-প্রাকৃত দিন ব'সে আছে ঠিক প্রথামত।

আর-এক আকাশ

গোরা

নক্ষত্রের ভীড় নয়
পাণ্ডুর চাঁদের আলো নেই ;
তবু যেন আছে স্নিগ্ধ দ্যুতি।
মাঝরাতে তন্দ্রার আবেশে
যদি কভু উঁকি দাও—
গবাক্ষের আবরণ নিমেষে উধাও,
চোখে পড়ে নতুন আকাশ।

সে আকাশে ভীড় নেই
নক্ষত্রেরা কানাকানি করে না সেথায়
সে আকাশ জুড়ে শুধু—
দুটি সন্ধ্যাতারা— বিষণ্ণ, করুণ।
অবিন্যস্ত কেশপাশে
মসী-লিপ্ত সে আকাশে
চাঁদ নেই ; তবুও উজ্জ্বল,
বিক্ষিপ্ত অলকদামে
বন্দী এক আবছায়া মুখ।
প্রভাতের কঠোর কুঠার
রক্তাক্ত করে না কভু
এ আকাশ ; এ আকাশ
একান্ত আমার।

প্রথম প্রহর

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

এ তো তার মৃত্যু নয়। তাহলে যে স্নেহ মায়া প্রেম
সব-কিছু মিথ্যে হত।— এই বলে বিষণ্ণ আঁধার
স্তব্ধ হল। শোনা গেল বাতাসের বুকের স্পন্দন :
রাত্রিচর মানুষের মুছে-যাওয়া এপার-ওপার।

সে এখন দূরতম নক্ষত্রের স্থিরপ্রভ স্বপ্নের বিষয়
এ পৃথিবী কোনোদিন তার শ্বাসে অধীর হবে না,
এ আঁধার কাঁপবেনা আর তার চুড়ির ঝংকারে,
চোখের বিদ্যুতে তার রাত্রি আর উজ্জ্বল হবে না।

এটা নাকি জন্মান্তর। মৃত্যু নয়, মৃত্যু নেই তার
শাখান্তরে উড়ে গেল টুনটুনি আলোর প্রত্যাশী,
ভিখারীর রূপান্তর— পঙ্গু ছেড়ে অন্ধ সে এখন
দার্শনিক চোখ চেয়ে চিনে নেয় দাতা ও বিশ্বাসী।

প্রথম ট্রামের শব্দে ঘুম ভেঙে ভয়ার্ত পথিক
বুঝেছে সে অনিকেত, অপগত রাত্রি এ শহরে,
ভোরের আলোকবিদ্ধ প্রার্থনাকে চেপে রাখে বুকে—
সেই অনুভূতিটুকু যদি ফেরে প্রথম প্রহরে।

দ্বিজ

শোভন সোম

অবিনয়

গোলাপ তুলতে যেওনা, গোলাপে কাঁটা
বাগানে তো আরো বহুবিধ ফুল আছে
তবুও তোমার কেবল গোলাপে রুচি!
তুলতে চেওনা, আঙুলে বিঁধবে কাঁটা
রক্তের লাল পাপড়িরা নেবে শুষে,
কেন অকারণ যন্ত্রণা আনো ডেকে!
গোলাপ ছুঁয়োনো, গোলাপে তীক্ষ্ণ কাঁটা
বাগানে তো আরো নানাবিধ ফুল আছে—
যা বারণ করি তাতে কেন মন টানে!

বিরহিণী

তুই সেই পদাবলী কীর্তনের বিশ্রুত আখর
সন্ধ্যার বাতাসে
অশ্রুত বাঁশির স্বরে নিঃসঙ্গ উদাস
ফুরায় আকুল লগ্ন। কিশলয়-শেজে
অভিমানে ছিন্ন-দল নীলরুচি পদ্মের হৃদয়
তরঙ্গে তরঙ্গে, হায়, ভ্রম আনে কুটিল যমুনা।
কল্পরূপে সমর্পিতা অঙ্গে তোর বিফল লাবণি।
চন্দনের গন্ধে নেশা।
কোথায় স-রূপ অন্ধকারে
বিদ্যুৎ-প্রভার মত উদ্ভাসিত নীলকান্ত-প্রেম!

চতুরঙ্গ

গৌরী চৌধুরী

বেত্রবতীর তীর হতে আজ
হঠাৎ এসেছে লিপি
জলকেলি রেখে ভাবতে বসেছে
মিসৌরি-মিসিসিপি।

২

আবছায়া কোন্ কল্পলোকের সুপ্ততারার স্বপ্নমাঝে
নিত্যকালের সুরবিহারীর বংশী বাজে বংশী বাজে।
ছড়ায় দিকে দিগন্তরে সব-ভোলানো বেদনা তার
আত্মহারা পৃথ্বীবধূর ঘোমটা খসে বারংবার।

৩

বলি শোন্ ফুলের ফসল বুনতে গিয়ে
পড়ল ঘাড়ে ঝক্কি কার ?
অথচ সুধাচুরির ব্যবসা কেমন
চলছে মধুমক্ষিকার।

৪

হঠাৎ কখন কিসের ছোঁয়ায়
বদলে যে যায় মনের রঙ
আকাশ জুড়ে বাজতে থাকে
সারেঙ্গী কি জলতরঙ।

যে মুহূর্তে

ভানু চট্টোপাধ্যায়

যে মুহূর্তে উড়ে যাবে, হাওয়ার পালকে,
সহস্রাক্ষ কামনার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের কঙ্কন
হৃদয়ের প্রতি কক্ষ কবোষ্ণ ঝলকে
শরাঘাতে বিদ্ধ হলে, মুক্তক্লেদ, আরেক জীবন।

মঞ্চালোকে সম্রাজ্ঞীর নকল শরীর
আয়ত্ত বক্তব্য ছোঁড়ে দর্শকের চোখে ;
আমরাও ফিরে যাই সহাস্য বদনে খসে-পড়া
উল্কার আভা নিয়ে প্রগল্‌ভ ধ্বনির নির্মোকে।
এইবার এসে দ্যাখো একান্ত গোপনে
সম্রাজ্ঞী দিয়েছে খুলে ক্ষণিকের রূপের পসার
মনে-প্রাণে হয়ে গেছে সহজিয়া রক্তিম যুবতী—
বিগত স্মৃতির কূলে যন্ত্রণার ছায়া
মেপে মেপে চলবে দূরে, দূরান্তরে

ঘুমন্ত

বিনোদ বেরা

জানলার ফাঁক দিয়ে নরম অশত্থপাতা-রোদ
পড়েছে সীতার মুখে : ঘুমন্ত দুচোখ শিরশির
করে উঠছে মাঝে মাঝে, দক্ষিণ-হাওয়ার সরোদ
সারা রাত ছিটিয়েছে নীল লাল ঘুমের শিশির।

উদ্ধত বর্ত্তুল বুক নিশ্বাসের আসা ও যাওয়ায়
এক-একটু কাঁপছে ; আর সারা শরীরের ভাঁজে ভাঁজে
জমেছে নিটোল মুক্তো-স্বেদবিন্দু ক্লান্তি-কুয়াশায়
মসৃণ লাবণ্য বেয়ে ঝরে পড়ছে শয্যার সবুজে।

রজনীগন্ধার মত ঘুমন্ত সীতাকে মনে হয়
স্নিগ্ধ বিছানায় শুয়ে সকালের হীরে-গুঁড়ো রোদে
করুণ বিষণ্ণ আত্মসমর্পণে সীতার হৃদয
মগ্ন হয়ে আছে যেন অন্তহীন জীবনের বোধে।

সীতার কোমল মন অপরূপ আলোর চুমায়
রেশমী স্বপ্নের ওড়না গায়ে দিয়ে অঘোরে ঘুমায় ॥

আকাশের আর্তি

অনিরুদ্ধ চৌধুরী

শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ ?
রাত-রাত-শুধু রাত। শান্ত নীল
গহন আঁধার ; মায়াবিনী খুঁজে মরে
বাতাসে বাতাসে ; ক্লান্ত সুরে পাখা ঝটপট করে।
শালিকের দল তবে বট আর অশথের ডালে
ঘুমের কাকলি ছায় সবুজ ঘাসের কার্পেটে।
রাত শুধু গাঢ় নীল, অন্ধকার আকাশ—
আর ; দিগন্ত জুড়ে তারাদের চুমকি জ্বলে
গায় গায়। লক্ষ তারা উদাস আকাশে।
সে আকাশ নীলে নীল।

প্রহরের শেষ দ্বারে, রাতের আঁধারে,
ঠোঁটে হাসি মুখে কথা নিয়ে দেখা দেয়
কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ। দূর আকাশের গায়।
হোগলা আর সুপুরির বনে
রাতের প্রহর জানায় রক্তলোলুপ শেয়ালের দল।
ভোর রাত শান্ত নীল, ভিজে আকাশে—
শুধু ; শুকতারা একা জেগে থাকে।
তার পর ?
সেও যায় নিভে আকাশের গায়
ভোরের আলোয়। তখনো কি কাঁদে
আকাশ—শূন্য মনে, ভোরের বাতাসে ?

যন্ত্রণা

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

যন্ত্রণা ! এক অবুঝ যন্ত্রণা !
শবরীর প্রতীক্ষার মত অনন্ত,
চঞ্চল করুণ এ আর্তনাদ ;
চোখের জল বোঝে না তো তাকে,
বোঝে না তার আবেগের কথা ;
ধূসর স্মৃতির আবেশ-রাখা
কোমল ইতিহাস এ তো নয় !
যন্ত্রণা ! এক অবুঝ যন্ত্রণা !

কবে সবুজ প্রান্তর হাসবে,
কবে যে উন্মত্ত একটি রাত্রি
গর্জন করে উঠবে বারে বারে
দীনহীন ছোট এ আঙ্গিনায় !
কবে ভাঙা-জানালার পাশে
ভেসে আসবে উদাস সে গন্ধ
কবে নিঃশেষে উজাড় করবে
ফুল বাতাসের নীরব চলায় !
মরমের কোণে একটি ক্রন্দন—
যন্ত্রণা ! এক অবুঝ যন্ত্রণা !

স্বভাবকবি

[স্বভাবকবি সম্বন্ধে বিশ্বাস আমাদের অস্বাভাবিকভাবে কমেছে। এখানে আমরা একজন স্বভাবকবিকে উপস্থিত করছি।

শন্তিনিকেতন থেকে শ্রীক্ষিতীশ রায় একটি কবিতা পাঠিয়েছেন— বীরভূম জেলার তাঁতিপাড়া গ্রামের স্বভাবকবি সুবলচন্দ্র সেনের কবিতা। আধুনিক কবিতায় যাঁরা আধুনিকতার উপর বেশি জোর দিয়ে থাকেন তাঁদের কাছে কবিতাটির বিশেষ দাম হবে না। ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস আধুনিকতার দাস না হয়েও কাব্যামোদীদের ক্রীতদাস করেছেন। সুবলচন্দ্র সম্বন্ধে অতটা বলার ইচ্ছে নেই, কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য সম্ভবত দেওয়া যায় যে, যাকে আমরা সাধারণত অশিক্ষিত বলি সেই রকম অশিক্ষিত একজন গ্রামবাসী দেশের ও দশের কথা চিন্তা করেছেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তির মতই। সংবাদপত্রের কল্যাণে পৃথিবীর যাবতীয় সমাচার এখন গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছচ্ছে, গ্রামের মানুষও তাই এখন হয়তো আর তিমিরাচ্ছন্ন নেই।

আর-একটি কথা। শহরের মানুষেরা এখন গ্রাম সম্বন্ধে ক্রমে কৌতূহলী হচ্ছেন। 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' বলে মধুসূদন বঙ্গভাষার স্তুতি করেছেন, ঐ ছত্র দিয়েই আমরা গ্রামবাংলারও স্তুতি করতে পারি। দেশের ঐশ্বর্য গ্রামেই, সে ঐশ্বর্য আমরা যদি আহরণ করতে পারি তবে তাতে লোকসান নেই। সম্প্রতি বাংলার কবিয়ালদের বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে সেখানে কবির লড়াই হয়েছে— বোম্বাইবাসীরা এতে নাকি খুব আনন্দ পেয়েছেন। সেই খবর রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছনোর পর সেখানেও নাকি কৌতূহল জেগে উঠেছে।

কিন্তু কবিওয়াল নয়— কবি। আমরা কবির কথা বলছি। স্বভাবকবি সুবলচন্দ্র সেন সম্বন্ধে বছর-এগারো আগে একটি বিবরণ প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় (১১ চৈত্র ১৩৫৬, ২৫ মার্চ ১৯৫০); 'পরিক্রমা' শীর্ষক সেই রচনায় শ্রীবাণীবিনোদ সেনগুপ্ত লিখেছেন—

আমরা জনা আশি বিনয়ভবন শিক্ষণ শিক্ষা [শান্তিনিকেতন] বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী জানুয়ারীর গোড়ার দিকে পরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম। পশ্চিম বীরভূমে দশদিনব্যাপী সফর।...

পরদিন সকালবেলা দুবরাজপুর যাবার পালা। ক্যাম্প গুটিয়ে, বিছানাপত্র বেঁধেছেঁদে রওনা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় আমাদের দেখা-শোনা-তদ্বিরাদি করেছিলেন যাঁরা, বিদায় নিতে এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন একজন কলকাতার ডাক্তার। নামকরা প্যাথলজিস্ট ইনি, বৎসরান্তে তিন মাসের ছুটি নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো এঁর অভ্যাস।...

ডাক্তারের সঙ্গে তাঁতিপাড়ায় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিল। আলোচনা শেষ হবার মুখে উনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "তাঁতিপাড়ার কবিকে দেখেননি আপনারা?" ডাক্তার এই অঞ্চলে একাধিকবার এসে থেকেছেন, এখানকার সকলের সঙ্গে ওর যেন আত্মীয়সম্বন্ধ, কেউ দাদা, কেউ ভাই। সঙ্গের স্থানীয় টোলের একটি ছাত্রকে তিনি বলে দিলেন, "যাও তো ভাই, আলে আলে চলে যাও তাঁতিপাড়া। আমার নাম করে কবিকে ধরে আনো। বেশি তো দূর নয়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়তে পারবে।" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা হয় না। কবির দেশের লোক আপনারা, এখানকার কবিকে না দেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হয় না।"

একদল ইতিপূর্বেই রওনা হয়ে গেছে; আমরা মুষ্টিমেয় যে কজন ছিলাম, থেকে গেলাম কবি-সন্দর্শনের প্রত্যাশায়। ডাক্তার কবির যে পরিচয় দিলেন তা থেকে মোটামুটি জ্ঞাতব্য হল এই— কবির নাম সুবলচন্দ্র সেন, জাতি ময়রা, লেখাপড়া নিম্নপ্রাইমারির গণ্ডি পেরয় নি। বয়স চল্লিশের অনধিক হবে। বাল্মীকির বেলা শোক থেকে শ্লোকের উদ্ভব হয়েছিল, কবির বেলাও তাই। মন্বন্তরের সময় তাঁর একটি ছেলে মারা যায়, স্ত্রীবিয়োগ হয় তার পরের বছর। পাঁচটি মা-মরা সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করতে হয়। এই স্ত্রীও মারা যায় বছর-দুয়ের মধ্যে। উপর্যুপরি তিন-তিনবার মৃত্যুশোক সুবলচন্দ্রের সুপ্ত কবিপ্রতিভার উৎস খুলে দেয়।

কবিপরিচয় শেষ হতে-না-হতেই কবি স্বয়ং দেখা দিলেন। বেঁটে-খাটো শ্যামলা রঙের মানুষটি, আধ-ময়লা জামার উপর একটা সবুজ রঙের পশমের গেঞ্জি, পরনে ফের্তা দেওয়া ধুতি। ডাক্তার সম্ভাষণ করলেন, "এই যে ক্ষ্যাপা এসেছে। দেখ, তোমার কবিতা শোনার জন্যে এঁরা-সব বসে আছেন— খাস কবির দেশের লোক এঁরা।" কবি দু হাত মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, "এঁরা বিশ্বগুরু বিশ্বকবির শিষ্য, এঁদের কাছে মূর্খ আমি কি কবিতা বলব।" অশথ গাছের তলায় শতরঞ্জি পাতা ছিল, সেখানে কবিকে আমরা সমাদর করে বসালাম। কবিতার খাতা খুলে সুবলচন্দ্র আবৃত্তি করলেন।···

সুবলচন্দ্রের আবৃত্তি করা অনেকগুলি কবিতা উক্ত রচনার সঙ্গে পত্রস্থ আছে। — সু. রা.]

মিলনেরই চিরজয়

সুবলচন্দ্র সেন

আজি বিজয়ার পরে মিলনী বাসরে এসো এসো শুভযাত্রী।
দিবে অনুরাগ হইবে সজাগ কাটাবে অমার রাত্রি ॥
হবে অভিনয় হৃদয়ে হৃদয় বিনিময় দিবে প্রাণ।
রচনা লক্ষ্য জাতির ঐক্য রাখিতে দেশের মান ॥
বাঙালী যে ভালো বাঙলার আলো, নির্ব্বাণ কভু নয়।
মিলিত বাঙালী হবেনা কাঙালী করিবেনা কারে ভয় ॥
মিলনেরই চিরজয় ॥
নিতি নবরবি সুমোহন ছবি পূবে পূবে আলো পায়।
পরে সে তপন মুদিত কিরণ পশ্চিমাচলে যায় ॥
সেই দেশ জাতি আপনা বিস্মৃতি হারালো কি পরিচয়।
আঁধারে বরণ করিয়াছে মন আলোকের বিনিময় ॥
ভেজাল খাবার ভেজালবিচার নিয়েছে ভেজাল সজ্জা।
নিজস্ব যে মান প্রায়ই অবসান এতটুকু নাই লজ্জা ॥

হিংসা পরস্পর পরশ্রীকাতর ভদ্র-ইতরে দ্বন্দ্ব।
আপনার চোখে তাকায়ে না দেখে পর-পর চোখে অন্ধ॥
একদিন যেথা অবনত মাথা উড়িষ্যা-বিহার-বঙ্গ।
আজ আশেপাশে দেশে কি বিদেশে বঙ্গের স্থলে ব্যঙ্গ॥
মুছে দিতে চায় বঙ্গভাষায় জাতীয় নিশান স্মৃতি।
যো হুকুম বলে সেই মেনে চলে, হায় রে বাঙালী জাতি॥
বাঙলার কবি বাঙলার ছবি বাংলার যত আলো।
সে আলো দেখিতে পারে না সে ভূতে, কখনো বাসেনা ভালো॥
মোস্লেম গেল ইংরাজও গেল, ভ্যাংরাজ হলো ভাই।
ইংরেজী আর বাংরেজী সবই ডিগবাজী শিখা চায়॥
নারী অপমান শোণিতের বান পিশাচ-অত্যাচার।
যাহারা রক্ষক প্রকাশ্য ভক্ষক কে করিবে প্রতিকার॥
ভাই-বুকে ছুরি বৌ-বোন চুরি জননী যেখানে নগ্ন।
তারই জ্ঞাতি ভাই স্বার্থনেশায় সৌখীনতায় মগ্ন॥
আর্তি নিবেদন কত বিজ্ঞাপন তবু সুবিচার নাই।
ধামাধরা দলে কিছু নয় বলে ধামাচাপা পড়ে তায়॥
তবু জাগরণ হলোনারে মন চোখ মেলে ঘুম ভাঙে না।
নাই কি মানুষ উড়ন্ত ফানুশ মানুষের ব্যথা বোঝে না॥
শ্রীচৈতন্য-দেশে চেতনাবিশেষে জাতির কল্যাণ চাও।
আপনার ভাইয়ে প্রীতিমধু দিয়ে আপন করিয়া নাও॥
গোরার আদর্শে সত্য প্রেমাবেশে সবারে বাঁধিতে হবে।
মিলিত শক্তিতে মিলিত যুক্তিতে শঙ্কাও শঙ্কিত ভবে॥
দুষ্ট দুঃশাসনে ক্ষমাহীন প্রাণে চায় ভীম অভিনয়।
দলিত মানব মিলিত হইলে দানবের হবে ক্ষয়॥
মিলনেরই চিরজয়॥

সম্পাদকের কথা

'একটা নতুন তারা উঠল আকাশে, 'একটা নতুন তারা ফুটল। —ফরাসি কবি সঁা জঁ প্যর্স এ-বছর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেলেন।

কিন্তু তারাটা কি সত্যিই নতুন? এর অস্তিত্ব কি এতদিন ছিল না? —ছিল। যে তারাকে একদিন আমরা প্রথম দেখি, যে তারাকে প্রথম চিনি, সে নতুন না; পুরনো অবশ্যই, কিন্তু কত পুরনো তার হিসেব সহজ নয়। কত যুগ আগে তার জন্ম আমরা তা জানিনে; কিন্তু এ কথা জানি যে, তার জন্মাবধি সে বিপুল বেগে তার আলো বিচ্ছুরিত করতে আরম্ভ করেছে চতুর্দিকে। শত লক্ষ আলোকবর্ষের ওপার থেকে সেই আলো ক্রমাগত বিদ্যুৎ-বেগে ছুটতে ছুটতে অবশেষে যখন আমাদের চোখে এসে ধাক্কা দিল তখন আমরা দেখলাম তাকে, অমনি বলে উঠলাম— একটা নতুন তারা ফুটল।

সঁা জঁ প্যর্স তেমনি একটি নতুন তারা। তিনিও তাঁর জন্মাবধি তাঁর প্রতিভার প্রবল আলো বিচ্ছুরণ আরম্ভ করেছেন, কিন্তু সে-আলো অনেকের চোখেই পৌঁছয় নি। এবার নোবেল-কমিটি তাঁকে পুরস্কৃত করে তাঁর আলো আমাদের চোখে পৌঁছে দিলেন। আমরা চমকে তাকালাম তাঁর দিকে।

সব ভালো যার শেষ ভালো। ৭৩ বৎসর বয়সে কবি পরমস্বীকৃতি পেলেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জেনেছি তাতে দেখেছি যে, প্রথম দিকে তিনি সামান্য স্বীকৃতিও পান নি। কিন্তু প্রতিভাবানেরা একটু অদ্ভুত ধরণেরই জীব, তাঁরা সাময়িক স্বীকৃতি বা সামান্য স্বীকৃতির জন্যে কখনো লালায়িত হন না। প্রতিভার ধর্মই এই যে, নিজের দীপ্তি নিজের বুকে পুঁজি করে সে বাস করতে পারে না, তাতে তার জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে; সে দীপ্তি কে দেখল বা না-দেখল সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জীবনের শান্তির ও সান্ত্বনার জন্যে ক্রমাগত আলো বিকিরণ করাই তার রীতি। অনেক তারার আলো তো পৃথিবীতে আজও পৌঁছল না, কিন্তু সেজন্যে তারা আলোক-নিক্ষেপ বন্ধ করেনি, এবং সেজন্যে সেই বিশেষ তারাদের সম্ভবত আক্ষেপ নেই। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ এই— অনেক আলোর দীপ্তি থেকে পৃথিবী বঞ্চিত হয়ে রইল।

সঁা জঁ প্যর্সের জীবন সৈনিকের জীবন। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার জীবন। কর্মীর জীবন। —সুতরাং তাঁর জীবন, আমাদের কাছে, সার্থক কবির জীবন।

সুশীল রায়

কাব্যকথা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

What are you reading my lord ?
Words, Words, Words.—*Hamlet*

কাব্য কাহাকে বলে ? ইহার লক্ষণ কি ? কাব্য সম্বন্ধে সমালোচনার শুরু হইতেই এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা হইয়া আসিতেছে। আমরা সংক্ষেপে প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের কয়েকটি মত লইয়াই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

নানা দিক্ দিয়া কাব্যের স্বরূপ বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন আচার্যগণ কাব্যের যাহা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ— অর্থাৎ বাঙ্ময় রূপ, তাহা লইয়াই প্রধানতঃ সমীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কাব্য যে বাক্ এবং অর্থ— শব্দ ও অর্থ লইয়াই গঠিত, সে-বিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং 'বাগর্থ'ই কাব্যের সর্ববাদিসম্মত রূপ। সেইজন্যই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই বলিয়াছেন—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥

কিন্তু কাব্যের 'বাগর্থ' সাধারণ 'বাগর্থ' হইতে বিলক্ষণ। এবং এইখানেই আচার্যগণের মধ্যে মতভেদের সূত্রপাত দেখা যায়। কেননা, কাব্যের গোচর যে শব্দ ও অর্থ, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ হইবে তাহা তত সুস্পষ্ট নহে। কাব্যে কি শব্দেরই প্রাধান্য, না, অর্থেরই প্রাধান্য ? অথবা শব্দ ও অর্থ তুল্য ভাবেই প্রধান ? কাব্যে শব্দ ও অর্থের এই যে বিশিষ্ট সম্বন্ধ বা সাহিত্য, তাহা লইয়া প্রাচীন ভারতে বিশেষ ভাবে চর্চা হইয়াছিল। আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান মত এইস্থলে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

২

'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'—ভামহ

আচার্য ভামহ দণ্ডী এবং উদ্ভট— ইঁহারা চিরন্তন আলংকারিক রূপে পরিচিত। এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই কাব্য-সমালোচনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন—অতএব ইঁহারা সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্য রূপেও খ্যাত।

ভামহ তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে শব্দ ও অর্থের সাহিত্যকে 'কাব্য' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা বিশেষ কোনও নূতন কথা বলা হইল না। কেননা, শব্দ ও অর্থের কোন্ বিশেষ ধরণের সাহিত্য বা সম্বন্ধ হইতে কাব্যের উৎপত্তি হয়, তাহাই এই লক্ষণে বলা হয় নাই। পরবর্তী একজন টীকাকার শব্দ ও অর্থের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঁচ প্রকার প্রচলিত মতবাদ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

ইহ তাবদ্ বিশিষ্টৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্। তয়োশ্চ
বৈশিষ্ট্যং ধর্মমুখেন ব্যাপারমুখেন ব্যঙ্গ্যমুখেন বেতি এয়ঃ
পক্ষাঃ। আদ্যে অলঙ্কারতো গুণতো বেতি দ্বৈধম্। দ্বিতীয়েঽপি
ভণিতিবৈচিত্র্যেণ ভোগকৃত্ত্বেন বেতি দ্বৈধম্। ইতি
পঞ্চম পক্ষেষু আদ্য উদ্ভটাদিভিরঙ্গীকৃতঃ, দ্বিতীয়ো বামনেন,
তৃতীয়ো বক্রোক্তিজীবিতকারেণ, চতুর্থো ভট্টনায়কেন, পঞ্চম আনন্দবর্ধনেন।

কাব্যগত শব্দ ও অর্থের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ তিন রকমে সম্ভব— প্রথম, শব্দ ও অর্থের কোনও বিশেষ ধর্ম (property)-বশতঃ— সেই বিশেষ ধর্মও আবার অলংকার জাতীয় অথবা গুণজাতীয় হইতে পারে। দ্বিতীয়, শব্দ ও অর্থের কোনও বিশিষ্ট শক্তি বা ব্যাপার (function)-বশতঃ তাহাদের বৈশিষ্ট্য সম্ভব। সেই শক্তিও দুইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে— ভণিতি-বৈচিত্র্য বা উক্তিবৈচিত্র্য অথবা সহৃদয় সামাজিকের ভোগীকৃতি বা আস্বাদ-উদ্বোধনে সামর্থ্য। তৃতীয়, কাব্যের শব্দ ও অর্থ হইতে যে অভিধানিক অর্থ ব্যতীত অভিনব ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ ঘটিয়া থাকে, সেই ব্যঙ্গ্যার্থবশতই কাব্যগোচর শব্দ ও অর্থের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এইভাবে মোট পাঁচটি পক্ষ কল্পনা করা যাইতে পারে এবং উদ্ভট বামন কুণ্ডক ভট্টনায়ক এবং আনন্দবর্ধন ইহারা যথাক্রমে উপরি-বর্ণিত পাঁচটি মতবাদের প্রবর্তক আচার্য রূপে খ্যাত।

৩

যাঁহারা অলংকারকে কাব্যগত শব্দ ও অর্থের বৈশিষ্ট্যসম্পাদক বলিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদই সাধারণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত। বামনাচার্য সেই সুপ্রচলিত মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন— 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ। সৌন্দর্যমলংকারঃ।'—কাব্য অলঙ্কার বশতঃই গ্রহণীয় হইয়া থাকে, এবং সৌন্দর্যই অলংকার।—কিন্তু সৌন্দর্যের লক্ষণ কি? সৌন্দর্য (beauty) এমন

একপ্রকার তত্ত্ব যাহাকে কোনওরূপ সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সৌন্দর্য দেশভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে রুচিভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করে। সৌন্দর্যের কোনও শাশ্বত স্বরূপ নির্দেশ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। তাহাই যদি হয়, তবে সেই সৌন্দর্যসাধন-অলংকারেরও কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য আলংকারিকগণ অলংকার বলিতে শব্দ ও অর্থের কতগুলি বিশেষ ধর্মকে নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন, যেমন শব্দগত সৌন্দর্যহেতু— অনুপ্রাস যমক প্রভৃতি শব্দালংকার, এবং অর্থগত সৌন্দর্যহেতু— উপমা রূপক দীপক প্রভৃতি অর্থালংকার। কিন্তু অলংকারের কোনও নিয়মিত সংখ্যা নাই; কেননা, শব্দ ও অর্থের এই জাতীয় শোভাহেতু ধর্মের ইয়ত্তা নির্ধারণ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই চলে। ভরতাচার্য হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বনাথ পর্যন্ত অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই এ কথা প্রমাণিত হইতে পারে। যাহাই হউক, যাঁহারা অলংকারকেই শব্দ ও অর্থের বৈশিষ্ট্য-সম্পাদক বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা শব্দালংকার ও অর্থালংকার প্রধান বাঙ্‌নির্মিতিকে কাব্য বলিয়া থাকেন— যে রচনায় শব্দালংকার ও অর্থালংকার নাই, তাহাকে তাঁহারা কাব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রভাব দূরপ্রসারী হইয়াছিল এবং বহুক্ষেত্রে অনিষ্টের হেতুও যে হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই মতবাদের প্রভাবেই বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিতের সৃষ্টি হইয়াছিল। কাদম্বরীর একটি অবতরণিকা শ্লোকে বাণভট্ট যে বলিয়াছেন—

> হরন্তি কং নোজ্জ্বলদীপকোপমৈর্ণবৈঃ পবার্থৈরুপপাদিতাঃ কথাঃ
> নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ সুজাতয়ো মহাস্রজশ্চম্পককুড্মলা ইব ॥

ইহা আলংকারিক আচার্যগণের সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুবন্ধুর বাসবদত্তা, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য অলংকারপ্রস্থানের মতবাদের দ্বারা কিভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট সুবিদিত। এই অলংকারই লৌকিক হইতে কাব্যের শব্দ ও অর্থকে পৃথক করিয়া থাকে—সেইজন্য ইহার অপর এক নাম 'বক্রোক্তি'। ভামহ এই বক্রোক্তিকেই কাব্যের অসাধারণ ধর্মরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। পরবর্তী বহু আচার্য তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

কিন্তু অলংকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল। বামনাচার্যের 'কাব্যালংকার সূত্রে' ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। "কাব্য শোভায়াঃ কর্ত্তারো ধর্মাগুণাঃ। তদতিশয় হেতবস্তবলঙ্কারাঃ। পূর্ব্বে নিত্যাঃ।" পরপর এই তিনটি সূত্রে বামনাচার্য অলংকার ও গুণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। গুণসমূহ কাব্যের কতৃর্ধর্ম, অর্থাৎ শব্দগুণ ও অর্থগুণ না থাকিলে কাব্যের কাব্যত্বই সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, অপাততঃ শব্দালংকার ও অর্থালংকার হইতে কিছুটা বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও এবং শব্দ অর্থের সহিত আপেক্ষিক অন্তরঙ্গীতার সূত্রে সম্বন্ধ হইলেও শব্দগুণ বা অর্থগুণের খুব বেশী প্রকারগত বৈলক্ষণ্য নাই। এমন কি, উদ্ভব প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচীন আচার্য গুণ ও অলংকারের মধ্যে ভেদ স্থাপন করিবার প্রয়াসকে উপহাসই করিয়াছেন। কোনও কোনও প্রাচীন টীকাকারের ব্যাখ্যা অনুসারে আচার্য দণ্ডীও গুণ অলংকারের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং গুণবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থই কাব্য এই মতও অলংকারপ্রস্থান হইতে খুব বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য পরবর্তী কালে ধ্বনিকারের আবির্ভাবের পর গুণের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায়—চিরন্তন অলংকারিকগণের সম্মত গুণের ন্যায় ধ্বনিকারের স্বীকৃত গুণত্রয় বহিরঙ্গ 'বন্ধগুণ' মাত্র নহে, উহা অন্তরঙ্গতম আত্মভূত রসেরই গুণ। যাঁহারা বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী প্রভৃতি বিশিষ্ট রীতি বা পদ-রচনা পদ্ধতিকে কাব্যগত শব্দ ও অর্থের বৈশিষ্ট্যের হেতু বলেন, তাঁহাদের মতবাদেও বিশেষ কোনও অভিনবত্ব নাই ; কেননা, শেষ পর্যন্ত শব্দগুণ ও অর্থগুণেই রীতির পর্যবসান। অতএব রীতিবাদিগণের মতের পৃথক বিচার করিবার আপাততঃ কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

কুণ্ডকাচার্যের 'বক্রোক্তিবাদ' (Theory of Oblique Expression)ও প্রকৃতপক্ষে অলংকার-প্রস্থানেরই ব্যাপকতর প্রয়োগ ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাব্যগত শব্দ ও অর্থ লোকপ্রযুক্ত শব্দ ও অর্থ হইতে বিলক্ষণ— কেননা, ইহাতে 'বক্রতা' আছে। কুণ্ডকাচার্যের মতে এই

বক্রতার লক্ষণ—"বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য ভঙ্গী ভণিতিরুচ্যতে"। বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বাক্য প্রয়োগই বক্রতা বা বক্রোক্তি। কুণ্ডক এই বক্রতারও নানারূপ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রধানতঃ এই বক্রতার ছয়টি মূলভেদ; যথা, বর্ণবিন্যাস বক্রত্ব, পদপূর্বার্ধবক্রত্ব, প্রত্যয়বক্রতা, বাক্যবক্রতা, প্রকরণবক্রতা এবং প্রবন্ধবক্রতা। কাব্যগোচর শব্দ ও অর্থের বিশিষ্ট শোভার হেতু অন্বেষণ করিলে আমরা শেষ পর্যন্ত এই ছয় প্রকার 'বক্রতা'র অন্যতম প্রকারকেই হেতুরূপে খুঁজিয়া পাইব—ইহাই কুণ্ডকের মত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহাও ত কাব্যের বহিরঙ্গ চর্চাই হইল। কেন কবি এইসকল বক্রতা আশ্রয় করিয়া থাকেন, এবং এইসকল বক্রতার শেষ পর্যন্ত পর্যবসানই বা কোথায় ঘটে—ইহার উত্তর কি? কুণ্ডাচার্য সে বিষয়ে নীরব। কিন্তু কাব্যের মূল প্রেরণা যে রসসৃষ্টি, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেন আচার্য আনন্দবর্ধন। "কাব্যস্যাত্মা স একার্থ— স্তথা চাদিকবে পুরা। ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ"॥ ধ্বন্যালোকের এই প্রসিদ্ধ কারিকায় রসানুভূতিকেই কাব্যনির্মাণের মূলরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। অবশ্য ইহারও বহু পূর্বে ভরতাচার্য তাঁহার সুবিখ্যাত 'নাট্যশাস্ত্রে'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন—"ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে"। —কিন্তু ভরতের এই নির্দেশ কেবলমাত্র নাট্য বা দৃশ্য কাব্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবং কাব্যের ক্ষেত্রেও যে তাহা সমান ভাবে সত্য তাহা প্রদর্শন করেন আচার্য আনন্দবর্ধন। কিন্তু রসানুভূতি —যাহা কাব্যনির্মাণের বীজ স্বরূপ, সেই ক্ষমতা কবিদের কোথা হইতে আসে? এই সমস্যার কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা নাই। তবে ইহা যে শেষ পর্যন্ত দৈবী শক্তি বা প্রতিভা, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। —"ন হি সর্বো বাল্মীকি ব্যাসঃ কালিদাসো ভট্টেন্দুরাজো বা"। সকল কবিই হোমর নহেন, শেক্‌সপীয়র নহেন, রবীন্দ্রনাথ নহেন। এবং কোনও কারণে, কোনও অবস্থায় কবির সেই দৈবায়ত্ত প্রতিভা-শক্তি যদি সক্রিয় হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে যদি পরিস্পন্দ বা চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তবেই তাহা সার্থক শব্দের আকার পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হয়— তাহাই হয় কাব্য। কেননা রসসৃষ্টি যেমন কবিপ্রতিভার মৌলিক ধর্ম, সেইরূপ তাহার বাঙ্ময় প্রকাশও প্রতিভারই স্বাভাবিক সহজাত লীলা। সেই প্রতিভাই যেমন কবি-

গণের অর্থদর্শন এবং রসাস্বাদন রূপ বিরুদ্ধ কার্যদ্বয় সম্পাদনে সমর্থ—অতএব "দ্বৈজম্বং চক্ষু নির্নিমেষং কবীনাম্" আবার তাহাই যুগপৎ পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী রূপে সূক্ষ্মতম হইতে ইন্দ্রিয়গোচর স্থূল বাক্ শব্দরূপে বিবর্তনের মধ্য দিয়া কাব্যাকারে সর্বজনসমক্ষে প্রকাশমান। এইজন্যই সহৃদয় শিরোমণি অভিনব গুপ্ত পাদাচার্য তাঁহার ধন্যালোকে প্রত্যেক উদ্দ্যোতের ব্যাখ্যায় অন্তিম শ্লোকে সেই প্রতিভারই বন্দনা করিয়াছেন—

১. যদুন্মীলন শক্ত্যৈব বিশ্বমুন্মীলতি ক্ষণাৎ।
স্বাত্মায়তন বিশ্রান্তাং তাং বন্দে প্রতিভাং শিবাম॥
১ম উদ্দ্যোত, লোচন ব্যাখ্যা

২. প্রাজ্ঞ্যং প্রোল্লাসমাত্রং সদ্ভেদেনা স্বত্র্যতে যায়।
বন্দেঽভিনবগুপ্তোঽহং পশ্যন্তীং তামিদং জগৎ॥ ঐ ২য় উদ্দ্যোত

৩. আস্বত্রিতানাং ভেদানাং স্ফুটতা পত্তিদায়িনীম্।
ত্রিলোচনপ্রিয়াং বন্দে মধ্যমাং পরমেশ্বরীম॥ ঐ ৩য় উদ্দ্যোতে

৪. স্ফুটীকৃতার্থ বৈচিত্র্যবহিঃ প্রসরদায়িনীম্।
তুর্য্যাং শক্তিমহং বন্দে প্রত্যক্ষার্থ নিদর্শিনীম্॥ ঐ ৪র্থ উদ্দ্যোত

সুতরাং কবির প্রাতিভ জ্ঞানের মধ্যেই শব্দ ও অর্থ, রসানুভূতি ও বর্ণন-ক্ষমতা সূক্ষ্ম বীজাকারে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যখন কোনও আকস্মিক প্রবল বিক্ষোভ সেই সুপ্তবীজকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলে, তখনই তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বৈখরীরূপ ধারণ করিয়া কাব্যাকারে জন্মলাভ করে। কাশ্মীরীয় শৈব ও শাক্ত আগম-সিদ্ধান্তানুসারে প্রতিভা এবং বাক্— এই দুইটি অভিন্ন তত্ত্ব, এবং সেই বাক্ পরব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র। অতএব সেই পরম-বাক্তত্ত্বের মধ্যে জগতের যাহা-কিছু বিবর্তন—জ্ঞান শব্দ অর্থ, সকলই বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ভর্তৃহরিও এই মতবাদই প্রচার করিয়াছেন তাঁহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে—"একস্যৈবাত্মনো ভেদৌ শব্দার্থাব পৃথক্স্থিতৌ"। এবং ভর্তৃহরি যে শৈব আগমেরই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া এই প্রতিভাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা আধুনিক একজন দার্শনিক মনীষী অতি স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন - "I may take liberty to suggest here that philosophy of grammar built upon the basis of Patanjali's *Mahabhasya* by the great savant, Bhartrihari, was affiliated to the Agama literature akin to the Saiva and Sakta agamas of Kashmir'.

[শেষাংশ ফাল্গুন সংখ্যায়]

ফাঁক নেই

সুদেষ্ণা সরকার

ডুয়ার্সের একটি অখ্যাত অজ্ঞাত চা-বাগান—
পাহাড়ে ঢালু জায়গা নয়,
কিংবা রোমান্টিক স্বপ্নে-ঘেরা পরিবেশও তার নয়—
এই সমতল মাটির সাথেই তার মিল-মিতালি ;
শুধু দূরের কালো শালবনের ওপারে আর উপরে
আকাশের বুকে অনেকখানি পাহাড় দেখা যায়।
এই মাত্র !
স্বল্প তার পরিসর।
বাগানের নামটা বললে যতটা জায়গা বোঝায়
তার চারপাশ ঘিরে কেবল রয়েছে
কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে সবুজ চা-গাছের বিস্তার।
মাঝে মধ্যে রয়েছে উঁচু ডালের শিরীষ গাছগুলো
ছায়া দেবার জন্যে।
তাই সবটা মিলে সবুজ— শুধুই সবুজ।
আর তারই মাঝখানে
অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ফ্যাক্টরী,
ওদের ভাষায় যাকে বলা হয়—গুদাম-ঘর।
এই গুদাম-ঘরই সারা চা-বাগানটার প্রাণকেন্দ্র।
ওর ধস্-ধস্ ঘস্-ঘস্ শব্দটা আর অসহ্য মনে হয় না,
বরং ওটা না থাকলেই যেন
কেমন নির্জীব মনে হয় সারা বাগানটাকে।
এই গুদামের খানিক দূরেই রয়েছে
কোম্পানির দেওয়া বাসাবাড়ি—
সেখানে বাবুরা থাকেন ফ্যামিলি নিয়ে।
এঁরা কেউ বাগান-বাবু, কেউ ডাক্তার,
কেউবা কেরানি ইত্যাদি,

অর্থাৎ এঁরা সবাই ভদ্রসন্তান,
কাজ করেন এই চা-বাগানে।

তার পর থেকে দিগন্ত জুড়ে
আবার সবুজ রঙ, আবার শিরীষ গাছ।
এই বাগানের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলবার মত
চওড়া রাস্তা চলে গেছে শহরের দিকে—
যে-পথ দিয়ে মাল চালান যায়,
আর মাঝে মাঝে
কোম্পানি-বাবুরা আসেন বাগান দেখতে।
এই পথের ধারে বাগানের এক পাশে
রয়েছে বস্তি—
সেখানে থাকে কুলিরা।
সকাল বেলায় দুটো ঘণ্টা বাজে—
কাজের আহ্বান।
কুলি-লাইন থেকে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ
বেরিয়ে আসে।
কুমারীরা চটুল হাসিতে আর প্রগল্‌ভ ভঙ্গিতে
সারা পথটা মাতিয়ে রাখে।
আর একদল পিঠে বাঁধে পাতি তোলবার টুকরি
আর বুকে বাঁধে কাপড় দিয়ে কোলের শিশুদের।
পড়বার ভয় নেই— ওরা এতেই অভ্যস্ত।
বুড়িরা যায় চুনাই-ঘরে
চা-পাতা বাছাই করতে।
বাবুরাও বের হন হেলতে দুলতে স্বকীয় ভঙ্গিমায়।
আর গুদাম-ঘরের কালো চোঙ থেকেও
কালো ধোঁয়া বের হয়—
সেই সাথে
শোনা যায় ধস্‌-ধস্‌ শব্দ।

মধ্যে দুপুরে একবার ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম,
তারপর আবার শুরু—
সন্ধ্যাবেলায় পাঁচটার ঘণ্টায় সেদিনের কাজ শেষ।
আবার মেয়ে-পুরুষ এসে জড়ো হয়
আপিস-ঘরের বারান্দায়, পাতা ওজন করাতে।
এক বাবু নাম ডাকেন আর-এক জন ওজন লেখেন।
তার পর যে-যার ঘরে ফেরে।
কুলিরা ফিরে যায় নিজের ঘরে
হাঁড়িয়া খেয়ে সারাদিনের ক্লান্তি মেটায় ;
আর তাদের ছেলেমেয়েরা
স্তিমিত লণ্ঠনের আলোয়
আগামী কালের পড়া করতে থাকে।
আর বাবুদের বাসাবাড়িতে
গিন্নীরা রান্নাঘরে,
ছেলেমেয়েরা উচ্চৈস্বরে
পড়া করে যায় বিজলি বাতিতে।
বাবুরা গিয়ে ক্লাব-ঘরে জমায়েৎ হন—
রেডিযোতে বিশ্ববার্তা শুনে আর তাস পিটিয়ে
সন্ধ্যাবেলাটাকে কাটিয়ে দেন অনেকক্ষণ ধরে।
তার পর সব নিশুতি— রাত নিঝুম—
আবহাওয়া নিথর।
চা-বাগান আর পানাপুকুর একই জাতের—
একটা ঢিল পড়লে স্পন্দন জাগে,
পানা সরে যায়, কিন্তু খানিক পরে
আবার সব আগের মত।
তখন বর্ষাকাল।
চা-বাগানের মরশুম এই সময়টা।
বৃষ্টিতে চায়ের কচি পাতা গজায় বেশি করে,
আর এতেই তো কোম্পানির বেশি করে লাভ।

তাই থামা নেই—
সারা দিন সারা রাত গুদাম চলেছে একভাবে।
বাগানের লোকদেরও আর ফুরসৎ নেই।
বৃষ্টি পড়ছে।
বাগানবাবু ছাতি মাথায় দিয়ে সব তদারক করছেন।
কুলিরা পুরানো বস্তা গায়ে-মাথায় জড়িয়ে নিয়ে
টপাটপ পাতা তুলে যাচ্ছে।
হঠাৎ কড়্ কড়্ কড়াৎ—
একটা প্রচণ্ড শব্দ হল।
হাসপাতালের চেম্বারে বসে
ডাক্তারবাবু শানিচারিয়ার উল্কীপরা
হাতখানা ধরে নাড়ী পরীক্ষা করছিলেন—
সহসা চকিত হয়ে হাত ছেড়ে দিলেন।
পাশের 'নো অ্যাডমিশন'-মার্কা ঘরেও
সে-আওয়াজ ঢুকেছে।
কম্পাউণ্ডার-বাবুর হাত থেকে
একটা ওষুধের শিশি
পড়ে চুরমার হয়ে গেল।
অপেক্ষমান রোগীগুলো কান ঢাকল হাত দিয়ে।
কে যেন বলল, খানিক দূরে বাগানের মধ্যে
একটা বড় গাছের উপরে বাজ পড়েছে,
আর, একটা বুড়ি অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

কয়েকদিন ধরে
পাতা ঝামরে যেতে যেতে
শেষে গাছটা মরে গেল।
কতগুলো চা-গাছ ঝলসে গিয়েছে—
তারাও বড় গাছটার পথ ধরল।
রইলো শুধু শুকনো কাঠ।

কয়েকদিন পরেই কুলিরা এসে
সেই গাছটা আর চা-গাছগুলো কেটে নিয়ে
মোষের গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে
চালান করে দিল কারো রান্নাঘরের দুয়ারে।

চারধারে সবুজের প্রসার— আর
সেইখানটাতেই শুধু ফাঁকা,
চারধারে মেয়েপুরুষ পাতা তোলে—
পানিওয়ালা, সর্দার, বাগানবাবুর কথায় কথায়
বাগানের সবটা ভরে ওঠে।

সেই জায়গাটই শুধু শূন্য থাকে।

অনেকদিন পরে
আবার গিয়েছিলাম সেখানে।
গিয়ে দেখি, সে-ফাঁকটা আর নেই,
নতুন চায়ের গাছ সেখানে লাগানো হয়েছে-
চা-পাতাগুলো চক্‌চক্‌ করছে।
আর নতুন একটা শিরীষ-গাছ
শাখা দুলিয়ে
গোলাপী রঙের ফুল ঝরাচ্ছে।

পাদপ্রদীপ

অসীম সোম

সংখ্যা মিলিয়ে স্থিতি নির্ধারিত আসনগ্রহণে
মোমাছি-দর্শক সব মধুরসলোভী মন নিয়ে
অপরূপ মুক্তাজন্ম খুঁজি। প্রেক্ষাগারে প্রতীক্ষার
স্বপ্নসাধ— লক্ষ্য বুঝি জ্যোতির্ময় বিরাট আকাশ।

বিচিত্র আলো ও ছায়া জীবনের মুখের উপর:
কখনো রৌদ্রের হাসি, কখনো রাত্রির কলালাপ
নায়িকার মুখে যেন পূর্ণিমার চাঁদের দর্পণে
ভবিষ্যৎ প্রাণের প্রচ্ছায়া। আশা সে অগ্নিসম্ভবা।
কোথাও বা কানাগলি, পচা ফল, সস্তা মদ, আর
ময়লা টাকায় ছয়লাপ; জীবনের অন্তর্জলি।
অবসন্ন রাজপথে ব্যর্থতার ঘাম-ঝরা দেখে
রজনীগন্ধার গুচ্ছ ফুটপাথে নতমুখ বিধবার মত।

পাদপ্রদীপের আলো দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ফেলে
চিন্ময় গভীরে স্পষ্ট জীবনের সমস্ত ঠিকানা:
আনন্দ-বেদনা মূর্ত অর্ধনারীশ্বর,
ঘটনাপ্রবাহ যেন নিদ্রাহীন নদী। পটভূমি
মাটি ও আকাশ। কোথাও বিষুবতাপ, কখনো সুমেরু,
জন্মমৃত্যু— ধ্রুবতারা। রঙ্গালয়ে ঐকতান আহ্নিক নিয়মে!

যবনিকা কম্পমান। যত কুশীলব একে একে
ক্লান্ত পায়ে জীবনের শীর্ণ জানালায়
দাঁড়াবে যে সময়ের প্রশ্নের সম্মুখে—
অতঃপর সংখ্যাবৃদ্ধি পূর্বপুরুষের।

ওপাশে নবীন কুঁড়ি— চোখে তার মধুর বিস্ময়।

কে বলে

হেনা হালদার

কে বলে ওর বুকের মধ্যে তুষের আগুন জ্বলে!
সমবেদনার প্রান্তে এসে সে কি
ঠাঁই পাবেনা সান্ত্বনাময় করুণ করতলে
আমৃত্যু জ্বলবে কি ?
সব দহনের সমাপ্তিতে তার
শান্তি হোক শান্তি হোক কঠিন যন্ত্রণার।

কে বলে তার চোখের মধ্যে অন্ধ-আকাঙ্ক্ষার
কাঁপছে ডানা। তাইতো অমন করে
তাড়িয়ে ফেরে তৃষ্ণাকে তার শঙ্কা বারংবার
অন্তরে-অন্তরে।

সকল বাধা অতিক্রমের পরে
শান্ত হোক শান্ত হোক ছায়া-শীতল ঘরে।

অরুণিমা

সুশান্ত বসু

মাঝে মাঝে বাজে যন্ত্রণা কী যে তীক্ষ্ণ
তীব্র বিষাদ যেন বা নিষাদ, দুঃখ
অপ্রতিরোধ্য সত্যের মত চেতনার সর্বত্র
রেখে যায় তার কী যে সঞ্চয়ী স্বাক্ষর।

রৌদ্রে ছায়ায় পলাশে শিমুলে স্মৃতি,
এখনো কী তোর গোপন ছদ্মনর্ম
দেখব, জানব সন্ধ্যা, সকাল, রাত্রি
নামান্তরে এ দুঃখ আমার শিল্প?

আনম্রনীল আকাশে ব্যাপ্ত শান্তি
একদা যে আমি খুঁজেছি তোমার
আযত চোখের গভীরে
অরুণিমা! কই স্মৃতির ইন্দ্রনীলে
দীর্ঘ আকাশে অপগত সেই শান্তি?

যন্ত্রণা আর বিষাদ এবং দুঃখের
শুদ্ধতাকে যে হয়তো শিল্পে মানি।
অরুণিমা! তবু প্রাত্যহিকের ধুলো—
ছাখো চোখে মুখে এবং ব্যাপ্ত মর্মে।

নূতন খসড়া

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

রঙিন চশমা পরে ঝাঁঝাঁ রোদে টো টো করে ঘুরে
কে যুবক উদাসীন পথভ্রষ্ট হঠাৎ দাঁড়াল···
মুখোশের শোভাযাত্রা চলে যায় কাছ থেকে দূরে ;
বিপুল নিবিড় গাঢ় সূর্যস্নাত মধ্যাহ্নের আলো।

পানের পিকটা এসে পড়ল কার পাঞ্জাবীর গায়ে,
আহা যদি রক্ত হত রক্তচিহ্ন কারো হাতে-পায়ে—
কিংবা এই ক্লান্তিকর দৈনন্দিন তাসের প্রাসাদে
মুহূর্তে আগুন যদি জ্বলে উঠত দাউ-দাউ দাউ-দাউ—
অক্ষয় দমকল তুমি ঘণ্টা নেড়ে যতবারই শান্তি-জল সযত্নে ছেটাও,
জেনে রেখো, অক্ষয় দেশলাই আছে, দাম সস্তা, এবং সুলভ।

চাইছি নতুন কিছু, অন্তত নতুন অনুভব
হঠাৎ আসে না কেন একবার নিমেষের তরে—
দূরের সুখের হাওয়া ঝড় হয়ে বয়ে যাক প্রতি ঘরে ঘরে,
পোষা ময়নার খাঁচা ভেঙে যাক, একোয়েরিয়ম
মেঝেতে ছড়িয়ে দিক রঙিন মাছের দেহ, মূর্ত অনিয়ম
চারিদিকে উল্টোপাল্টা অযত্নপ্রয়াসে
ক্লান্তিকর সময়ের চিহ্ন যেন ভেঙে দিতে আসে—
রঙিন চশমা-পরা যুবকের মাথাভরা উস্কোখুস্কো চুল
ছিল বলে মাথানাড়া বোঝা গেল নাকো তার নিখুঁত নির্ভুল।

অবশ্যই ভাবছিল সে—মায়া কি মালতী রমা শিপ্রাদের নাম
স্বল্পমূল্যে বিক্রি হল ওরা যারা ছিল চির নয়নাভিরাম,
ওদের ঘরের ইচ্ছা, ঘর হবে, হবে সুখ, সম্পদ, বৈভব,
চিরদিনই যুবতীকে ফিরে টানে পুতুলখেলার ম্লান নির্বোধ শৈশব।

এমন কথার মত বহু কথা ভাবতে ভাবতে উদ্‌ভ্রান্ত যুবক
নতুনের আকর্ষণে গিয়েছিল রাস্তার মাঝখানে
চকিতে মৃত্যুর শব্দে রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রযান থামে সেইখানে
রক্তের যৌবনে রাঙা হয়ে গেল সরীসৃপ পথ।

সহস্র যুবক যেন ঐ রক্তচিহ্ন মেখে কাতারে কাতারে এসে
রাস্তায় দাঁড়াল,
অসময়ে কৃষ্ণচূড়া ফোটা ফুলে দেহ ঢেকে
আকাশের দিকে তার শ্রীমুখ বাড়াল।

ছুটি

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

এই বেশ

একদিন লবণপুকুরে
ছায়া ফেলে ডুকুরে ডুকুরে
পা ছড়িয়ে কেঁদেছিল খুব
তারপর দিয়েছিল ডুব।

কি ভেবে রাস্তায় সেঁকে ঘড়ি
দেখে নিলে বিশ্ব খরখরি
সেঁধিয়ে বেরিয়ে রোদ জ্বলা
ধু ধু তাও ফিচেল হরবলা।

এই বেশ দুচোখে পিচুটি
কালা বুড়ি পেয়ে গেল ছুটি ॥

এক যে ছিল

ঠোঁট দুটো তার রোদ্দুর
ঠুকরে যেত ডাঙা
আসত যেত হিরণপুর
এক চোখ তার কানা।

পাখনা দুটো আকাশ
ঠ্যাং দুটো তার শূন্যে
লোকে বলত সাবাস
বাঁচত আমার পুণ্যে।

এক কুনকের মালিক
এই যে ছিল শালিক ॥

অশ্রু

অধীর সরকার

আমার বুকের তাপ বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে ভাসে
পুনরায় জমা হয়, অশ্রু হয় চোখের কোণায়,
বর্ষণমদির রাত্রি আমি যেন ; আমার নিশ্বাসে
যন্ত্রণার তীব্র বেগ অশ্রু হয়ে আমারে ডোবায়।

জানলে না তো মধুমিতা, দেখবে না কি কখনোই তুমি
আমার অশ্রুতে আমি স্নাত হই, স্নিগ্ধ হই, আর
শুষ্ক দীর্ণ প্রাণহীন মরুময় এ হৃদয়ভূমি
আমার অশ্রুতে ভিজে খুঁজে পায় প্রাণের উৎসার।

নবাঙ্কুর জন্ম নেয়, ফুল ফোটে স্তবকে স্তবকে
সুস্নিগ্ধ সৌরভে মেশা হৃদয়ের স্বপ্ন শিহরণ ;
আমি মালা গাঁথি তাই কাঞ্চন-কদম্ব-কুরুবকে
তোমারে পরিয়ে সুখ উদ্বেলিত অশ্রু-আভরণ।

চেয়ে দ্যাখো মধুমিতা, কি এনেছি, বেশি কিছু নয়
সুস্নিগ্ধ-সৌরভে-লীন দুচোখের অশ্রুর সঞ্চয়।

আজও সময়

সমীর সেনগুপ্ত

আকাশ ঘনিয়ে এল জানালায় ক্লান্ত অন্ধকার।
নিঃসঙ্গ পাখির মত সন্ধ্যার হৃদয়
দূরক্লান্ত অরুন্ধতী স্তব্ধ আজো কার প্রতীক্ষায়।
বড় দীর্ঘ পথরেখা, দেবতা, তোমার ক্ষমাকাল
আজো কি অঞ্জলিবদ্ধ, বড় দীর্ঘ তোমার বিকাল।

তোমার বেদনা হয়ে প্রতিদিন অন্ধকার নামে
আমার ঘুমের পারে। আজো রাত্রে দেবদূত থামে,
স্বপ্নের ধ্বনিরা শুভ্র স্তব হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে।
রজনীগন্ধার বুকে আকুল অরণ্য মাথা রাখে
তীরের প্রাচীন বট অকারণে নিঃশ্বাস ওড়ায়।
অক্লেশ ভরানো নীল প্রতিশ্রুতি আজো বহমান
দেবতা, প্রণাম করো, প্রার্থনায় মগ্ন হোক প্রাণ।

অলৌকিক

রবীন্দ্র অধিকারী

চলো-না মেলায়। মজুক মন। ছোট্টছেলের খুশি
চোখ ভ'রে নাও। আপন মনে স্নিগ্ধতাকে পেয়ে
নকশা-কাটা পাতার বাঁশি প্রাণের হাওয়া কাঁপায়
ব্যস্ত মনে হঠাৎ পাওযা রোদ্দুরেতে নেয়ে।

চুড়ির দোকান। বেলোয়ারী সুখ। দু হাত ভরে নাও
রঙীন বাহার ভাঙবে ব'লে ভয় কোরো না কিছু,
মেলার ধূলোয় মিশে দেখো অবাক হওযা যায়
সহজ আলোর স্বচ্ছ স্রোতে হৃদয় নেবে পিছু।

একটু বোসো গাছের তলায়। সবাই হবে স্বজন
কত মানুষ আসবে যাবে তবুও নয় চেনা,
এক খিলি পান মুখে ফেলে রাঙিযে নিযো ঠোঁট
সেই তো পরম এই জীবনে—রাঙা খুশির দেনা।

সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বেলায় ফিরো ঘরে,
ঘরের পথে পড়বে মনে হরবোলা সেই ছেলে
অন্ধ, হাঁড়ি বাঁয়া করে হাতে ঘুঙুর গান
বুকের তলে সব পেয়েছে একটু ছায়া মেলে ॥

আত্মানুসন্ধান

কুমুদ ভট্টাচার্য

তুমি সমগ্রের প্রেমী। আমি ক্ষুদ্র দরিদ্র কৃপণ,
আপন সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সর্বদা আমার বিচরণ।
আমার সমগ্র চেষ্টা সমগ্রকে পায় না কখনো,
বৃত্তটা পুরোই আঁকি— শূন্যতার শেষ নেই কোনো।

বুদ্ধিতে যেটুকু জানি অনুভবে যতটুকু ছুঁই,
ভূমা কি তাকেই বলো? সমগ্র কি শুধু সেটুকুই?
না কি তার বেশি কিছু? সে বেশি— কী বস্তু জানি না সে,
সে কি যার কাছে আসে অনায়াসে আপনিই আসে?

ভূমার ব্যাপ্তির ছবি যা তোমার মনে মনে চেনা,
সেখানে তোমার সঙ্গে হয়তো বা অমিল হবে না।
চেনাই তো সব নয়। চেনাকে একাত্ম ক'রে পাওয়া,
সেখানে কুশলী তুমি। আলোকে তোমার আসা-যাওয়া!
নিতান্ত স্বার্থান্ধ আমি। আপনাকে জানি একেলার।
আমার আকাশে তাই কখনো ঘোচে না অন্ধকার।

অ্যালবাম

বসুমিত্র দত্ত

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, আলগোছে চোখ তুলে দেখি
দরজার পর্দাখানা তুলে ধ'রে পুরনো সাবেকি
হলুদ সিফনে মোড়া অবযব সামনে দাঁড়াল,
ধনুক ভুরুর নীচে গহন চোখের তারা কালো।

এ নারী ছলনা জানি, অকস্মাৎ তবু ছদ্ম কোপে
কটাক্ষ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ে, ধরাশায়ী হল সেই তোপে
মৌনতার দুর্গ মোর। মোমরঙ হাত ধরে বলি—
তোমাকেই ভালবাসি, তুমিই রাতের ভীরু কলি।

মুহূর্তে মাতাল বায়ু দোলা দিল মনের শরীরে
লাল বন, থরথর কৃষ্ণচূড়া পাতাদের ভীড়ে
প্রেমের সোহাগে কাঁপে, অশ্রুমুখী নাযিকার মত
আকাশে লুণ্ঠিত চাঁদ, মেঘ তাকে ঘেরে অবিরত।

এই শয্যা, এই ঘর—আর ওই রমণীর মন,
হৃদয়ের অ্যালবামে এত ছবি জমেছে এখন।

এবার বিদায়

লীলাময় বসু

একবার আকাশের পানে চেয়ে, একবার আমার দিকে
অনেক কথা বলেই তুমি বেরিয়ে গেলে
ঘরের পর্দায় ঝাপট মেরে
কোন্ হরিণীর ভয় নিয়ে— বাইরে।
মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে নামল চটির শব্দ।
মনের রাগ ছড়াতে ছড়াতে যত।

আবার কী-তুমি ফিরে আসবেনা— আমার পৃথিবীতে ?
শুধু একবার এস কল্পিত রাগ দূরে ফেলে
জীবনের সন্ধ্যায়, কোন্ শ্রাবণের রাতে
আমার বিছানার নির্জন কিনারে।
দেহে যখন আমার রোগের মূর্চ্ছনা
আর ছন্দোময় বেদনাতে মুখরিত চারিধার।
আমার বেদনারে লঙ্ঘন করে এসো
বিদায়ের সেই শেষ মুহূর্তের আঁধারে
সেই আচ্ছন্ন বিচ্ছেদ-শোকে
যদি বাড়ে আদিম রোগের যন্ত্রণা—মৃত্যুর দিকে
এগিয়ে যেতে পারি খানিকটা।

হ্যাঁ, এখন তুমি চলে যেতে পারো সসম্মানে,
কারণ স্বর্গের সুন্দর ছবি ফুটেছে-অপরূপ
আমার ধূসর চোখে।
আর পৃথিবীর আঘাতে আত্মা আমার
পেয়েছে মৃত্যুর ঘ্রাণ,
পরীরা ইশারা করে ডেকেছে আমায়।

লিপিমালা

তরুণ ঘোষাল

শরীরের সাথে প্রাণের যতটা বন্ধন,
নয়নের জলে যেটুকু লুকানো ক্রন্দন,
সুবাস যেমন ধমনীতে রাখে চন্দন।
সকলের মাঝে জাগরিত একই স্পন্দন ॥

বাদল-বেলাতে কাজলের ধারে অঞ্জন,
কাকলি-কলায় মুখরিত অভিব্যঞ্জন,
অশরীরী সব সুর-সমারোহে রঞ্জন,
চেতনার রেখা অচেতনে করে ভঞ্জন।

বেণুবন যেন সকাতর-বাণী-ঝঙ্কার,
সাঁওতালী-হাতে জ্যানির্ঘোষ আর টঙ্কার,
লোকমুখে শোনা কত কথা সোনা-লঙ্কার,
সেতারের তারে নিদ্রিত রাগ-ভংখার।

কি আছে ব্যথার শুধু বেশ-পরিচর্যায়,
দুগ্ধধবল ফুলমৃদু ফুলশয্যায়,
প্রোষিত প্রাণের আঁকা যত ছবি লজ্জায়,
উত্তেজনার অন্তঃসলিল মজ্জায়।

ধ'রে নিষেধের অক্ষমালাটি বক্ষে,
খুঁজি লিপিমালা ললাটের, খুঁজি চক্ষে ॥

এক মার্কিন মহিলা কবি

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন হঠাৎ শ্রীমতী এমিলি পক্ নামে একজন মার্কিন মহিলা কবির একটি কবিতাপুস্তক হাতে পড়ল। বইটি শুধু ঝকঝকে-তকতকে নয়, কবিতাগুলিও অনেকটা নূতন ধরণের। আজকের দিনের দ্রুত ধাবমান চিন্তার জগতের সঙ্গে মননের আবহাওয়ার সঙ্গে রচনারীতির সঙ্গে আধুনিক প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে লেখা হলেও এর মধ্যে রোমান্টিক যুগের একটা হারিয়ে-যাওয়া স্বাদগন্ধও আছে। অবশ্য সেকালের উদার ব্যাপ্তি উদাত্ত গভীরতা বা নিবিড় রসাসক্তি নেই যাকে ইংরাজীতে এক কথায় বলা হয় massiveness। কিন্তু তার বদলে ভাষায় আছে ধাতব ঝংকার, যা খন্‌খন্ করে বেজে উঠলেও নিজের বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে রাখে না, অথচ রেখে যায় একটা ক্ষণিকের অকারণ পুলক না হোক, ভাবের রেশ। একজন সমালোচক বলেছেন যে, এই কবিতা-সঞ্চয়নের কতকগুলিতে 'greater than lyrical lines' আছে, যা আমরা পাই ডাইলান টমাসে বা এমিলি ডিকিন্‌সনের লেখায়। কবি সেখানে কথার পর কথা সাজিয়ে বা ছন্দোবদ্ধ করে শুধু কারুশিল্পী বা craftsman নন, একটা শব্দনির্ভর সৌষম্যবোধেরও পরিচয় দেন, যেমন এলিয়টের 'unattended moment' কবির ভাগ্যে মুহূর্তের তন্মাত্র ছাড়িয়ে গভীরতর অনুভূতির সন্ধান দেয়। কিন্তু এই ধরণের কবিতাকে বুঝতে গেলে পড়ার কৌশলটি বেশ আয়ত্ত করতে হয়, যাতে ধ্বনির সাহায্যে কথার ম্যাজিক আপনি ধরা পড়ে।

ভারী ভালো লাগল যে কবিতার বইটি বেরিয়েছে কলকাতারই এক প্রকাশকের দ্বারা। মনে পড়ে আটচল্লিশ বছর আগের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখনও বিশ্ববন্দিত নন। নোবেল লরিয়েটের রাজটিকা তখনও তাঁর প্রশস্ত ললাটে জয়তিলক এঁকে দেয়নি। শিকাগোর একজন তরুণী মহিলা কবি হ্যারিয়েট্ মনরো 'পোয়েট্রি' বলে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা বের করেন— এতে কবিতা লিখতেন কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, এজরা পাউণ্ড, ভ্যাচেল লিণ্ডসে, এডগার লি মাস্টারস প্রভৃতি নাম-করা কবিরা। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির

ছয়টি কবিতা ছাপলেন। সেই প্রথম আমেরিকায় পশ্চিমের জানালা খুলল প্রাচ্যের এক জীবনকবির জন্য। প্রায় ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন ইলিনয়স-আর্বানায়। হারভার্ডে বক্তৃতা দিয়ে তিনি এলেন শিকাগোয়, হ্যারিয়েট্ মনরো ও ভ্যাহ্যান্ মুডী দুই মহিলা কবির আমন্ত্রণে। আমরা পড়ি—

We used to spend evenings around Mrs. Moody's fire listening to the chanting of poems in Bengali or the recitation of their English equivalents and feeling as if we were seated at the feet of some ancient wise man of the East generous in his revealation of beauty.

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়তো হয় না, কিন্তু অরেগন কলেজে পড়া, স্যানফ্রানসিসকোয় মানুষ হওয়া একজন মার্কিন কবি এদেশে এসে কবিতা লিখবেন, শোনাবেন, বই ছাপাবেন, এটা হয়তো প্রকৃতির ঋণশোধের খেয়াল। পারিবারিক দিক থেকে এই কবির সম্পর্ক আমেরিকায় সেই অনমনীয় পিলগ্রিমদের সঙ্গে; তাদেরই সগোত্রা তিনি, যারা জলঝড়-ঝঞ্ঝা বন পাহাড় জঙ্গল মরু প্রান্তর ডিঙিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে বলেছিলেন— আমাদের যাত্রা হল শুরু (go west)। আমরা পড়ি এই কবি ভারতবর্ষে এসেছেন ১৯৫২ সালে এবং কলকাতায় ও দিল্লীতে নীরবে তাঁর কাব্য ও অন্যান্য শিল্পসাধনা করে চলেছেন।

তাঁর কবিতার কয়েকটি ভাবানুবাদ দিই।—

১

আমাদের কাল খণ্ডকালকে নিয়ে
শুধু ছিন্ন-ভিন্ন ক্ষণস্থায়ী
হাওয়ায় উড়ে ভেসে আসা :
সেই ভগ্নাংশগুলিকে আমরা ধরি,
দেখি তারই মধ্য দিয়ে
অকুণ্ঠ হয়ে বীরের মত—
জীবনের ক্ষণে ক্ষণে গাঁথা, পলে পলে আঁকা,
ছোট স্বচ্ছ কথা ও কাহিনীর মালা।

২

গ্রীষ্ম যখন আসবে তখন
থাকব শুয়ে আমি
ঐ শুকনো গাছের আড়ালেতে
নিদাঘতপ্তদিনে,
রংটি হবে ভাজা ভাজা রোদ্দুরেতে পাকা
চুলগুলো হবে ঘাসের আঁটি শুকনো খড়ের মত,
চোখে কিন্তু জ্বলবে আগুন
দুনয়নে জ্বালা
পুড়িয়ে দেবে আকাশকে
বহ্নি-মহোৎসবে।

৩

ও, হো, আমার হাসি পাচ্ছে
আমার হাসি পাচ্ছে
এই কথা ভেবে, আমি যা-তা কি ভাবছি
তুমি যদি, আমি যা ভাবছি তার অর্ধেকও জানতে
তাহলে তুমি হেসে লুটিয়ে পড়তে।

৪

একটি পাগলের দিনপঞ্জী দেখছি—
সে পাগল, কিন্তু শান্ত অনভিজাত
এইখানে এখনই, এই জেলে,
আমি পড়ছি
হিজিবিজি কি সব লেখা, আঁকাবাঁকা
রেখার আর লাইনের জঙ্গল থেকে জ্বলজ্বল করছে
দুটি কথা—
'আমার মা আমায় ভালোবাসতো না';
তারপর খানিকটা পরে,
'কুক্কুরীরা তাদের শাবকদের ফেলে পালায়';

আরো কয়েক পাতা পরে, সাদা নির্লিপ্ততার পর
'আমি আমার বন্ধুর কোট নিয়ে পালিয়েছি,
বরফ পড়ছে নিউইয়র্কে সাদা তূষারস্তূপ,
ভগবান তাঁর মহিমায় সুস্থ থাকুন'
আবার কয়েক পাতা শুধু কালির আঁকড়,
তার পরে লেখা—'জজ সাহেব, আমি একটি গরীব ছেলে'
তারপর—'আমি সবুজ ঘোলা জলে সাঁতার দিই
কালো রং লাগুক আমার পিঠে'
এই তার রেকর্ড, এখানেই শেষ।

৫

এইদিনে কিছু ঘটলনা
কিছুর আরম্ভ না, না কিছুর শেষ।
পেলামনা কোনো জিনিস, দিলামনা কাউকে কিছু,
স্বর্গকে ডেকে স্তবস্তুতি নয়, কারুকে শাপমন্যিও নয়,
কিছু ধারও করলামনা, কাউকে দিলাম না ঋণ,
হারালনা কিছু, দানও দুপয়সা নয়,
উদ্ভাবন বা নতুন কাজও কিছু করলামনা,
এই যে দিনটি
যাকে আমি ডাকিনি, যাকে আমি আবাহন করিনি,
তুচ্ছতাচ্ছিল্যও নয়, বলিনি আমার সংকল্প,
যে এলো অযাচিত, অভাবিত, ভারগ্রস্ত না হয়ে—
তারপর চলে গেল, বোঝা না বয়ে
তার জন্য আমার দুঃখ কিসের ?

নিশাঠাকুরের কড়চা। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরি। ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০।

এপারে ওপারে। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। বীণা লাইব্রেরি। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

কাহিনীকাব্য আজ বিরল। অধিকাংশ কবি লেখেন ক্ষুদ্র গীতিকবিতা। তাই এ কাব্য-দুখানির স্বাদ-বৈচিত্র্য ভালো লাগল।

কিন্তু শুধু তাই নয়। আজকের নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিদেশিয়ানার দিনে এমন ঋজু কবিতা আর দেশের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় নিবিড় তৃপ্তি এনে দিল। অনেকেই তো জাতীয় ঐতিহ্য থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছেন!

কত কালের স্মৃতি-বিজড়িত গীতি-মুখরিত আমাদের পল্লী! তার শেওলা-ঘেরা দীঘির জলে, ছায়ান্ধকার বনে কত রহস্যের ইঙ্গিত। নর-নারীর পূজা-পার্বণে, ধারণায় ও সংস্কারে কত অদ্ভুত কল্পনা! বিচার বিশ্লেষণ বা সংশোধনের মনোভাব নিয়ে নয়, বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে, কবি দেখেছেন এই পল্লীর জীবনকে, নিপুণ ভাবে এঁকেছেন তার ছবি 'নিশাঠাকুরের কড়চা'য়। যে যুগের ছবি তিনি এঁকেছেন, সে যুগ মিলিয়ে গেছে, তবু মনের কোণে লুকিয়ে আছে তার ছায়া। তাই অতীতের স্বপ্নে আজও আকর্ষণ অনুভব করি। পল্লী-গাথার উপযোগী বাগ্‌ভঙ্গী ও গদ্য-মিশ্র ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে এই 'কড়চা'য়।

যেমন দিন থাকলে সূর্য থাকে—চন্দ্র দেখলে চকোর ডাকে,
যেমন সরোবর থাকলে থাকবে মীন—গানের সঙ্গে থাকবে বীণ,
যেমন ফুল থাকলে অলি থাকে—দেবী থাকলে বলি থাকে,
দুধ থাকলে চাঁচি থাকে—কাঁঠাল থাকলে মাছি থাকে,
যেমনি ঘাট থাকলে বাঁশী থাকে—মাঠ থাকলে চাষী থাকে,
—চাষী থাকলেই মহাজনের হাসি থাকে।

বইখানিতে আরও চারটি কবিতা আছে— জঙ্‌লা মাঠ, জামরুল, দেখা ও দর্শন, এক যে ছিল মানুষ। প্রত্যেকটি বহন করে এনেছে হারানো দিনের সুর, আর অনাড়ম্বর শিল্প সৌন্দর্য। গ্রাম-জীবনের সরল হাসি-অশ্রুতে লেগেছে কবিত্বের আভা, উঠেছে তা মনোরম হয়ে।

'এপারে ওপারে' বেহুলার কাহিনী নিয়ে লেখা। পুরোনো হয়েও এ কাহিনী চিরনবীন, জীবন-মরণের চিরন্তন রহস্যে মর্মস্পর্শী। অতি-আধুনিক উন্নাসিকতা নিয়ে কাব্যকার উপেক্ষা করেন নি প্রাচীনকে। যার সঙ্গে বাংলার আপামর সাধারণের দীর্ঘদিনের পরিচয়, তারই গান তিনি রচনা করেছেন নূতন ভাষায়, নূতন ছন্দে।—

> বাসরে মাটির প্রদীপ জ্বলে,
> বেহুলার লাল শঙ্খ— সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলে ;
> অঞ্চল বাঁধি লখাই জাগে ও বেহুলা জাগে ;
> শিয়রে মৃত্যু-নাগিনী জাগে !
> বিধাতা জাগে ?

মৃত্যু এলো, কিন্তু মৃত্যু পরাজিত হল প্রেমের কাছে। কবি বন্দনা গেয়েছেন সেই প্রেমের। সাম্প্রতিক নব নব চেষ্টা ও অপচেষ্টার ভিড় ঠেলে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াতে পারুক বা না পারুক, রসিকজনের অভিনন্দন এ কাব্যদ্বয়ের জন্য সুনিশ্চিত।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
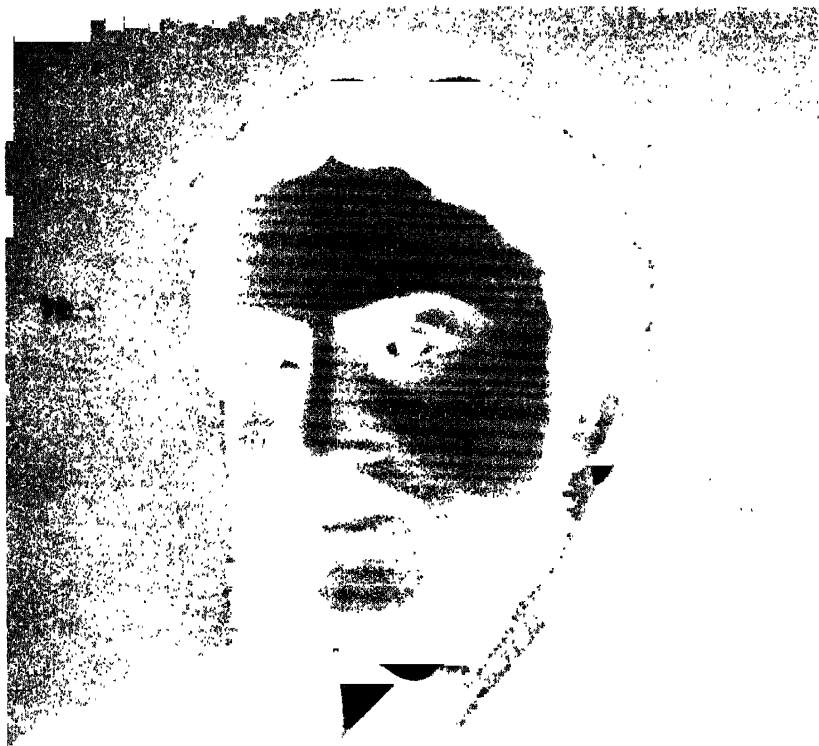
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ মৃত্যু ২৯ জুন ১৮৭৩

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে, একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারি দিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা-দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্‌কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে

চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্র-তীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

—সাহিত্যসৃষ্টি

আষাঢ় ১৩১৪ [১৯০৭]

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময়টাতেই [১৮৭৭] বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম [ভারতী, ১২৮৪ শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন]। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম। —'জীবনস্মৃতি'

বড়দাদা— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)
জ্যোতিদাদা— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

উপমা মধুসূদনস্য

ভবতোষ দত্ত

একটি সুপরিচিত সংস্কৃত প্রবচনে কালিদাসকে বলা হয়েছে, উপমা-রচনার নিপুণ কবি। বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে সেই গৌরব অনায়াসেই দেওয়া যায়। মধুসূদন সম্পর্কে এমন কথা কেউ ভেবেছেন কি না জানি না। কিন্তু যাঁরা মধুসূদনের কাব্য এ দিকে লক্ষ্য রেখে পড়েছেন, তাঁরা জানেন উপমা-যোগে মধুসূদনের কার্পণ্য ছিল না। অবশ্য সেগুলি অব্যর্থ কি না সে বিচার নিশ্চয়ই আলোচনাসাপেক্ষ। মধুসূদনের কাব্যের ভাববিচার এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, স্বীকার করতেই হবে, তাঁর কাব্যের ভাষাশিল্প বা style নিয়ে বিবেচনা সেই পরিমাণেই অকিঞ্চিৎকর। শব্দচয়ন ভাষাপ্রয়োগ উপমা অলংকার -বিচার দ্বারা কবি-ব্যক্তিত্বকে নির্ধারিত করবার এক অভিনব প্রণালী কিছুকাল আগে ইংরেজি সমালোচনায় উদ্‌ভাবিত হয়েছিল। এই প্রণালীতে কবিমানসকে নিশ্চিতরূপে জানা কতটা সার্থক হয় বলা শক্ত হলেও কাব্যদেহ সম্পর্কে যে একটা ধারণা গড়ে উঠবার সম্ভাবনা থাকে তাতে সন্দেহ নেই। কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকে এভাবে বিচার করে দেখা অবশ্যই চলতে পারে এবং এটাও অনুমান করা যায় যে কবিব্যক্তিত্ব যদি অকৃত্রিম হয়ে থাকে, তবে তাঁর ভাষার মধ্যে ফাঁকি না থাকাই সম্ভব।

মেঘনাদবধ অযত্নসিদ্ধ কাব্য নয়। ভাষানির্মাণে কবি সতর্ক ছিলেন, তার প্রমাণ কবির চিঠিপত্রেই ছড়িয়ে আছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে. কাব্য-রচনা করতে তিনি সেকালের লৌকিক ভাষাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নি। মুখের কথা যা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দেখা দিয়েছিল, তাকে যেমন তিনি নিরঙ্কুশভাবে গ্রহণ করেন নি, তেমনি প্রথাবদ্ধ সাহিত্যিক ভাষা—বৈষ্ণব-পদাবলী ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ভাষাও— অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নি। যদিও লোকের মুখে চলিত কথ্যভঙ্গি তাঁর কাব্যে যেমন মাঝেমাঝেই উঁকি দেয়, তেমনি ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক ঐতিহ্যই এখানে-সেখানে দেখা দেয়। তবু এ কথাই ঠিক যে, মধুসূদন তাঁর ভাষার বলিষ্ঠতা রক্ষার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের

দিকেই প্রধানত ফিরেছিলেন। এমন একটা উদাত্ত অনুভূতির স্পর্শ দেওয়া তাঁর কাম্য ছিল, যার প্রকাশ নিশ্চয়ই কবিওয়ালাদের অথবা ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় সম্ভব ছিল না। আবার ভারতচন্দ্রের ভাষা মার্জিত কিন্তু অত্যন্ত প্রথাবদ্ধ। মদনমোহন তর্কালংকার এবং রঙ্গলাল— দুজনেই সে সত্য সপ্রমাণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের ভাষা যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনি অলংকারের আতিশয্যের জন্য বিদ্রূপভাজনও হয়েছে। শরীরের কোন্ অঙ্গের সঙ্গে কিসের তুলনা চলবে, কোন্ ভঙ্গির সঙ্গে প্রাকৃতিক কোন্ দৃশ্যরূপের সাদৃশ্য নির্দেশ শাস্ত্রসম্মত, এসব বিষয়ে চিন্তার আর প্রয়োজন ছিল না। বৈষ্ণব-পদাবলীর কাব্যভাষার উৎকর্ষ সত্ত্বেও এ কথা মানতেই হবে, সে ভাষাও এমনি এক বিশিষ্ট জীবনোপলব্ধিতেই নিঃশেষিত। 'নম্রআননবদনী রাধা' 'তপ্ত ইক্ষুরস চর্বণ' 'হেমকল্পতরু' ইত্যাদি একটা বিশিষ্ট চেতনার বাহন হয়ে অন্য ভাব-কল্পনার ক্ষেত্রে তার প্রযোজ্যতা হারিয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে এর অনুসরণ দেখতে পাই না।

বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয় ভারতচন্দ্রের কাব্য এবং বৈষ্ণব-পদাবলী সম্পূর্ণ পৃথক হলেও দুইই স্থিরতাধর্মী জীবনচেতনার কাব্য। দুই জায়গাতেই উপমা এবং শব্দচয়ন এক ধরণের স্থির অচঞ্চল কল্পনার চিত্রই ফুটিয়ে তোলে। বহিরঙ্গ বিচারেও পদাবলীর পদগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাতে যেমন একটা অচঞ্চল অনুভূতি বা চিত্র নিটোল হয়ে ফোটে তেমনি মঙ্গলকাব্যের এক-একটা নাতিদীর্ঘ ভণিতাযুক্ত সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদেও এক-একটা স্থির চিত্রই ফোটে। এই জন্যই মধ্যযুগের কবিমানসের মত মধ্যযুগের কাব্যকেও মোটামুটি স্থিরতাধর্মীই বলা যায়। কিন্তু যেখানে কল্পনাই গতিধর্মী, রূপ পরিবর্তমান, ক্রিয়া অস্থির বা জীবনোপলব্ধি অপরিতৃপ্ত এবং কবিমানসই অশান্ত উদ্দাম, সেখানে ভাষায় গতিচিত্র আসবেই। উপমেয় যদি গতিব্যঞ্জক হয়, তবে উপমায়ও তাই হবে। আরো একটু প্রসারিত করে বলা যায়, কাব্যের মূল প্রেরণা বা ভাববস্তুটাই যদি গতিধর্মী হয়, তবে ভাষাতেও আসবে গতিধর্ম।

মধুসূদনের অনুপ্রেরক ভাবটাই ছিল এমনি গতিব্যঞ্জক। মানবজীবনের সংশয়-সংগ্রাম আশানৈরাশ্যের ঘূর্ণিপাককে যিনি আমাদের কাব্যে প্রথম স্থান দিলেন, তিনি জীবনকে কোনো স্থির আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে লগ্ন দেখেন নি। নতুন ঘটনায় নতুন অবস্থায় মানুষের মন আবর্তনশীল তো বটেই, সচেতন

ভাবেই প্রবুদ্ধ উদ্যমে তাকে ব্যাপৃত থাকতে হয়। মধুসূদন তাঁর কাব্যে এমনি এক নতুন মানুষের কথা বললেন। তাই তাঁর ছন্দ হল অমিত্রাক্ষর প্রবহমান, উচ্চারণ উচ্চাবচ স্পন্দিত, অলংকার স্বচিন্তিত, উপমান গতিশীল। গতিশীলতার দিক দিয়ে মধুসূদনের সাধর্ম্য ছিল হোমারের সঙ্গে। হোমারের কতকগুলি উৎকৃষ্ট উপমান হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে দাবানল, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝড়। প্রাণিজগৎ থেকে সিংহকে হোমার প্রায় তিরিশ বার উপমান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। মেঘনাদবধের পাঠকেরা জানেন, এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি মধুসূদনের কাব্যে বারবারই এসেছে। এসবই শক্তি এবং গতির দ্যোতক। সূর্য অগ্নি দীপ্তি কিরণ— এই রূপচিত্রগুলির প্রতি কবির যেন পক্ষপাতিত্বই ছিল বলা যায়। আর-এক দিক দিয়েও হোমারকে মধুসূদন অনুসরণ করেছিলেন। হোমারের কাব্য গান গেয়ে শোনানো হত, তাই শ্রোতার চোখের সামনে বর্ণনীয়কে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য উপমানের বর্ণনা অপ্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট সূক্ষ্ম (detailed) ও বিস্তারিত করে দেওয়া হত। মেঘনাদবধ থেকে একটা বর্ণনা উদ্ধার করে দেওয়া যাক—

যথা হেরি দূরে
কপোত বিস্তারি' পাখা ধায় বাজপতি
অম্বরে ; চলিলা রক্ষঃ হেরি রণভূমে। —৭ম সর্গ

ইলিয়াডের বর্ণনা—

Then with the speed of striking hawk who leaves his post high up on a rocky precipice poises and swoops to chase some other birds accoss the plain. Poseidon the Earth-shaker disappeared from their ken.

—ইলিয়ড, ১৩শ সর্গ, অনুবাদ ঈ. ভি. রিউ

বাজপাখি কি ভাবে শিকারের দিকে এগিয়ে যায় তার রেখাচিত্র হোমার নিপুণ সূক্ষ্মতায় বিস্তারিত করেছেন, যদিও এতখানি প্রয়োজন ছিল না। মধুসূদনের এই রীতির একটি দীর্ঘতর দৃষ্টান্ত—

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষশাখে হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর বিষম আঘাতে

ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে। —চতুর্থ সর্গ

এই রীতি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যেমন নেই বাইবেলের প্রাচীনতর অংশেও নেই। কালিদাসের উপমা চিত্রগুণসম্পন্ন এবং সরল। বৈদিক উপমাগুলিও এই ধরণের। রামায়ণের একটি অপূর্ব উপমা—

শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।
বভূব স মহাবাহুর্ব্যাপাস্তগত জীবিতঃ॥

—লঙ্কাকাণ্ড, ৯১ অধ্যায়, ৮৩ শ্লোক

মধুসূদন ঠিক এর অনুবাদ করেছেন

নির্বাণ পাবক যথা কিংবা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি মহাবল রহিলা ভূতলে। —ষষ্ঠ সর্গ

এই উপমাটি পুরোপুরি চিত্রধর্মী এবং শান্তরসাস্পদ। তবু মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ জীবনাবসান উপলক্ষে এই উপমানটি প্রযুক্ত হওয়ায় এর মধ্যে একটা উদ্দীপনার আভাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সারাদিন প্রচণ্ড বিক্রমে রশ্মি বিকিরণ করার পর যে সূর্যরশ্মি সংবরণ করেছে, মেঘনাদ উপমিত হয়েছে তারই সঙ্গে। 'ত্বিষাম্পতি' শব্দটি সেই দিক থেকে সুপ্রযুক্ত, যদিও শব্দটি বাল্মীকি এখানে ব্যবহার না করলেও অন্যত্র ব্যবহার করেছেন। এখানে হোমারের অনুকরণে উপমানকে বিস্তারিত না করে মধুসূদন এক সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। উপমেয়ের স্বর্গমর্ত্যব্যাপী কীর্তি মৃত্যুর দ্বারা সম্বৃত হওয়ায় উপমানকেও সম্বৃত সংক্ষিপ্ত হওয়াই দরকার।

হোমারের ইলিয়াড প্রথম সর্গ থেকেই যুদ্ধ বর্ণনায় পূর্ণ। মধুসূদন নিজেই এর জন্য এক সময় অধীরতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, Homer is full of battles. মধুসূদনের কবি-মন জীবনের এই উদাত্ততায় যেমন ঝংকৃত, তেমনি শান্তি ও করুণার জন্য ব্যাকুলিত। রাম রাবণ মেঘনাদ প্রমীলা চিত্রাঙ্গদা সকলেই ভাবাবেগে অস্থির ; অস্থির নয় শুধু একজন— সীতা। চতুর্থ সর্গের আরম্ভেই কবি সীতাস্মৃতিকে পুণ্য তীর্থভূমির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। ভারতবর্ষে তীর্থ পুণ্যার্থীর স্বপ্ন। এই স্বপ্নের পরিবর্তন নেই। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গকে কবি এক আশ্চর্য সংযম ও শান্তির ধ্রুবতায় বেঁধে দিয়েছেন। এখানকার প্রকৃতি ও জীবন অচঞ্চল সৌন্দর্যে

প্রশান্ত। বৈদেহীর বেদনা জননীর অপরিসীম ক্ষমা ও ধৈর্যে বিগলিত। কবি বলেছেন—

দুরন্ত চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব কৌতুকে
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।

বাস্তবিকই, চতুর্থ সর্গের ভিন্ন সুরে বাঁধা জগৎ থেকে মানবসমাজের সংগ্রাম ও সাফল্য কত দূরে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই সর্গে উপমা রূপকও কত আলাদা হয়ে গিয়েছে। 'তুলসীর মূলে যেন উজলি জ্বলিল' 'গোধূলি-ললাটে আহা তারারত্ন যথা' 'একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি' 'কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ' 'নূতন গগন যেন নবতারাবলী' 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচুড়ে'—এ সবই মেঘনাদবধের উন্মাদনার মধ্যে এক করুণ কোমলতার আভাস ফুটিয়ে তোলে। এই সর্গটাই চিত্রার্পিত। এমনকি সীতাহরণের অংশটিও আলেখ্য-দর্শনের সঙ্গে তুলনীয়। এ বস্তু হোমারের কাব্যে নেই। আমাদের ক্লাসিকাল সংস্কৃত কাব্যের চিত্রধর্মিতার সঙ্গে এর মিল আছে। কিন্তু উপমানগুলির জন্য কবি সংস্কৃত কাব্যের ঋণ নেন নি। আমাদের বাংলাদেশের অনুদ্বেল অনুচ্ছল জীবন ও প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত উপমাগুলি চতুর্থ সর্গের কাব্যসম্পদকে নতুন করে রচনা করেছে। উপমারীতিতে মধুসূদন সাধারণত বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ গ্রীক কবির মতে রেখাসম্পন্ন দৃশ্যাঙ্কনের পক্ষপাতী। বস্তুকে বস্তু দিয়েই ফুটিয়ে তোলেন। বস্তুকে ভাব দিয়ে বা ভাবকে বস্তু দিয়ে ফোটানোর রোমান্টিক ধর্ম তাঁর ছিল না। কিন্তু এখানে মধুসূদন এক ধরণের রোমান্টিক প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের নিত্য পরিচিত গার্হস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই উপমান সংগ্রহ করে নতুন বিস্ময়বোধের দ্বার খুলে দিলেন। সংস্কৃত কাব্য পুরাণ বা আমাদের বাঙালী লোকজীবনের নিকট অপরিচিত এমন উৎসেই শুধু কল্পনাকে নিবদ্ধ রাখলেন না তিনি। বৈষ্ণব-পদাবলী মঙ্গলকাব্য ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গলাল এমন-কি হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রেও এর দৃষ্টান্ত পাই না। একেবারে পাই রবীন্দ্রনাথে। এর বিশেষত্ব এই যে, এগুলি আলংকারিক প্রয়োজনের নয়, সামগ্রিক আবেগেরই লাবণ্য জড়িত।

চতুর্থ সর্গে যেমন প্রাকৃতিক উপমাই বেশি, তেমনি পাঠক লক্ষ্য করবেন

ষষ্ঠ সর্গে হিংস্রতাব্যঞ্জক পশুজীবন থেকে সংগৃহীত উপমার অবিরলতা। উপমান হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সর্প ব্যাঘ্র কিরাত যমচক্ররূপী নক্র যম কলি। ষষ্ঠ সর্গের বিষয় হচ্ছে ইন্দ্রজিতের নিধন। এ-যুদ্ধ ঠিক সমপর্যায়ের নয়। ইন্দ্রজিৎ নিরস্ত্র, পূজারত ; আর লক্ষ্মণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত। সুতরাং একে হত্যাই বলা যায়। কাব্যের কেন্দ্রে আত্মহারা হয়ে কবি এই বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। যথার্থ বীররসাত্মক উপমার পরিবর্তে তাই এখানে এসেছে নিম্নজীবনের হিংস্রতার রূপচিত্র। চতুর্থ সর্গের সঙ্গে তুলনাতেই দেখা যায় এই ছবিগুলি কত গতিশীল। সমস্ত ষষ্ঠ সর্গতেই ঘটনা দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। অবশ্য চতুর্থ সর্গের শান্তি ও মাধুর্যের দ্যোতক— ফুল তারা— এখানেও আছে। লঙ্কার রাজলক্ষ্মীর প্রস্থানভঙ্গির বর্ণনায় কবি বলেছেন

রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে নিশা অবসানে
সুধাকর করজাল রবিকরজালে ! —ষষ্ঠ সর্গ

এই উপমার কোমল মাধুর্যের সঙ্গে মিশে আছে এক করুণ বিষণ্ণতা। এই সর্গের প্রথমে এই রসসৃষ্টিই কবির অভিপ্রেত। তার পরেই তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যে কবি সৃষ্টি করে তুলবেন এক কুটিল ক্রূরতার পরিবেশ।

এই সর্গে কবি একটা চমৎকার শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষ্মণ যখন ইন্দ্রজিৎকে নিহত করতে যাত্রা করবে তখন তার বর্ণনা সত্যি মহিমময়—

রাঘবানুজ সাজিলা হরষে
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী।

সূর্যের সঙ্গে উপমিত হওয়ায় লক্ষ্মণের বীরমূর্তি পাঠকের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লক্ষ্মণ যখন ইন্দ্রজিতের সম্মুখে উপস্থিত, তখন এই উপমাই যেন বাস্তব হয়ে আগাগোড়া এক সংগতি রচনা করল

দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !

লক্ষ্মণের বর্ণনায় কবি যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন, তা কখনো মহিমা-পূর্ণ আবার কখনো ক্রূরতাপূর্ণ। স্পষ্টই বোঝা যায় কবির দ্বিধা কাটে নি। এক দিকে লক্ষ্মণকে বীর ইন্দ্রজিতের যোগ্য করে তুলবার চেষ্টা, আর-এক

দিকে ইন্দ্রজিতের প্রতি অত্যধিক মমতায় লক্ষ্মণের ক্ষুদ্রতা প্রতিপাদন। ইন্দ্রজিৎ যখন নিরুপায় হয়ে অস্ত্রের অভাবে পূজার উপকরণগুলিই লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করল

কিন্তু মায়াময়ী মায়া বাহু প্রসারণে
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান শশকবৃন্দ সুপ্ত সুত হতে
করপদ্মসঞ্চালনে।

এতে লক্ষ্মণের পৌরুষের প্রতি পরোক্ষে কটাক্ষই করা হল। এই উপমাটি কিন্তু ইলিয়াড থেকেই নেওয়া

Athene above all, the Fighting Daughter of Zeus, who took her stand in front and warded off the piercing dart, turning it just a little from the flesh, like a mother driving a fly away from her gently sleeping child.

—অনুবাদ ঈ. ভি. রিউ, ৪র্থ অধ্যায়

ইলিয়ড থেকে পাওয়া হলেও মধুসূদনের উপমাটি সমগ্রভাবে কবিমানসের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সংপৃক্ত হওয়ায় এটা কাব্যদেহের প্রত্যঙ্গের মতই স্বভাবগত হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের অধিকাংশ উপমা সম্বন্ধেই এই কথাটি সত্য।

এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে মধুসূদনের সব উপমাই কাব্যের সামগ্রিক কল্পনাকে ধরে দিতে পেরেছে কিংবা কবিব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। অলংকার ব্যবহার করতে হবে বলেই করা হয়েছে, এ রকম উপমা যথেষ্টই আছে। ইংরেজিতে একে বলে decorative, এইগুলিই যথার্থ 'অলংকার'। যে মধুসূদন পণ্ডিতী রসবোধকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন "some other literary stars of equal magnitude say হাঁ, ইহাতে উত্তম উত্তম অলংকার আছে। মন্দ হয় নি।"— এসব ব্যবহার তাঁরই। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত মেঘনাদের মৃত্যুতে লঙ্কাবাসীর অজ্ঞাত আশঙ্কার বর্ণনায়

মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু যবে শ্যাম গুণনিধি
আঁধারি সে ব্রজপুর গেলা মধুপুরে।

অথচ নিছক অলংকারই যখন অকৃত্রিম কবিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন কত অপূর্ব হয়ে ওঠে—

> শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ-কৌমুদী ;
> তারাকিরীটিনী-নিশি-সদৃশী আপনি
> রাক্ষসকুল-ঈশ্বরী ! অশ্রুবারিধারা
> শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল ! —পঞ্চম সর্গ

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এর নাম সাঙ্গরূপক। কিন্তু এ যে শুধু প্রসাধনের জন্য নয় সে কথা মোহিতলাল চমৎকার বুঝিয়েছেন—

> এ উপমার আলংকারিক মৌলিকতা যেমনই হউক, এ চিত্রে তাহার যে ধ্বনিব্যঞ্জনা ঘটিয়াছে, মাতৃত্বের যে বিশাল গম্ভীর মহনীয়তা— সেই স্নেহের যে উদার মধুর রহস্যময়তা ইহাতে সূচিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় এই উপমার এমন সার্থক প্রয়োগ আর কোথায়ও হইতে পারিত না। চিত্রাঙ্গদা শোকার্ত জননী হইলেও তাহার রূপে নায়িকার লক্ষণ আছে। এরূপ 'তারাকিরীটিনী-নিশি-সদৃশী'— কালিদাসের 'স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী' নয় ; কারণ ইহার যৌবন— ইহার চন্দ্র ও জ্যোৎস্না— এক্ষণে পুত্র ও পুত্রবধূতে বর্তিয়াছে। —কবি শ্রীমধুসূদন, পৃ ৯৮

রামায়ণ মহাভারত এবং অন্য সংস্কৃত কাব্য থেকে মধুসূদন প্রচুর পরিমাণেই উপমা সংগ্রহ করেছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যকে বইঘেঁষা মনে হওয়ার এ একটা অন্যতম কারণ। ইংরেজ পাঠক মিলটনকেও তাই মনে করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-পরবর্তী ইংরেজি কাব্য যেমন প্রকৃতি-জীবনের অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী অথবা রবীন্দ্রনাথ-সমসাময়িক বাংলাকাব্যও তেমনি প্রত্যক্ষ স্পর্শচেতনায় সমৃদ্ধ। সেই তুলনায় মধুসূদনের কাব্যকে পাণ্ডিত্যগন্ধী মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্যাস্বাদন এই সিদ্ধান্তেই শেষ হয় না। আমাদের ভাষার ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে কবি নিজের কাব্যকে ধনী করেছেন, এটা মেনে নিয়েও আরও বলার থাকে মিলটন সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল—

> It is the language of one who lives in the companionship of the great and the wise of the past time. To follow

Milton one should at least have tasted the same training through which he put himself.

এই শ্রম আমরা স্বীকার করতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক। কিন্তু এই শ্রম ব্যর্থ হবে না বলেই বিশ্বাস। মধুস্থদনের কাব্য নতুন ভাবে পড়বার সময় এসেছে। তাঁর style বিচার করে কবিব্যক্তিত্বকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। এই বিচারেই দেখা যাবে, পূর্ববর্তী কাব্যের তুলনায় মধুস্থদনের নতুনত্বের প্রয়াস কতখানি সার্থক। শুধুই নতুনত্ব নয়, কাব্যশিল্পকে কতখানি সম্ভাবনাপূর্ণ তিনি করলেন। ভাষার সঙ্গে কল্পনাকে একাঙ্গ মধুস্থদনই করলেন। তাঁর ত্রুটি ছিল, সিদ্ধিও অপরিমেয়। পৌরাণিক উপমা চয়নের দিকে মধুস্থদন ঝুঁকেছিলেন, এতে কি কাব্য কৃত্রিম হয়েছে? পৌরাণিক উপমা রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছিলেন। শিবপার্বতীর রূপক ও উপমা রবীন্দ্রকাব্যে স্থলভ। ছবি আঁকার জন্য এবং অনেক সময়েই ভাবগত সাদৃশ্য এবং রস সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ এর ব্যবহার করেছেন। এর কাহিনী না জানলে পুরোপুরি এর রসও উপভোগ করা যায় না। মধুস্থদনের উপমা তত্ত্ব বা নীতির জন্য নয়, বস্তুগত সাদৃশ্য রচনার জন্য। 'ধুতূরার মালা যেন ধূর্জটির গলে' 'কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে' 'যথা হস্তিনায় অন্ধরাজ সঞ্জয়ের মুখে শুনি' 'মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ অনুগামী' 'রথীন্দ্র নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন'— এই সব ভাষার মূলে শুধুই গ্রন্থপাঠের ফল ছিল, এ কথা বলা ঠিক নয়। চেতনার সংস্কারে এই সব ছবি নিত্যলগ্ন ছিল। চোখে-দেখা বস্তুর মতই এরা রেখান্বিত এবং ক্লাসিকাল জীবনলীলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিরাট এবং বিস্তৃত।

মধুসূদনের হরপার্বতী

হরনাথ পাল

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও শাস্ত্রে মহেশ্বরের প্রধানত দুই ভিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এক রূপে তিনি যোগী মঙ্গলময় প্রসন্ন। এই গুণরাজির অধিকারী বলিয়াই হয়তো তাঁহাকে শঙ্কর শম্ভু ও শিব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্য রূপে তিনি রুদ্র ও ভৈরব। সেই পরিচয়ে কখনও তিনি গিরীশ কপর্দী নীলকণ্ঠ কপালমালী কৃত্তিবাস; কখনও-বা পশুপতি ভূতনাথ গণপতি শ্মশানচারী ভস্মবিভূষিত-অঙ্গ।[১] মহাদেবের এই দুই প্রধান মূর্তির সহিতই যে মধুসূদনের পরিচয় ছিল তাঁহার কাব্যে সে-প্রমাণ সুস্পষ্ট। ভারতীয় ধ্যানচিন্তার অনুসরণেই শিবকে তিনি মহাতপস্বী এবং পার্বতীকে প্রায়শ তাঁহার শক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র কাব্যসৃষ্টির পটভূমিকায় বিচার করিয়া বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতে পারা যায় যে, হরগৌরীর দৈবমহিমা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং তাঁহাদের সম্পর্কে তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর। দুই-একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে বক্তব্যটি স্পষ্ট করা যাইতে পারে—

> নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
> যোগীকুলধ্যেয় যোগী! —তিলোত্তমা, ৫-৬।১

অথবা—

> আইল রজনী ধনী ধবল-শিখরে
> ধীর ভাবে, ভীমা দেবী ভীমপাশে যথা
> মন্দগতি। —তিলোত্তমা, ২০৭-৯।১

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে হিমালয়ের উপমানছলে মহাদেবের যে তপোনিমগ্ন মূর্তি কবির কল্পনেত্রে উদিত হইয়াছিল তাহাই আপন গৌরবে কি অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে নিম্নের পংক্তি-কয়টি পাঠে তাহা বুঝা যাইবে—

> দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দী তপস্বী,

১ James Hastings : *Saivism, Encyclopædia of Religion & Ethics*, Vol II.

বিভূতিভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,

তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত। —মেঘ, ৩৭৯-৮১।২

এত স্বল্প কথায় যোগীশ্বর মহাদেবের এমন নিখুঁত ও পারিপাট্যময় চিত্র অঙ্কন করিতে বাংলা সাহিত্যে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া তো আমাদের জানা নাই। মধুসূদনের মূর্তিনির্মাণ-কৌশলের সঙ্গে বিপুল শ্রদ্ধার সংমিশ্রণেই এমন অসাধ্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল। এই সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যে দ্বিতীয় সর্গে কৈলাসের বর্ণনাটিও পাঠককে একবার স্মরণ করিতে বলি। মহাদেবের তপস্যাস্থল যোগাসন শৃঙ্গের নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ -বর্ণনাটিও অতি চমৎকার ও শাস্ত্রানুমোদিত। উপরের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতেও উপমান হিসাবেই হরগৌরীর প্রসঙ্গ— তপশ্চারিণী উমার ধীরমন্থর পদে মহাদেবকে পূজা করিতে যাওয়ার দৃশ্যটি— উপস্থিত করা হইয়াছে। এই চিত্রটিও যেমন মধুসূদন-চিত্তের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সৌন্দর্যজ্ঞাপক তেমনি নিবিড় সংযম ও শালীনতা সূচক।

মেঘনাদবধ কাব্য -বর্ণিত সীতা-উদ্ধার-ব্রতে নিযুক্ত লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে কবি মহাদেবের অন্য এক মূর্তি উপস্থিত করিয়াছেন। সে-মূর্তি যেমন ভয়াল-ভীষণ, তেমনি প্রশান্ত-গম্ভীর। মধুসূদনের বিরাট ও গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয় বর্ণনাশক্তির স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল সেই মূর্তিটি উক্ত কাব্যের পঞ্চম সর্গের (২০৩—১০এর পংক্তিগুলির) মধ্যে দেখিতে পাই। এই মূর্তির সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত অপর একটি চিত্রও এই কাব্যে দেখা যায়। উহা ভক্তের বিপদে বিচলিত ভক্তবৎসল শঙ্করের মূর্তি। ছিন্নমূল বৃক্ষের মত ছিন্ন-আশ ও বঞ্চিত-সাধ রাবণের নিদারুণ কাতরতায়—

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে।
লড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জনে
গর্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব; —মেঘ, ৪০১-৮।৯

মহেশ্বরের সুবিপুল মহিমা সম্পর্কে মধুসূদনের সচেতনতার অন্যতম প্রমাণ নিহিত আছে তাঁহার রাবণ-চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে। কবি রাবণকে শুধু শৈব রূপে পরিচয় দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কোনো কোনো দিক দিয়া শিবের সহিত তাহার গভীর সদৃশ্য কল্পনা করিয়া পরম সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। মহাদেব যেমন শ্মশানেশ্বর হইয়াও দেবাদিদেব, তেমনি বিধিকবলগ্রস্ত শোকাচ্ছন্ন লঙ্কাপুরীর অধীশ্বর রাবণেরও 'ধবল-ললাট-দেশ [উজ্জ্বল] সুতেজে'— ইহাই মধুসূদন নানাভাবে প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। ইষ্টদেবতা শিবের মহিমা সঞ্চারিত করিয়াই কবি রাবণের পরিণাম-চিত্রকে মহিমময় করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাই শ্মশান-যাত্রী রাবণের বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনি—

> বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
> রাবণ ;— বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
> ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে। —মেঘ, ৩০০-২।৯

কিন্তু, মধুসূদনের হরপার্বতী সম্পর্কিত ধারণা কেবলমাত্র উপরোক্ত বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। ইহার প্রমাণ মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের অন্তর্গত হরপার্বতীর বিলাসচিত্রটি। সেখানে তিনি মহাদেবকে কামাতুর এবং পার্বতীকে ছলনাময়ী রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা শিবশিবানী-কল্পনার ক্লাসিক আদর্শের অনুগত নয়। এই কারণেই এই চিত্রটি পাঠকের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সেইকালের, এমনকি এইকালেরও, কোনো কোনো সমালোচক হরগৌরীর পূত চরিত্রে কলঙ্ককালিমা লেপনের জন্য মধুসূদনের ধর্মান্তর-গ্রহণকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি হিন্দুসংস্কারবর্জিত ছিলেন বলিয়াই দেবচরিত্র লইয়া এমন রসিকতা করার অশোভনতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। কিন্তু, মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির প্রসঙ্গে ধর্মের এই অজুহাত যে নিতান্ত দুর্বল তাহা রসিক ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাংলাদেশে যদি একজন কবিও শিল্পদৃষ্টিকে ধর্মের আনুগত্য হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখিয়া চলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ধর্ম তাঁহার ব্যক্তিজীবনকে লইয়া যত রকম আলোড়ন সৃষ্টিই করিয়া থাকুক না কেন, তাঁহার কবিমানসে শিল্প-প্রয়োজন-সাধন ভিন্ন ধর্মের অন্যতম কোনো

গুরুত্ব স্বীকৃতি পায় নাই। বিধর্মী মাইকেল হরপার্বতীর বিলাসচিত্র অঙ্কন করিয়া যদি ঐ পূত চরিত্রে কলঙ্ককালি লেপন করিয়াও থাকেন তবে তিনিই তো আবার পাঠকের মনের পটে মহাদেবের তপোনিরত প্রসন্নদর্শন শিবসুন্দর মহিমময় মহেশ্বর-মূর্তিটি অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অতএব ধর্মান্তর-গ্রহণের যুক্তি দিয়া এ রহস্যভেদের চেষ্টা মধুসূদনের ক্ষেত্রে অচল। ঐ বিলাসচিত্র অঙ্কনের হেতু সন্ধান করিতে হইবে অন্যত্র।

মেঘনাদবধ কাব্যের তিন-চতুর্থাংশ গ্রীক, মধুসূদন এমন একটা দাবি বন্ধুমহলে উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই দাবির যথার্থতা-বিচারে এখানে অগ্রসর না হইয়াও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই কাব্যের নিয়তিবাদ ও দেবযন্ত্র মূলত হোমারের আদর্শেই পরিকল্পিত এবং প্রধানত এই দুইটি বিষয়ই তাঁহার কাব্যকে অহিন্দু বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। কবি যে তাহা জানিতেন সে-প্রমাণ তাঁহার চিঠিপত্রে আছে। কিন্তু, জানিয়াও অন্যথা করিতে পারেন নাই। শিল্পসিদ্ধির জন্য তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্যে যেমন হিন্দু বৈশিষ্ট্য তেমনি অহিন্দু বৈশিষ্ট্যকেও প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহাকাব্য রচনা করিয়া অমর হইবার বাসনাটি প্রদীপ্ত দীপশিখার ন্যায় এতদিন ধরিয়া তাঁহার অন্তরে প্রোজ্জ্বল ছিল। কবি বুঝিতে পারিয়াছেন সেই কামনাটি এতকাল পর মেঘনাদবধ কাব্য সৃষ্টি করিয়া সার্থকতার তুঙ্গ শীর্ষ স্পর্শ করিতে চলিয়াছে। তাই রাজনারায়ণ বসুকে প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে তাঁহাকে বলিতে শুনি—"ওহে রাজ! এই কাব্য নিশ্চয়ই আমাকে অমর করিবে।" অমরতাকাঙ্ক্ষী কবি জীবনপাত্রে সঞ্চিত সমস্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়া এই কাব্যের অঙ্গরাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি জানেন যে, মহাকাব্যে থাকে বিচিত্র চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনীর সমাবেশ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যসমূহ পাঠ করিয়া তিনি ইহাও জানিয়াছিলেন যে, মহাকাব্যের রচয়িতাকে স্বর্গমর্ত্যপাতাল-প্রসারী কল্পনার অধিকারী হইতে হয়। তিনিও যে তেমন বিপুল কল্পনা-শক্তির অধিকারী এবং তাঁহার কাব্যেও যে বৈচিত্র্যের অভাব নাই সেই সাক্ষ্য উপস্থিত করিবার জন্য হোমারের আদর্শে দেবযন্ত্র প্রবর্তন করিতে গিয়া তিনি ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের অনুসরণে মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গটি রচনা করেন। শচী ও ইন্দ্রের প্রার্থনা এবং রামচন্দ্রের অকালবোধনের ফলে পার্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া মদনের সাহায্যে মহাদেবকে ছলনা করিবার চিত্রটি

উক্ত কাব্যবর্ণিত সোম্‌নসের সাহায্যে হেরার জিউসকে ছলনা করিবার সাদৃশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছে। কবি স্বয়ং এই সূত্রটি তাঁহার পাঠককে ধরাইয়া দিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছেন, "মেঘনাদবধ কাব্যে দ্বিতীয় সর্গ পড়িতে পড়িতে তোমার ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের কথা মনে পড়িবে; আইডা পর্বতে জুপিটারের কাছে জুনোর অভিসার-দৃশ্যকে আমি জানিয়া শুনিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তবে যতদূর সম্ভব তাহাকে হিন্দু-পোশাক পরাইতে চেষ্টা করিয়াছি।"

হরকোপানলে মদনভস্মের কাহিনীটি সুপ্রাচীন। কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্যের মধ্য দিয়াই মধুসূদন ঐ কাহিনীর সহিত পরিচিত হন। মহাদেবের তপোবিঘ্ন উপস্থিত করিবার জন্য তাহার সাহায্যপ্রত্যাশী পার্বতীকে মদনের পূর্বস্মৃতি কথনের উপলক্ষ্যে সৃষ্টি করিয়া মধুসূদন যথেষ্ট গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে উক্ত কাহিনীকে আপন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। দ্রষ্টব্য মেঘনাদবধ কাব্য ৩।১১-২৭।২ সেই সর্বজন-পরিচিত কাহিনীতেই যুগ-প্রয়োজনানুরূপ নব-প্রসঙ্গ দান করিতে উৎসাহিত হইয়া এবং দেশীয় পুরাণকাহিনীকে গ্রীক পুরাকাহিনীর অদ্ভুত মাদকতাপূর্ণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিবার দুর্নিবার বাসনা লইয়া তিনি আলোচ্য বিলাস-চিত্রটি কল্পনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কল্পনার সুদূরপ্রসারিতা ও নিরঙ্কুশতা ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গে আরও একটি গূঢ়তর গভীরতর প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাগীরথী-তীরে যে নবীন জীবন-স্পন্দন আভাসিত হইয়া উঠিতেছিল উহাকে কাব্যে সার্থকভাবে চিত্রিত করিতে গিয়া তিনি মানুষকে দেবতা না করিয়া দেবতাকেই মানবের রূপ দান করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও গ্রীক দেব-কল্পনাকে তিনি স্বীয় কাব্যে অভিনন্দিত করেন। গ্রীক কল্পনা দেবচরিত্রে ভারতবর্ষের অনুরূপ দৈবসমুচ্চতা দেখিতে পায় নাই। গ্রীসের দেবদেবী সাংসারিক সুখসন্ধানী সৌন্দর্যপ্রিয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক্রিয়াকর্মকুশল বীর ও পরশ্রীকাতর। গ্রীক সভ্যতা মানুষকেই চূড়ান্ত মর্যাদা দিয়াছে। 'মানব-চরিত্র বিশ্বসংসারে বস্তুনিচয়ের উৎকর্ষ-পরিমাপক নিকষ'— ইহাই গ্রীক জীবনদর্শনের শেষ কথা! মধুসূদনের কবিমানস ছিল ঐ আদর্শ প্রতিফলনের পক্ষে অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার অপরিসীম মানবমাহাত্ম্যবোধই যে শিব-

শিবানীর এই বিলাসচিত্র অঙ্কনে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। পূত দেবচরিত্রে কলঙ্কলেপন নয়, তাঁহার লক্ষ্য ছিল মানবজীবনের বিচিত্র রাগিণী এইভাবে ধ্বনিত করিয়া তোলা।

পুরুষের জীবনে নারীর দুর্জয় প্রভাব, রমণীরূপাগ্নিমুগ্ধ পুরুষ-পতঙ্গের অতি বিমূঢ় অবস্থা মাইকেল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেন। নারী কল্যাণী ও করালী। তবু পুরুষের জীবনে নির্মম নিয়তির রূপে করালী মূর্তিতেই সে যে অধিক সক্রিয় এই সত্য মধুসূদন কখনোই ভুলিতে পারেন নাই। তাই অঙ্গনা-মূর্তির ধ্যানতন্ময় কবি তিলোত্তমার পদরজঃস্পর্শে বিন্ধ্যপর্বতের পুলক-শিহরণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অরে রে বিজন, বিন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দুপদ— অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ সাগর-নীরে মজিলি কি তুই ?
স্মরহর দিগম্বর, স্মর-প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী, দেখিয়া
মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি ?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
ফেলি দূরে হাড়মালা রত্ন-কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে নীলকণ্ঠ ভব ?—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে ! —তিলোত্তমা, ৪৪৮-৫৭।১

আলোচ্য বিলাসচিত্রটির পূর্বসূত্র হিসাবে এই বর্ণনাটুকুর গুরুত্ব কম নহে। এখানে সংশয়ের আড়াল রাখিয়া হরপার্বতীর যে সম্ভাব্য মিলনদৃশ্যের কল্পনা মধুসূদন করিয়াছিলেন তাহাই নিম্নের পংক্তি-কয়টিতে সংশয়হীন প্রত্যক্ষ প্রকাশ লাভ করিয়াছে।—

উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে!) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুমধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল ;— প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু ! —মেঘ, ৪১৭-২৭।২

পুরুষের জীবনে বিমোহিনী নারীর দুরতিক্রম্য আকর্ষণের যে পরিণাম উহারই রূপকে উপরের চিত্রটি পরিকল্পিত হইয়াছে। মানবসংসারে যাহা অতি সাধারণ ঘটনা উহারই ভিয়ান দিয়া কবি হরগৌরীকে মানব করিয়া তুলিয়াছেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে মানবরসের অভাব ছিল। উহার আখ্যায়িকা ছিল দেবদানবের কথায় পূর্ণ। মধুসূদন সেই অভাব তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যে, চূড়ান্ত করিয়া মিটাইতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই মেঘনাদবধ কাব্যে দেবতাও মানব হইয়া উঠিল। রামায়ণের উপকরণ দিয়াই এই যুগের কবি মানবায়ন কাব্য রচনা করিলেন।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, হরগৌরীর মধ্যে মানবরস সঞ্চারে মধুসূদন একদিকে যেমন পুরাণাদি হইতে, অন্যদিকে তেমনি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য হইতে যথেষ্ট সমর্থন পাইয়াছিলেন। মধ্যযুগের বাঙালী কবি-কল্পনার শাক্ত লক্ষণ বহু ক্ষেত্রে দেবতাকে মানব করিয়া লইয়াছে। সেই সন্ধান জানা ছিল বলিয়াই তিনি হেরা ও জিউসের বিলাসচিত্রটিকে হিন্দু-পোশাক পরাইয়া হরপার্বতীর মধ্য দিয়া গ্রহণ করিতে ভরসা পাইয়াছিলেন। সেই যুগের কবিদের মধ্যে যাঁহার সহিত মধুসূদনের সর্বাধিক পরিচয় সেই ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' হইতে কিছু উদ্ধৃতি দিলেই বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হইবে।—

কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান
যে করে কামের শর।
শিহরিল অঙ্গ ধ্যান হইল ভঙ্গ
নয়ন মেলিলা হর ॥
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত
নেহারেন চারিপাশে।
সম্মুখে মদন হাতে শরাসন
মুচকি মুচকি হাসে ॥

—শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভস্ম

ইহার পর হরগৌরীর মিলনদৃশ্যের বর্ণনা—

দুই জনে সহাস্য-বদনে রস-রঙ্গে।
হরগৌরী এক হইলা দুই অর্ধ অঙ্গে ॥

—হরগৌরীর কথোপকথন

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হরগৌরীর মানবীয় রূপ, এমনকি, শিবের ঐ কামাতুর চিত্রটিও, মধুসূদনের নিজস্ব আবিষ্কার নহে। যাহা পূর্ব হইতেই ছিল তাহাকেই তিনি গ্রীক দেবযন্ত্র প্রবর্তনের এবং যুগধর্মের প্রবর্তনানুযায়ী মানবরস সৃষ্টির উপকরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। ইহারও অবশ্য কারণ ছিল। মহাদেবের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণলীলার বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়া দেব-সমাজ মধ্যে তাঁহাকেই মধুসূদনের অধিক প্রিয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে ভোগ ও যোগের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাঁহাকে দেবাদিদেব ভাবিয়াছিলেন। সেই প্রিয়দৃষ্টির বলেই তিনি দেশকালের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ সেই সামান্য উপাদান লইয়া দেশকালের অতীত এক সর্বজনীন রসরূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যে কত গভীর তাহা কাব্যরসিক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মধুসূদন ও আধুনিক মন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মধ্যযুগেরও প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে একটি ধারণা ছিল। অর্থাৎ, মধ্যযুগও নিজেকে আধুনিক মনে করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে যা ছিল আধুনিক, আজ তার অনেক-কিছুই অপসৃত, অপাংক্তেয়। উনিশ-শতকের বাংলাদেশে কাহিনী-নির্বাচনের সপ্রতিভতায়, কি শপথ-গ্রহণের প্রগল্‌ভতায় হয়তো রঙ্গলাল কি হেমচন্দ্র, মধুসূদনের চেয়েও ছিলেন তৎকালীন, কিন্তু সময় এসে মধুসূদনকেই যথার্থ আধুনিক ব'লে প্রমাণ করলো। এর মধ্যে কতবার তো আধুনিকতা শব্দের সংজ্ঞা বদল হল, কিন্তু মধুসূদন রয়ে গেলেন। আজকের পৃথিবীতে আমরা যারা বাস করছি, তাদের পক্ষে তিনি অপরিহার্য।

মধুসূদন আভিধানিক, কিন্তু অভিধান নন। বস্তুত, যে-কোনো সচেতন কবিকেই জীবনকে রূপ দিতে গিয়ে জীবন থেকে একটা ব্যবধানে দাঁড়াতে হয়, স্বতন্ত্র একটি শব্দমণ্ডল দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। না হলে জীবন এসে তাঁর প্রকরণ তথা শিল্পসাপেক্ষ জীবনবোধকে গ্রাস করে, ধ্বংস করে। মধুসূদন জীবনের কেন্দ্রে পৌঁছবার জন্যই জীবন থেকে স্বযাচিত একটি দূরত্ব বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণভঙ্গির আপাত-দুরূহ আবরণরহস্য বুঝতে পারলে স্ফটিকস্বচ্ছ তাঁর বাণী ধরা পড়বে— যা একই সঙ্গে কবিকে ও জীবনকে বিবৃত করে।

তুলনা দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করতে চাই। Ovid রচিত Heroides থেকেই মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা'র রূপাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। পত্র-কবিতার মধ্য দিয়ে নায়িকার বেদনা উচ্চারণের রীতিটি ওভিদ নিপুণভাবে প্রতিফলিত ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু আজ এ কথাটা আমাদের অবিদিত নেই যে, ওভিদ তাঁর আপন হৃদয়কে সেখানে উপস্থিত করেন নি। চল্লিশ বছরেরও অধিককাল তিনি সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন; হেরোইদেশ তাঁর যৌবনের রচনা। বার্ধক্যে যখন নির্বাসিত হলেন, সেই পর্বে Epistulae ex Ponto তিনি রচনা করেন। কিন্তু কোনো রচনাই তাঁর স্বগত সন্তাপের শিলালেখ হয়ে ওঠে নি। হয়ে ওঠে নি বললে ভুল হবে, বলা উচিত, হতে চায় নি। ফলত তাঁর

রচিত চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলংকারিকতার ঐকিক নিয়মে সুসজ্জিত, একরঙা। যে-কোনো দিক থেকেই তাদের দেখি, তারা প্রথানুগত কোনো সমবেত নৃত্যের নর্তকীদের মত। বিশেষ ক'রে হেরোইদেশ সম্পর্কে এ কথা আক্ষর ও আন্তর অর্থে প্রযোজ্য। তাঁর অঙ্কিত ফিলিস কি দিদো, মীডিয়া কি স্যাফো—সবাই অলংকৃত ভঙ্গিতে কথা বলেছেন, তাদের অভিমান বা অন্তিম অভিসম্পাত একই রকম শব্দাঢ্যতায় পরস্পর-সদৃশ, মন্থর। দায়ানিরা আর মীডিয়ার মনে মাতৃভূমির মাটি থেকে চ্যুত হবার যে-কান্না, তার মধ্যে পার্থক্য নিছক ঘটনাগত, ভাবগত নয়। ফেএনের কাছে লেখা স্যাফোর চিঠির একটি অংশ এখানে দেখা যাক—

'আমার প্রেমের জন্যই আমার রোদন। আর যেহেতু, এলেজিই হল দুঃখের আধার, আমি তাই এলেজিতে কথা বলি। কোনো বীণা আমার অশ্রুর উপযোগী নয়।

'…ফোএবাস ভালোবাসতো ড্যাফ্‌নেকে, ব্যাকাস সেই নসিয়া মেয়েটিকে—কিন্তু তারা কি কেউ আমার মত লিরিক লিখতে পারত?… আমার নাম ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী কবি অ্যালসিয়াস বীররসের কবিতা লেখে বটে, তারও নামডাক কি আমার মত? বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ হয়ে যদি রূপ না-ই দিয়ে থাকেন, প্রতিভার সৌন্দর্য তো দিয়েছেন!'

এ চিঠি হয়তো মহিলা কবির, কিন্তু কোনো মহিলার নিশ্চয় নয়। হেরোইদেশ-এর নারীচরিত্রেরা কখনো-কখনো প্রকৃত সংরাগের কাছে, জীবনের কাছাকাছি আসতে পেরেছে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি, প্রাতিভাসিক পর্দা সরিয়ে জীবনকে আলিঙ্গন করতে পারে নি।[১]

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'কে যদি প্রথম দৃষ্টিপাতে শো-কেসে সাজানো জড়পুত্তলী মনে হয়, ওভিদের পাশে রাখলেই সেই ভুল ঘুচবে। বীরাঙ্গনার একটি চরিত্র অপর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি নয়, প্রত্যেকে রক্ত ও হৃদয়ের নারী। তাদের প্রত্যেকের সত্তা আলাদা: শুধু প্রেমিকের থেকে নয়, অন্যান্য সকলের

১ Heroides and Amores (অনুবাদ: Grant Showermen), ভূমিকা।

থেকে। তাদের যন্ত্রণা অলংকৃত নয়, তাদের যন্ত্রণার অলংকার আছে। কয়েকটি উদ্‌ধৃতি দিতে চাই—

১ বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?

—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

২ কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ!

—সোমের প্রতি তারা

৩ দেশদেশান্তরে
ফিরিব, যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুলু-পতি!'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি?'···

—দশরথের প্রতি কেকয়ী

কুলটা যে নারী
বেশ্যা— গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী?

—নীলধ্বজের প্রতি জনা

কাব্যে উপেক্ষিতা চরিত্রের পুনর্বাসনের জন্যই নয়, বীরাঙ্গনার চিঠিগুলি অন্য গভীরতার অর্থে মূল্যবান্। ব্যক্তি সেখানে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছে, ব্যক্তি হিসেবে ভালোবেসেছে। আত্মগরিমার অভাব এতটুকু নেই, এমনকি আত্মনিবেদনের মধ্যেও। আধুনিকতার প্রথম ও শেষ আশ্রয় ব্যক্তি, অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। মধুসূদনের আগে জ্ঞানদাসে হয়তো তার আভাস, ভারতচন্দ্র-

রামপ্রসাদ বা রামনিধি গুপ্তে আংশিক স্ফুরণ, মধুসূদনেই তার সামগ্রিক স্ফূর্তি। মাইকেল ড্রেটনও, ওভিদ্-এর অনুসরণে, Heroic Epistles (১৫৯৭) লিখেছিলেন। ড্রেটনের জাতীয়তাবোধ তাঁকে ইংলণ্ডের ইতিহাস থেকে যশোজ্জ্বল কয়েকটি চরিত্র নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মধুসূদনও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখর সমস্যা— সমাজে নারীর স্বকীয় মর্যাদা— শিল্পরূপ দিতে চেয়েছিলেন।[২] বিদ্যাসাগরকে তিনি অগ্রণী পুরুষ বলেছিলেন, বীরাঙ্গনার প্রতিটি নারী সেই অর্থে পুরোবর্তিনী অঙ্গনা। ড্রেটনের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যাবে তিনি যেখানে জাতীয়তার প্রবক্তা, মধুসূদন সেখানে জাতীয় পুরাণের নতুন ভগীরথ, মানবহৃদয়ের সাক্ষ্যসন্ধানী। বাংলা সাহিত্যে প্রথম যিনি পৃথিবীকে স্বর্গ ক'রে আঁকেন, সেই মধুসূদনই প্রথম নরক ও দুঃস্বপ্নের ছবি এঁকেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গ পড়তে পড়তে যে আতঙ্ক আর বিবমিষা মনকে আচ্ছন্ন করে, তা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে নিঃসৃত। সখাদ মানবস্বভাবকে এর আগে এভাবে বাংলা দেশের আর কোন্ কবি এঁকেছেন ? আত্মহা পাপীর হাহাকারও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। অসহায় মানুষ যে কেন কলুতকুহক এড়াতে পারে না, এই জিজ্ঞাসার নিরসন না হতেই, রামকে তিনি ভয়ংকর বনের মধ্যে নিয়ে, আশ্চর্য একটি উপমা ব্যবহার করেছেন—

স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জ ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা।

রাগীর হাসির সঙ্গে ফ্যাকাশে রোদের এই তুলনা আমাদের স্তম্ভিত করে। বীরাঙ্গনার সপ্তম সর্গে ভানুমতীর দুঃস্বপ্ন নিয়তি-চিন্তায় অপরূপ। আকাশে আভাহীন সূর্য, বিরাট শোকে বিবর্ণ। অদূরেই হ্রদ, রাজরথী সেই হ্রদের তীরে ভগ্নউরু পড়ে আছেন। ভানুমতী চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন, প্রশ্ন করলেন—

কেন এ কুস্বপ্ন, দেব দেখাইলা মোরে ?

উদ্দিষ্ট দেবতার কোনো উত্তর এখানে নেই এবং নিরুত্তর সেই স্তব্ধতার মধ্যে সমস্ত বিধুর পরিণামও জ্ঞাপিত হয়ে আছে। সমগ্র মানুষ ও তার ব্যক্তিগত জগৎ— এই হল মধুসূদনের কবিতার বিষয়। এই প্রয়োজনেই তিনি পুরাণকে পরিবর্তিত করেছেন। শ্লেলিং আধুনিক কবিতার লক্ষণ

২ সেই সময়ের পরিবেশ জানবার জন্য হরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের **'Western Influences on 19th century Bengali Poetry' (1857-1887)** পৃ ১১১-১১৩, দ্রষ্টব্য।

বলতে গিয়ে এই কথাটাই বলেছিলেন ; 'ব্যক্তির কাছে বিশ্বের যেটুকু অংশ উদ্‌ঘাটিত হবে, তাই দিয়ে তিনি একটি সমগ্রতা রচনা ক'রে নেবেন। তাঁর সমকালীন সময়, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্য থেকে তিনি নিজে একটি স্বরচিত পুরাণ গড়ে তুলবেন। পুরাতন পৃথিবীতে পৃথিবী ছিল সর্বাংশেই শ্রেণীগত বা জাতিজত। পক্ষান্তরে, আধুনিক পৃথিবী ব্যক্তির পৃথিবী, ব্যক্তিগত।'[৩] এই বিচাবে বাংলা কবিতায় প্রথম আধুনিক কবি মধুসূদন।

তাঁর কবিতার রূপবিবর্তনের দিক থেকেও এ কথাটা প্রমাণ হয়। সাহিত্যিক এপিক (বা সাহিত্যিক এপিকেরও ছদ্মবেশ), ওড্, পত্র-কবিতা ও সনেট—তাঁর রচনার এই বিবর্তমান কালক্রম প্রমাণ করে যে তিনি নিজেকে ক্রমশ বস্তু-বেষ্টনী থেকে মুক্ত ক'রে ব্যক্তিগত অস্মিতার অভিমুখে বহন করছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গের সর্বান্ত্য পংক্তিগুচ্ছের সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ সনেটটির (সমাপ্তে ১০২) ভাবসাদৃশ্যের অন্তঃসাক্ষ্য থেকেও বোঝা যায়, ব্যক্তিসত্তার ট্র্যাজেডি মধুসূদনের কবিতার বিষয়।

'আমার প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি ইমেজ, অভিব্যক্তি, আর প্রত্যেকটি পংক্তি তুমি নিশ্চয় ওজন ক'রে নিও।...দুর্বল কি কবিত্বহীন চিন্তা, দুর্বল কি নিঃসাড়, প্রকাশভঙ্গি বা রুক্ষ পংক্তি একটি থাকলেও তুমি ক্ষমা কোরো না'— বলে-ছিলেন মধুসূদন। য়ুরোপীয় প্রভাব আমাদের সাহিত্যে কতটুকু বাঞ্ছনীয়, কতটা স্বাভাবিক, এই বিবেচনা থেকে আরো বলেছিলেন: 'ওদের মত আমরাও একই আবেগে জর্জর হই, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সেই সব আবেগ মৃদুতর আকার নেয়।' কথাটা আজো আমরা ভালো করে বুঝেছি কি? মধুসূদনের আত্মস্থ আধুনিকতা আজো তরুণতম কবির কাছে আদরণায়।

পাঠকের অনুশীলনের অভাব কবির অক্ষমতা নয়। মধুসূদনকে আমরা সাম্প্রতিকতার সংস্কার নিয়ে স্পর্শ করতে গেলে তিনি ধরা দেবেন না। অধুনাতন রম্য আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত শরীর নিয়ে ছুঁতে গেলেও অষ্টম সর্গের অমোঘ সেই শ্লোকের রেশ তুলে ব'লে উঠবেন—

ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।

৩ A History of Æsthetic (পৃ ৩২৫-২৬) : Bernard Bosanquet

মধু-প্রসঙ্গ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

একে গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) বলা ঠিক হবে না। কারণ, প্রথমেই বলে রাখা ভালো, গ্রন্থপঞ্জী-রচনায় গ্রন্থবিজ্ঞানসম্মত যেসব আন্তর্জাতিক রীতি প্রচলিত আছে— এখানে তা, পুরোপুরি কেন, অনেকটাই মানা হয় নি। এবং তাছাড়া, যে কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তি -সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী রচনা— সে যদি আবার তাঁর তিরোধানের এত দিন পরে হয়— কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। এমনকি কোনো সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও বিশেষ শ্রমসাধ্য, বহুবর্ষব্যাপী এক দুরূহ সাধনার ব্যাপার।

মাইকেলের মত প্রথমশ্রেণীর প্রতিভার পক্ষে একথা আরো গভীরভাবে সত্য। মাইকেল বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকবি ; প্রথম পত্রকাব্য-প্রণেতা ; প্রথম সনেট-রচয়িতা। বাংলা কাব্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। প্রথম না হলেও একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এবং অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন-স্রষ্টা। যেমন প্রোজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যমুখর তাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্য, বোধ হয় ততোধিক রহস্যমণ্ডিত ও বিচিত্রতর তাঁর নিজের জীবন-নাট্য। সুতরাং এমন একজন প্রতিভাধর যুগন্ধর স্রষ্টাকে নিয়ে তাঁর আবির্ভাবলগ্ন থেকেই নানা ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়ে থাকবে— এটাই তো স্বাভাবিক। বস্তুতঃ মাইকেল মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে একজন বহু-পঠিত এবং বহু-আলোচিত প্রতিভা, এবং বহু-বিতর্কিতও বটে। কিন্তু তবু মাইকেল-সম্পর্কিত এইসব অজস্র রচনার সামান্যই আমাদের এ যুগের হাতে এসে পৌছতে পেরেছে। যা-ও পৌঁছেছে সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে তাও বিনষ্টির পথে। এর জন্য দায়ী প্রথমতঃ আমাদের আর্দ্র আবহাওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের বাঙালী চরিত্রের মৌলিক জীবন-ঔদাসীন্য। তাই সুলিখিত প্রধান কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ ও কয়েকজন আত্ম-সমর্পিত গবেষকের সমস্ত শ্রম আজ ব্যর্থতায় পরিণত হতে চলেছে। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে একটিও গ্রন্থপঞ্জী রচিত হতে পারে নি। অথচ এমন একজন প্রধান সাহিত্য-পুরুষ সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী রচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কে দায়িত্ব

নেবে? কোনো বিশেষ দায়িত্বশীল ও শ্রদ্ধানিবিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছাড়া— একক কোনো ব্যক্তির দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

মাইকেলের প্রধান সাহিত্যকীর্তি মেঘনাদবধ রচনার পর এক শ বছর পার হল। এদিকে কবির শত সপ্তত্রিংশৎ জন্মদিনও আগত। প্রচুর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত গ্রন্থসম্ভার ও পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধার করে এখনো মোটামুটি গ্রন্থ-পঞ্জী রচনা করা হয়তো বা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এর পরে তারও সম্ভাবনা থাকবে না। অথচ ভাবী কালের কাছে এ আমাদের একটি সুগভীর দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্য-উদ্ধারের ভার মোটামুটি ভাবে বিশ্বভারতীর উপর সমর্পিত। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিপুরুষ-সম্পর্কিত এই ধরণের ঔদাসীন্য আমাদের অমার্জনীয় জাতীয় অপরাধ। দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে বাংলার জনসাধারণের কাছ থেকে সহযোগিতার অভাব হবে না। বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিও তৎপর হবে।

এখানে বিশেষ করে কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর ভার দিবার কথা বলছি এজন্যই যে— এই ধরণের গ্রন্থপঞ্জীকে সব সময় পূর্ণাঙ্গ ও সমকালীন করে রাখবার একটি গুরুদায়িত্ব রয়েছে। যে-কোনো গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হলেই পুরোনো হয়ে যায়। কালের প্রবাহের সঙ্গে আরো নানাভাবে মাইকেলের প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণ হবে, নানা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ বের হবে— এ আমরা নিশ্চয়ই আশা করি এবং এইসব রচনাসম্ভারকে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে যুক্ত করে তাকে সমগ্রতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ দায়িত্ব পালন করা, বলা বাহুল্য, কোনো শ্রদ্ধাশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব।

এইখানে মাইকেল-জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের জন্য কেবলমাত্র বহু-প্রচলিত কয়েকটি গ্রন্থেরই উল্লেখ করা হচ্ছে। কবির জীবৎকাল থেকে এ পর্যন্ত বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ বা সমগ্র রচনাবলী সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত সম্পাদিত গ্রন্থরাজিতে কবি ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে যেসব আলোচনা ও প্রবন্ধাদি রয়েছে— তা এখানে অনুল্লিখিত থাকল। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন মূল ও শাখা ইতিহাসেও মাইকেল-প্রতিভার ও জীবনের নানা ধরণের আলোচনা রয়েছে; সেসব বইও অন্তর্ভুক্ত করা হল না। এবং গত এক শ বছর ধরে বাংলা সাময়িক

পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় কবি ও তাঁর কাব্য-নাটকাদি সম্পর্কিত কত আলোচনা ও প্রবন্ধ বের হয়েছে তারও শেষ নেই। সেদিকেও দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারি নি বা করি নি। অথচ ব্যক্তি-গ্রন্থপঞ্জী রচনায় এই তিনটি উৎসই সমান মূল্যবান। অতএব যথাসম্ভব সন্ধানযোগ্য। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার উল্লেখ প্রাথমিক কৃত্য হলেও বাকি উৎস দুটি : ১. বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সাহিত্য গ্রন্থে উল্লিখিত অংশ বা অধ্যায় বিশেষ, ২. নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী— অনেক সময় ব্যক্তি-জীবনের ও প্রতিভার অনেক গভীরতর রহস্য উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে বিভিন্ন যুগের নানান দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ব্যক্তির সামগ্রিক রূপটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এবং তাঁর সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নেও এইসব প্রবন্ধাবলী একান্তভাবে অপরিহার্য। তবে এখানে কেবলমাত্র মাইকেল সম্বন্ধে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনাবলীরই উল্লেখ করা গেল। সাধারণ পাঠক যাতে এক জায়গায় মাইকেল-সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পান তার জন্যই এই গ্রন্থপঞ্জী রচনার প্রয়াস। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নজরে পড়ে যদি কোনো সুধী-সজ্জন বা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর কর্মপ্রেরণায় উৎসাহিত বোধ করেন এবং সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ মাইকেল-গ্রন্থপঞ্জী রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে আনন্দের বিষয় হবে। বস্তুতঃ এটিই তার উদ্দেশ্য। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলা ও ইংরেজিতে যেসমস্ত সংস্কৃত ও সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেল-সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে— সেই-সব বইয়ের একটি মোটামুটি রকমের গ্রন্থপঞ্জী বর্তমান সংকলকের হাতে প্রায় প্রস্তুত রয়েছে। বলা বাহুল্য, একক ব্যক্তিপ্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা সেখানে নিশ্চয়ই থেকে গেছে!

ওদেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীদের নামে নানা সোসাইটি বা ইনস্টিটিউট রয়েছে। তাঁদের হাতেই এই ধরণের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী-রচনার দায়িত্ব। আমাদের স্বাধীন দেশেও আমরা প্রত্যাশা করব— অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে। এখনো যদি মাইকেল-সম্পর্কিত সমগ্রভাবে গবেষণার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়— তাহলে হয়তো একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী রচিত হতে পারে। এর পর আর আমাদের আফসোসের সীমা থাকবে না। এ বিষয়ে বাংলা দেশের জ্ঞানী গুণী সুধীসজ্জন সাধারণ মানুষ— সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মাইকেল-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

গ্রন্থকারের নাম বর্ণানুক্রমে সজ্জিত

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য। গীতিকবি শ্রীমধুসূদন। কলকাতা। সৃষ্টি প্রকাশনী। ১৯৬০। ১৪, ২০২ পৃ।

২. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য [মাইকেল স্মৃতিসভায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ]। কলকাতা। রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড। ১৯৩২। ১৬, ১৪৬ পৃ।

৩. কনক মুখোপাধ্যায়। কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন। পুনর্লিখিত ৩য় সংস্করণ। কলকাতা। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। ১৯৪৮। ৬, ১৩৬ পৃ।

৪. চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী। মাইকেল মধুসূদন। কলকাতা। দেবসাহিত্য কুটীর। ১৯৩৪। ৫৬ পৃ। [শিশুদের জন্য রচিত]

৫. জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৫৮। ১৬, ২৬৪ পৃ।

৬. জি. পরমস্বরণ পিল্লাই [Pillai, G. Paramaswaran] রিপ্রেজেনটেটিভ ইণ্ডিয়ানস্। লণ্ডন। জর্জ রুটলেজ অ্যাণ্ড সন্স্। ১৮৯৭। ২২, ৩২০, ৪, ৪ পৃ। [ইংরেজিতে লিখিত। মধুসূদন দত্ত ৬৯ - ৭৩ পৃ]।

৭. জীবেন্দ্র সিংহ রায়। মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত। কলকাতা। বি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স। ১৯৫৮। ৬, ১৪৮ পৃ।

৮. দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মাইকেল মধুসূদন। ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা। স্বর্ণ প্রেস, ১০৮ নারকেলডাঙ্গা মেন রোড। ১৯২৯। ৪০ পৃ।

৯. নগেন্দ্রনাথ সোম। মধুস্মৃতি। কলকাতা। এস. সি. সান্ন্যাল অ্যাণ্ড কোং। ১৯২০। ২০, ৭৯৭ পৃ।

১০. নীহার দাশগুপ্তা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত [জীবনী ও সাহিত্য সমালোচনা] কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। ১৯৪২। ৪, ৮০ পৃ। [জার্নল অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব লেটার্স— ৩৩শ খণ্ড থেকে পুনর্মুদ্রিত] [ইংরেজীতে লিখিত]

১১. প্রমথনাথ বিশী। মাইকেল মধুসূদন : জীবনভাষ্য। কলকাতা। সৌরীন্দ্রনাথ দাস, শনিরঞ্জন প্রেস। ১৯৪১। ১২, ৮২ পৃ।

১২. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় [ছদ্মনাম বনফুল]। শ্রীমধুসূদন [নাটক]। কলকাতা। ডি. এম্. লাইব্রেরী। ১৯৩৯। ২, ১৮৪ পৃ।

১৩. বিজয়াশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের মাইকেল মধুসূদন। কলকাতা। কলিকাতা পুস্তকালয়। তারিখ নেই। ৪৬ পৃ। [শিশুপাঠ্য গ্রন্থ]

১৪. বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। মাইকেল মধুসূদন। ৩য় সংস্করণ। কলকাতা। আশুতোষ লাইব্রেরী। ১৯৩০। ৫০ পৃ।

১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়। মধুসূদন দত্ত [সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত ২৩ সংখ্যক পুস্তক]। কলকাতা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্। ১৯৪২। ১১০ পৃ।

১৬. মণি বাগচি। মাইকেল। কলকাতা। জিজ্ঞাসা। ১৯৫৯। ৪, ১৮৫ পৃ।

১৭. মহেন্দ্র গুপ্ত। মাইকেল [জীবন সম্পর্কিত নাটক]। কলকাতা। বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪বি বৃন্দাবন পাল বাইলেন। ১৯৪২। ১১৬ পৃ।

১৮. মহেন্দ্রনাথ দত্ত। অ্যাপ্রিসিয়েশন্ অব মাইকেল মধুসূদন দত্ত অ্যাণ্ড দীনবন্ধু মিত্র [Appreciation of Michael Madhusudan Datta and Dinabandhu Mitra]। ২য় সংস্করণ। কলকাতা। মহেন্দ্র পাবলিশার্স। ১৯৫৬। ৪, ১, ৪২, ২ পৃ [ইংরেজীতে লিখিত]

১৯. মোহিতলাল মজুমদার। কবি শ্রীমধুসূদন। হাওড়া। গ্রন্থকারের পক্ষে শ্যামসুন্দর মাইতি। ১৯৪৭। ১২, ৩৪২ পৃ।

২০. ঐ। ২য় সংস্করণ। হাওড়া। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। ১৯৫৮। ৮, ১৮৫ পৃ।

২১. যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি। এসে অন মেঘনাদবধ অব মধুসূদন দত্ত [Eassy on Meghnadbadh of Madhusudan Datta]। কলকাতা। গ্রন্থকার স্বয়ং। ১৮৮৭। ২, ৯০, ৩২ পৃ [নামপত্রে গ্রন্থনাম ইংরেজীতে সন্নিবিষ্ট হলেও বইটি বাংলায় রচিত]

২২. যোগীন্দ্রনাথ বসু। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত। কলকাতা। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী। ১৮৯৩। ৯, ৪৯৯, ২৮ পৃ।

২৩. ঐ। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং। ১৯২৫। ২০, ৬৮২ পৃ।

২৪. রজনীকান্ত গুপ্ত। প্রতিভা। কলকাতা। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। ১৯১৮। ১৪, ১৬২ পৃ। [মাইকেল মধুসূদন দত্ত— ৯৫ - ১২৯ পৃ]।

২৫. শশাঙ্কমোহন সেন। মধুসূদন : অন্তর্জীবন ও প্রতিভা। কলকাতা। নলিনী-রঞ্জন ভট্টাচার্য। ৬৩ কলেজ স্ট্রীট। তারিখ নেই। ১৪, ১৯৮ পৃ।

২৬. ঐ। পুনর্লিখিত ২য় সংস্করণ। প্রতাপ মুখার্জি কর্তৃক সম্পাদিত। কলকাতা। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। ১৯৫৯। ১০, ১৮৮ পৃ।

২৭. শিশিরকুমার দাস। মধুসূদনের কবিমানস। কলকাতা। বুকল্যাণ্ড। তারিখ অনুক্ত। ৮, ১১৪ পৃ।

২৮. সিতাংশু মৈত্র। যুগন্ধর মধুসূদন। কলকাতা। মর্ডান বুক এজেন্সি। ১৯৫৮। ১২, ২৪৪ পৃ।

২৯. সুনির্মল বসু। মাইকেল মধুসূদন। কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৯৫৬। ২, ৬২ পৃ। [শিশুদের জন্য রচিত]

৩০. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। মধুসূদন: কবি ও নাট্যকার। কলকাতা। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। ১৯৬০। ৬, ১৫৬ পৃ।

৩১. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের সমালোচনা। [কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে পঠিত]। কলকাতা। ১৯০৪। ২২ পৃ।

মধুসূদন দত্ত-রচিত গ্রন্থাবলী

মাইকেল মধুস্থদন দত্ত যেসকল গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছেন, তার তালিকা—

বাংলা

শর্মিষ্ঠা নাটক। জানুয়ারি ১৮৫৯

একেই কি বলে সভ্যতা ?। ১৮৬০

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১৮৬০

পদ্মাবতী নাটক। ১৮৬০

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। মে ১৮৬০

মেঘনাদবধ কাব্য। প্রথম খণ্ড : জানুয়ারি ১৮৬১

দ্বিতীয় খণ্ড : ১৮৬১

ব্রজাঙ্গনা কাব্য। জুলাই ১৮৬১

কৃষ্ণকুমারী নাটক। ১৮৬১

বীরাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬২

চতুর্দশপদী কবিতাবলী। অগস্ট ১৮৬৬

হেক্টর-বধ। সেপ্টেম্বর ১৮৭১

মায়া-কানন। ১৮৭৪

ইংরেজি

The Captive Ladie. Madras, 1849

The Anglo Saxon and the Hindu (Lecture 1) Madras, 1854

Ratnavali. A Drama in four acts, Translated from the Bengali. 1858

Sermista. A Drama in Five Acts. Trans. from the Bengali by the Author. 1859

Nil Durpun, or The Indigo Planting Mirror, A Drama trans. from the Bengali by A Native. With an Introduction by the Rev. J. Long. 1861

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। দ্র. মধুসূদন দত্ত, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৩।

পূর্বপুরুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মধুসূদনের কবিতার সমালোচকেরা কখনও তাঁর জীবনকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। কিন্তু কাব্য-সমালোচনার এ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না ; তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, কবিকে তার জীবনচরিতে খুঁজো না। ইংরেজীতেও বলে, 'Poets are always our contemporary'। তাঁদের জীবনী ও জীবনকাল নিরর্থক। কবিত্বের বিচারে যুগ কিংবা পরিবেশের জন্য কোনো রকম হ্যাণ্ডিকাপ দেওয়া চলে না। এ সমস্তই সাহিত্যের রীতিবিবর্তন কিংবা সাহিত্যের ইতিহাসের বিবেচ্য বিষয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে খুব বেশি গর্ব করবার কিছু নেই। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়কে ধরে যদি দশম শতাব্দীকে বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল গণনা করা হয় তবে এই দীর্ঘ কাল-ভাণ্ডারে সঞ্চয় বড় অল্প। আমরা যার নাম দিয়েছি প্রাচীন সাহিত্য তার মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলী এবং কিছু শাক্ত গীতি বাদ দিলে সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে গণ্য করার মত আর কি থাকে ? মঙ্গলকাব্য-গুলির মধ্যে তো সমগ্র পুলিসবাহিনী নিয়োগ করেও সামান্য কবিত্বশক্তি খুঁজে বার করা যাবে না। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদগুলি পর্যন্ত বিকৃত, গ্রাম্য, অপাঠ্য। সংস্কৃত বিদগ্ধ সাহিত্যের কোনো প্রভাব প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পড়েনি, শুধু কিছু উপকরণই আহরিত হয়েছিল। এর কারণ অনেক জানি—দেশে অনাচার, বিদেশী শাসন, অশিক্ষা। কিন্তু সত্যিকারের সাহিত্য-কীর্তির সংখ্যা যে প্রায় শূন্য এ কথাও মেনে নেওয়া ভাল। ইংরেজি আমলের আগে পর্যন্ত এই রকমই ছিল।

মধুসূদন আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম প্রধান উল্লেখযোগ্য পুরুষ। কবিত্বচর্চায় তিনি সময় পাননি। ইংরেজিতে সাহিত্যসৃষ্টির অসাফল্য— এবং সে কারণে ক্রোধ, বিতৃষ্ণা তাঁকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করেছিল। বাংলায় তিনি সর্বক্ষণ নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস করে সময় অতিবাহিত

করলেন— অমিত্রাক্ষর, সনেট প্রবর্তন, পুরাণের নবপ্রয়োগ, বিদেশী মহা-লেখকদের অনুসরণে বাংলা কবিতার পুনর্বিন্যাস—এইসব কাজেই তাঁর জীবন কেটে গেল। নিজের মুখোমুখি বসবার সময় ছিল না তাঁর, সত্যকার কবিতা রচনার জন্য একটু সুস্থির নির্জনতা পেলেন না।

এ দেশের কবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম বিদেশী সাহিত্যে পারঙ্গম পুরুষ। কিন্তু তাঁর পাঠ ছিল অ্যাকাডেমিক। দান্তে ভার্জিল তাসো মিলটন ইত্যাদি মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন এবং এই সমস্ত মহাজনদের জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারেন নি। ইংরেজিতে রোমান্টিক কবি-সমাজ বা ফরাসীদেশের পার্নেসিয়ান দলের সঙ্গে সম্ভবত পরিচয় হয়নি তাঁর। ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করা যত না দুঃসাধ্য ছিল মধুসূদনের পক্ষে, তার চেয়ে বহুগুণ দুঃসাধ্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর যে-কোনো ভাষায় দান্তে কিংবা বাল্মীকির শিল্পপ্রকরণে কাব্য রচনা করা। এই ভুল করেছিলেন মধুসূদন, এবং এ ভুলের বোঝা কিছুদিন বহন করেছিলেন হেম-নবীন।

মধুসূদনের কবিত্বগুণ সম্বন্ধে সমালোচকেরা যে কথা বলে থাকেন তার মধ্যে অনেকে অতিরঞ্জন, প্রভূত দৃষ্টির আচ্ছন্নতা, তাঁর জীবনকাহিনীর চমৎকারিত্বের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু তাঁর কোনো কবিতাতেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের চিহ্ন নেই। জীবনের নানা ঘটনা আছে, ক্রন্দন আছে, যেমন 'আত্ম-বিলাপে', কিন্তু স্মৃতি নেই। অনুভবের অতল রহস্য নেই।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান সম্বন্ধে সমালোচকেরা যে-কথা বলে থাকেন— তার চেয়েও অধিক সম্মানের আসন তাঁর প্রাপ্য। ঈশ্বর গুপ্তের হাত থেকে তিনি আমাদের মুক্তি দিয়েছেন, খুলে দিয়েছেন অনেক জানালা-দরজা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুসরণ করেননি, কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকেই ভ্রান্ত পথের শিক্ষা পেয়েছিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের অনেক ভুল পথ পরবর্তী বহু কবি সযত্নে পরিহার করে সময় সংক্ষেপ করেছেন। মধুসূদন এ অর্থে আধুনিক বাংলা কবিতার আদিপুরুষ।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর নেপথ্যে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

> মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডে দেড়বৎসর থাকিয়া ১৮৬৩ সালে ফ্রান্সরাজ্যে গমন করেন এবং ভরসেল্‌স্ নামক তথাকায় সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এইসময়ে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নাম দিয়া একশতটি কবিতা[১] ছাপাইবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। কবিতাগুলির প্রত্যেকেই চতুর্দশ মাত্র পদবিশিষ্ট।
>
> রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর সম্পাদিত চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ভূমিকা

> মধুসূদনকে জানিতে হইলে— কবি মধুসূদন কি ছিলেন, তাঁহার হৃদয় এবং বুদ্ধি কত দূর বিস্তৃত এবং প্রগাঢ় ছিল তাহা বুঝিতে হইলে— চতুর্দশপদী কবিতাই খুঁজিতে হইবে।
>
> শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পাঠকেরা জানেন আত্মপ্রকাশের একটি সমর্থ মাধ্যমের অনুসন্ধানে মধুসূদনের সারাজীবন কেটেছিল। সেই বিপুল নিরীক্ষার সর্বশেষ পরিচয় তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী, যার বিদেশী নাম সনেট। মধুসূদনের পাঠকেরা জানেন এই সর্বশেষ আশ্রয়টির সম্ভাবনা কবির মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল এর আগেই। কৃষ্ণকুমারী নাটক সবে শেষ হয়েছে এবং মেঘনাদবধ সমাপ্তির তখনও অনেক দেরি, এমনই এক শারদদিবসে রাজনারায়ণ বসুকে প্রেরিত কবি-মাতৃভাষা নামে একটি সনেট আছে, চতুর্দশপদী কবিতাবলীর তৃতীয় কবিতাটি তার পুনর্লিখিত রূপান্তর। সূত্রসন্ধানের জন্য সমালোচকেরা আরও একটু পশ্চাদ্বর্তী হতে কুণ্ঠিত নন। ১৮৪১-৪২ সালে হিন্দু কলেজের একটি অকালপ্রবীণ কবিযশঃপ্রার্থী ছাত্র ইংরেজী ভাষায় নিজকে অনর্গল করতে চেয়েছিল, ইংরেজী ভাষার তদানীন্তনী কাব্যরীতিগুলি আত্মসাৎ করায় তার আগ্রহ ছিল অকপট ; আর কে না জানেন নবজাগরণের

১ সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ চতুর্দশপদীর সংখ্যা ১০২ এবং বসুমতী সংস্করণ ১০৯। বসুমতীর ১০৮ সংখ্যক কবিতাটি অবশ্য স্পষ্টই ষোড়শপদী।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সনেটের চেয়ে জনপ্রিয় কাব্যরীতি পশ্চিম পৃথিবীতে খুব কমই ছিল।

হিন্দু-কলেজ, বিশপ্‌স্‌ কলেজ এবং মাদ্রাজ প্রবাস, এই তিনটি স্তরে কবি মধুসূদনের প্রস্তুতিপর্ব। এরই মধ্যে ধর্মান্তর-গ্রহণের মত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে, অবশ্যই তাঁর কবিচরিত্র নিয়ন্ত্রণে তার আলাদা কোনো ভূমিকা আছে ব'লে আমার মনে হয় না। যে তরঙ্গসমাকুল দেশ-কালের মধ্যে মধুসূদন জন্মেছিলেন, বেড়ে উঠেছিলেন, সেখানেই তাঁর চরিত্র-প্রণয়নের সমস্ত উপাদান নিহিত ছিল। সে তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল, অথচ নবযুগের নায়কত্ব করার—মধুসূদনের ভাষায়—প্রমিথ্যুসের হীরাক্লীসের উত্তরাধিকার-সূত্রে নায়ক হবার গোপন অভিলাষ গুপ্ত ক'রে দিয়েছিল তাঁর চরিত্রে। তাঁর সম্মুখে ছিল সপ্ততীর্থের কবিসম্মিলন, ঐতিহ্য ও আদর্শের সূর্যালোকে বিভাসিত, অথচ তাঁর আপন পথটি কখনোই দুর্যোগমুক্ত হয়নি। সে দুর্যোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ কার্যকারণ সকলের জানা, আমি তার পুনরাবৃত্তিতে কালক্ষেপ করব না। শুধু উপসংহার করব : অতএব বিরোধে এবং বিক্ষোভে প্রণীত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার বহুপ্রয়াসে তাঁর কবিতার ইতিহাস সর্বদা আলোড়িত থেকেছে।

পুনরুক্তি করি : হিন্দু কলেজ, বিশপ্‌স্‌ কলেজ এবং মাদ্রাজপ্রবাস, এই তিনটি স্তরে কবি মধুসূদনের প্রস্তুতিপর্ব। বলাই বাহুল্য এ প্রস্তুতি সর্বাংশে ইংরেজী ভাষায় : খণ্ড কবিতা, নাট্য কবিতা এবং বহুখ্যাত রোমান্সজাতীয় দীর্ঘ কবিতা (যা মহাকাব্যেরই বিকল্প), সবই সেখানে উপস্থিত। এর সবগুলিরই অকিঞ্চিৎকরতা এর আগে একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু রত্নাবলী নাটকের অনুবাদসূত্রে কবিসত্তার যে চকিতজাগরণের প্রবাদ অত্যন্ত ক্ষীণভাবে হলেও প্রচারিত আছে, তার শুদ্ধিকরণের জন্যও এই কবিতাগুলি আর-একবার আমাদের দেখা প্রয়োজন। যে উচ্ছ্বসিত ভাবোদ্বেল অশান্ত কবিসত্তাটি এই ইংরেজী কবিতাগুলির মধ্যে পরিকীর্ণ, পরবর্তী বাংলা রচনাবলীতে তারই পরিমার্জিত সংস্করণ, তারই বিধিসম্মত পরিণতি, কিংবা হয়তো উত্তরণ। আসল প্রশ্ন একটি সর্বার্থসার্থক মাধ্যমের আবিষ্কার, তার জন্য নিরীক্ষার পর নিরীক্ষা। তারই জন্য সুবিপুল সংগ্রহ, ভাষাশিক্ষা, শব্দ ব্যবহারের পটুত্ব— অনুষঙ্গ রচনার অধিকার অর্জন ; ইংরেজী থেকে বাংলা

অক্ষরের নির্বাচন সেখানে বৈপরীত্যের সূচক নয়, অপেক্ষাকৃত নির্ভরোপযোগী আশ্রয়। ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কিংবা গৌরদাস বসাকের ভূমিকা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, কিন্তু তথাপি মনে হয়, সব পথই নিয়তিনির্ধারিত। যিনি ইংরেজী-ভাষাতেও নবযুগাপ্লুত স্বদেশকেই বিষয় হিসাবে মনোনীত করেছিলেন, এক উচ্চাশাপরায়ণ বিশ্বনাগরিককে যিনি ওই ভাষান্তরেই একটি আশাহত বাঙালী যুবকের মধ্যে ভেঙে যেতে দেখেছিলেন, পরবর্তী ভাষার প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা অনুমান করা যেতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র অনুমানই করা যেতে পারে।

নবযুগের সমুচ্চ আশাবাদ এবং হতাশাবিধুর রোমান্টিক চেতনা, উনিশ শতকীয় বাংলাদেশের কবিপ্রতিনিধি হিসাবে দুটিকেই তাঁর একত্রে অঙ্গীকার করতে হয়েছিল : সেই দ্বিকোটিক দ্বন্দ্বকে তিনি তাঁর শিল্পধারার কোনওখানে অস্বীকার করতে পারেননি। আত্মসচেতনায় উভয়েরই জন্ম, যে আত্মসচেতনা সহজেই সংশয়াকুল অন্তর্দৃষ্টিতে (sceptical introspection) নামান্তরিত হয় : আদর্শ এবং প্রত্যক্ষকে তখন আর কিছুতেই মেলানো যায় না।[২] অত্যন্ত অনায়াসেই পাঠক মধুসূদনের জীবনসূত্রটি অনুধাবন করতে পারবেন, কেন সেই কবি চলে এলেন ইপস থেকে এলিজিতে, কেন পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীর মধ্যেও নিজেকে সংগুপ্ত রাখতে পারলেন না, কেন গীতিগুচ্ছের নিরঙ্কুশ পরিসরেও ক্লাসিক বন্ধনের পিছুটানকে আমন্ত্রণ করে আনলেন। শেষের কথা-দুটি মধুসূদনের বিভিন্ন সমালোচকের উক্তির প্রতিধ্বনি, মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বপ্লাবী লিরিসিজ্‌ম এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে মহাকাব্য-রচয়িতার শস্ত্রব্যবহার একটি দ্ব্যর্থহীন জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের কথাই জানাতে চায়।

আমার আলোচনার বিষয় মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী। কিন্তু এই গ্রন্থখানিকে যেহেতু প্রায় সব সমালোচকই আত্মচরিতের সম্মান দিয়েছেন, আমি আমার পরিসরটিকে আর-একটু বিস্তৃত ক'রে নেবার সুযোগ তাই সহজেই নিতে পারি। উপরন্তু এই গ্রন্থের অন্তনিরপেক্ষ বহিরঙ্গ আলোচনা

২ কিছুদিন আগে মার্কিনী নন্দনতত্ত্বের এক পত্রিকায় অ্যালবার্ট কুক নামধেয় সমালোচক থারবেনতেস-এর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির আলোচনা করেছেন। সেখানে একটি সুনিপুণ আলোচনার ভূমিকায় আদর্শ এবং প্রত্যক্ষের জন্মবিবরণী দেওয়া আছে, তার একটি কথা : **In the Renaissance the question of appearance and reality ari‹es from the birth of a particular kind of consciousness of the self.**

সংবাদমাত্র, এবং যে-কোনো কারণেই হোক মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থাবলী এত বহুপরিচিত যে সেখানে প্রায় সব সংবাদই পুনরুক্তি। আমি সেই আলোচনায় কোনো আকর্ষণ দেখি না। তা ছাড়া চতুর্দশপদী কবিতাবলী এমন-একটি পরিণতি, যে পরিণতির আলোকশিখায় তাঁর সমস্ত কবিতার প্রবাহটি আরও সুস্পষ্ট দেখায়। মনে হয়, ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ সালের প্রবাসজীবনে, তাঁর চরিত্রের সামাজিক এবং অবচেতন প্রবণতাগুলিকে তিনি যাচাই করে নিয়েছেন, সূত্রায়িত ক'রে রেখেছেন এই কবিতাগুচ্ছে, হয়তো অসংর্কভাবেই।

রোমান্টিসিজ্‌ম্ একটি নবোদ্যম অভিযাত্রা, নিঃসঙ্গ এবং নিঃশর্ত। কিন্তু বাস্তব ও আদর্শের সংঘাতে, পূর্বেই বলেছি, রোমান্টিক কবিরা প্রায় সর্বত্রই নিরাশাকরোজ্জ্বল। রোমান্টিক কবিরা প্রায় সকলেই, যেমন মিল্টনের স্যাটান যেমন মধুসূদনের রাবণ, স্বর্গচ্যুত দেবদূত। স্বর্গের বাসনার পাশে তাঁদের মর্ত্যের অতৃপ্তি। তাঁদের মূল্যমানগুলি (values) ভেঙে যায় বলে সমস্ত পৃথিবীকে বিপুল নাড়া দিতে চান তাঁরা সমস্ত প্রচলিত সমাজধারণার বিরোধিতা করে। বিরোধ এবং অজস্র বিরোধ। তাঁদের সুন্দর রচিত হন জুগুপ্সায় (বোদলেয়র), অবৈধ প্রণয়ে (শেলী), স্বেচ্ছাচারে (বায়রন)। তাঁরা উপাসনা করেন শোকাঢ্য আনন্দের। কাঁটায় আকীর্ণ জীবনের মধ্যে গোলাপের আনন্দ ছিল ব্লেকের, করুণতম প্রতিবেদনে জাত মধুরতম আনন্দের কথা শেলী বলেছিলেন। এই শোণিতধারা প্রবল ছিল মধুসূদনেরও মধ্যে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে সনেট লিখেছিলেন ইংরেজী ভাষায়, শনিগ্রহে সন্ধ্যা, তার ভূমিকায় ছিল I despise everything earthly; তিলোত্তমাসম্ভবে পয়ারের বেড়ী ভেঙেছিলেন তার কারণ ছন্দের সাহায্য তিনি চেয়েছিলেন এবং ছন্দের শাসন চাননি; কৃষ্ণকুমারীতে শোকান্ত নাটকের সূচনা ক'রে দীর্ঘশায়ী ঐতিহ্যকে ভেঙেছিলেন; বৃহস্পতিপত্নী তারাকে সোমপ্রণয়ী হিসাবেই বীরাঙ্গনায় পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন তার কারণ প্রচলিত নীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না; এবং সর্বোপরি পুরাণের আশ্রয় পরিত্যাগ করে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে কাব্যের নায়ক ঘোষণা করেছিলেন, সেক্ষেত্রেও বহুকাল-প্রচলিত ভাবধারাকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার বাসনা ছিল যথেষ্ট। এবং এই সবগুলি বিরুদ্ধতার নিদর্শন এঁকে তিনি উত্তরকালের বাংলা কবিতার ভাগ্য নির্ধারিত করে দিলেন। সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যকে পুনর্বিচারের সম্মুখীন হতে হল, জানা

গেল একটি ব্যক্তির অভিজ্ঞতার হোমকুণ্ডে কবিতার পদধ্বনি কত গভীরভাবে টানে : কিন্তু গীতিকবিতার যায় মুক্তি। আসলে সনেট তো গীতিকবিতারই একটি প্রকারভেদ এবং বিদগ্ধজনেরা এমনকি চর্যাপদেই সনেটের প্রথম সূত্র প্রমাণ করতে কম পরিশ্রম করেন নি। মধুসূদনের প্রয়াস শুধু ওই গীতি-কবিতার মধ্যে নিজের নায়কত্ব ঘোষণা করা, সেখানেই তাঁর ভূমিকা।

পরন্তু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি: 'তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য'— এই শোকের উত্তরাধিকারও ভাবীকালের বাংলা কবিতায় সহজেই বর্তিয়েছে। উত্তরসূরী বাঙালী কবিরা নিশ্চিন্তভাবে জেনেছেন কবিতার সমস্ত পথই মাথুর, কবিতার আনন্দ যে প্রক্রিয়ায় জাত হয় তারও পারিভাষিক নাম ক্যাথারসিস : যার অন্তে দুর্লভ আনন্দ কিন্তু অব্যবহিত পূর্বে দুঃসহ যন্ত্রণা। এমনকি একটু নিম্নকণ্ঠে এমন কথাও বলা যায়, তিরিশের বা চল্লিশের বাঙালী কবিরা, একালের ভাষায় যাঁদের ক্ষুব্ধ যুবক (angry young men) আখ্যা দেওয়া চলে, তাঁদেরও সম্মুখে একটি অস্পষ্ট স্বদেশী প্রতিকৃতি ছিল সেটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের।

কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাবলীর পরিণতির মধ্যেও দেখা যায়, মধুসূদন অমন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজেকে, অন্তত সামাজিক অর্থে পৌঁছোতে দেননি। তাঁর ইংরেজী কবিতাগুচ্ছের শর্তহীন আবেগ বাংলা কবিতায় অনেক পরিমিত হয়েছিল, তা কি শুধু ভাষাব্যবহারের দক্ষতা? আমার মনে হয়েছে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এসে, হয়তো তাঁর আপন দেশকালের দিকে তাকিয়েই তিনি তাঁর দ্রুতিগতি প্রবণতার রাশ টেনেছিলেন, তাকে কি সন্ধি বলব? চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যেও শনিগ্রহসম্বন্ধীয় সনেটের স্থান আছে, কিন্তু পাঠক, সেটিকে পূর্বোক্ত Evening in Saturn-এর পাশে রেখে পড়ুন।

মধুসূদনের সামনে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে দুটি নবজাগরণ সংঘটিত হয়েছিল। একটির সূচনা ইতালীতে, পরেরটির জার্মানীতে। প্রথমটির নাম রেনেশাঁস, পরেরটি রোমান্টিক আন্দোলন। ন্যূনাধিক চার শ বছরের পশ্চিমী কবিতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবর্তনের ইতিহাস তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট ছিল, মধুসূদন তার থেকে মধ্যপথটি মনোনয়ন করেছিলেন। তাঁর রাবণ তাসসোর শয়তান নয়, আবার বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড নয়, সেখানে মিল্টন তাঁর সম্মুখে। চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে যে শ্যামশষ্পবিসারী আদর্শ বাংলাদেশ তাঁর কল্পনার অভীষ্ট

ইন্দ্রপুরী, তা শেলীর বিলুপ্ত অলকা নয় আবার হেল্‌ডারলিনের লুপ্ত পিণ্ডারের যুগের গ্রীস নয় (তাঁর ক্ষেত্রে স্বদেশের কালিদাসের কালের সভ্যতা), সেই বাসনা তাঁর মধ্যে নেই। আবার যদিও তাঁর জীবদ্দশাতেই ভিক্তর উগোও বোদলেয়রকে স্বস্তিবাচন জানিয়েছিলেন, তথাপি ভিক্তর উগোর প্রশস্তিতে যিনি অগ্রণী, তিনি এমনকি বোদলেয়রের নাম পর্যন্ত শুনেছেন কিনা তাও আমরা জানতে পারি না। আর সমস্ত ইংরেজ কবিকুলের মধ্যে আমন্ত্রণপ্রাপ্ত একমাত্র ভাগ্যবান লর্ড আলফ্রেড টেনিসন।

হয়তো নিজের প্রবল চারিত্রকে তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারেন নি, তাই বারে বারেই নিজেকে সীমা দিয়েছেন। তাই মহাকাব্যপ্রণয়নে নেমে ছন্দোমুক্তির সমস্যা তাঁর কাছে বড় আসন পেয়েছে, গীতিকবিতা লিখতে বসেও মহাকাব্যপ্রণেতাকে বসিয়ে রেখেছেন পাশে।

আমার নিজের ধারণা decadenceএর স্বরূপ তাঁর চোখের সামনে ধরা পড়েছিল বলে তিনি সদ্যজাগরিত স্বদেশকে সেই পতনের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করেছেন, এই সন্ধির একমাত্র কারণ তাঁর স্বদেশপ্রীতি। প্রমিথ্যুসের মত হীরাক্লীসের মত যুগনায়কত্বের অভিমান স্বকীয় ললাটে আরোপ করেছিলেন বলে তার দায়িত্ব অনুক্ষণ তাঁর গতিরোধ করেছে। অথচ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। কোনো সামাজিক আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। ধর্মব্যাপারেও একটিমাত্র ধর্মের বিষয় তিনি সতত অবহিত ছিলেন, সেটি কবির ধর্ম। রামমোহন রায় কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনকি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর মনে বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করেছেন এমন প্রমাণ নেই, এবং আমার পূর্বে স্থাপিত উক্তির জন্য এটি আর-একটি প্রমাণ।

মধুস্থদনের কবিতার মধ্যে গভীরতর দর্শনের অভাব ছিল, যে-কোনো পাঠকের কাছেই এই তথ্য সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে তাঁর আচার্য মিল্টন কিংবা দান্তে তাঁকে কোনো উপায়েই সাহায্য করেন নি। এমনকি যে পেত্রার্কা অথবা শেক্স্‌পীয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর জন্ম, সেখানকার প্লেটনিক প্রেমতত্ত্ব, কৃষ্ণাভামিনীর প্রতীকীকরণের আদর্শগুলি পর্যন্ত তাঁকে এতটুকু আন্দোলিত করে নি।

আসলে মধুস্থদন ছিলেন রূপদক্ষ, শিল্পী। পরন্তু, সেই নবযুগাপ্লুত স্বদেশের

হৃদয়দি ছিল তাঁর কাছে অর্পিত, তারই বাণীগুলি সুস্পষ্ট করে বলতে তাঁর সারাজীবন কেটেছে। অন্য কোনো দার্শনিকতার স্থান সেখানে ছিল না। তা ছাড়া চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল, এ বিষয়ে তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য ফ্রান্সেস্কো পেত্রার্কার সঙ্গে। সমকালীন সমানধর্মাদের মধ্যে রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাঠামো গড়ারও নিপুণতা ছিল না, নবীনচন্দ্র স্ফীতোদর দর্শনের স্বখাত সলিলে ডুবেছেন। বাকী বিহারীলাল চক্রবর্তী। বিহারীলাল মধুসূদনের পাশে না দাঁড়িয়েও মধুসূদনের অবচেতন প্রবণতাকেই আরও শরীরী করতে চেয়েছেন। অবয়বের যে বহিরঙ্গ রেখা মধুসূদন এঁকেছিলেন, তাকে অস্থি ও মজ্জায় প্রাণবন্ত করতে, লাবণ্যমদির করতে এই যুগের বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিহারীলালের স্থান মধ্যবিন্দুতে, তাঁর একদিকে অস্থির অসম্পূর্ণ একটি কবিসত্তা— মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অপরদিকে স্থিতধী দেবপ্রতিনিধি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬ নম্বর বাড়ি : কীর্তিগৃহ

সাগরময় ঘোষ

বাংলাদেশের দুটি গৃহের কথা মনে পড়ছে। এর একটি ৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোড, অপরটি ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। চিৎপুর রোডের দুই প্রান্তের এই দুটি গৃহ বাংলাদেশের কীর্তিগৃহ। প্রথমটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের গৃহ, দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের।

দুটি গৃহের অবস্থা এক, দুটিই জীর্ণ হয়েছে। এতে নূতনত্ব কিছু নেই, পুরাতন সব জিনিসেরই এমন দশা হয়। কিন্তু দেশের মানুষের মন যদি জীর্ণ হয়ে না যায় তা হলে কোনো পুরাতনেরই জীর্ণতার জন্যে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ থাকে না। কেননা, সাধারণত মানুষের মন জীর্ণ হবার জিনিস না, নিত্য নূতন মানুষ আসে নিত্য নূতন মন নিয়ে। দেশের মানুষের মনের চেহারা দিয়েই জাতীয়-চরিত্রের চেহারা বোঝা যায়।

অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও তার গৌরব রক্ষার জন্যে সচেষ্ট। রবীন্দ্র-নাথের বাসগৃহ, ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, সংরক্ষণের জন্যে উদ্যোগ দেখা

যাচ্ছে ; সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং অচিরেই শেষ হবে বলে আশা করা যায়। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উপলক্ষ্যেই এই উৎসাহ ও আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। এর জন্যে আমরা আনন্দিত।

মধুসূদনের জন্মশতবার্ষিক পালন করতে আমরা ভুলেছি। তখন (১৯২৪) দেশও স্বাধীন ছিল না, দেশের মানুষের মনও মুক্ত ছিল না। নিজের ইচ্ছা পূরণে অনেক বাধা ছিল তখন। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, এইজন্যে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি মেঘনাদবধ কাব্যের শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করতে, এবং তদনুযায়ী কাজ করতে, যেন অগ্রসর হতে পারি। তাঁর বাসগৃহ, ৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোড, সংরক্ষণের জন্যে যেন উদ্যোগী হই। এই গৃহটি কেবল তাঁর বাসগৃহই নয়, এখানেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রায় যাবতীয় গ্রন্থ।

মধুসূদনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—

"তিনি [মধুসূদন] পুলিশ কোর্টে দ্বিভাষিকের পদে উন্নীত হন। এই পদ লাভ করিয়া তিনি কিশোরীচাঁদের উদ্যানবাটিকা পরিত্যাগপূর্বক তদানীন্তন লালবাজার পুলিশ কোর্টের পূর্ব পারে লোয়ার চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড দ্বিতল ভবন ভাড়া করিয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন।

"এই বাটিতেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব ক্যব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা ?, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা নাটকদ্বয়ের ইংরাজি অনুবাদও এই বাটীতে অবস্থানকালেই সমাধা করিয়াছিলেন। বাংলাভাষায় রচিত তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থই পুলিশ আদালতে দ্বিভাষিকের কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় রচিত। ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিভাশালী মধুসূদন এই পবিত্র কীর্তিমন্দিরে তাঁহার জীবনের অপূর্ব সাহিত্যব্রতের প্রতিষ্ঠা করেন।"

কলকাতার ও কলকাতার বাইরের অনেক গৃহেই বিভিন্ন সময়ে মধুসূদন বাস করেছেন বটে, কিন্তু সেসব গৃহ সম্বন্ধে আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। এই বিশেষ গৃহটির মর্যাদা আলাদা। কেননা, এইটিই 'পবিত্র কীর্তিমন্দির' -রূপে বাংলাদেশের কাছে স্মরণীয়। শতবর্ষ গত হয়েছে, অনেক পরিবর্তনের

মধ্যেও এই গৃহটির গায়ে সেই পুরাতন নম্বরটিই আছে— ৬। মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস বসাক এই গৃহ-প্রসঙ্গে বলেছেন—

"It was in this memorable house that he [Madhusudan] wrote his principal works—*Sarmistha Tilottama* and *Meghnadbadh*.

"Had Bengal been England this house would have been purchased and maintained for being visited by the admirers of his genius."

বাংলাদেশ ইংলণ্ড না হতে পারে, কিন্তু গৌরবের জিনিস রক্ষায় এদেশ অমনোযোগী নয়। সুতরাং এই গৃহটি ক্রয় করে নিয়ে সংস্কার করে সংরক্ষণ করায় আশা করি অসুবিধে হবে না। আমরা জানি, এই গৃহের

মালিক—মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর।

ইজারাদার—মৌলভী মহম্মদ নুরুল ইসলাম।

২১৭ পার্ক স্ট্রীট। কলিকাতা

কয়েক বছর আগে, ১৯৫৫ সালে, 'বঙ্গসাহিত্য সমাবেশ' বিশেষ উদ্যোগ করে এই গৃহে মধুসূদনের জন্মতিথি পালন করেন। সেই সময়ে উক্ত সমাবেশের সম্পাদকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পত্রালাপ হয়, সরকার পক্ষ জানিয়েছিলেন বাড়িটির দাম আনুমানিক ২,০৬,৪১৫৲ টাকা। এবং বাড়িটি ক্রয় করার জন্যে উদ্যোগীও তাঁরা হয়েছিলেন। তার পর বিষয়টি চাপা পড়ে। আশা করি, পুনরায় বিষয়টি উত্থাপিত হবে, এবং একটা ব্যবস্থা হবে।

ধ্রুপদীর সম্পাদকই 'বঙ্গসাহিত্য সমাবেশ' সংস্থার সম্পাদক। মেঘনাদবধ কাব্য শতবর্ষপূর্তির এই সুযোগে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছে হল।

সমাধিলিপি

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত-মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'দাড়াও পথিক-বর . . '

কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবির অন্তিম অনুরোধ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দান্তের ষষ্ঠশত-বার্ষিক জন্মোৎসবে মধুসূদন-কর্তৃক প্রেরিত কবিতার প্রতিলিপি

চতুর্দশপদী। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কেন রাম নয়, কেন নায়ক তোমার
ইন্দ্রজিৎ? বলো, কেন প্রমীলা নায়িকা?
বলো, কেন মানুষের প্রাপ্য জয়টিকা
এঁকেছ অক্লেশে তুমি রক্ষের কপালে
শ্রীমধুসূদন? তুমি কেন বারবার
দূরে ঠেলে মানুষের ব্যগ্র বাহুপাশ
জড়াও রাক্ষসে? কেন বেদনার লালে
রাঙাও বিদ্রোহী দ্বীপ লঙ্কার আকাশ?

কারণ, উন্মার্গ সেই রাক্ষসের প্রাণ
মানুষের থেকে আরও বেশী মানবীয়।
কারণ, মনুষ্য ক্রমে দেবতার প্রিয়
হতে চায়; হতে গিয়ে শিল্পের আধারে
আশ্রয় না-পেয়ে হয় নকল-বাগান।
পরিণামী হাওয়া লাগে মিল্টনের হাড়ে।

অগ্নিহোত্রী কবি এক। ফণিভূষণ আচার্য

গ্রীক ট্র্যাজেডির এক পলাতক নায়কের মুখ
কপালে ক্লান্তির চিহ্ন রুধিরাক্ত যুদ্ধবিজয়ের
পরে সে বাড়াল চোখ নির্বিকার আত্মার গভীরে
শমিত গৌড়ের তৃষ্ণা—জলে নয়, আকাশের আদিম আগুনে
কিংবা এক জীবনের রক্তের সংগাতে প্রতিশ্রুত
বজ্রের স্বাক্ষর। দুটি মুষ্টিবদ্ধ অহরহ কঠিন শৃঙ্খল
দুঃখদীর্ণ, জ্বরাতুর ললাটের আকাঙ্ক্ষায় ঠুকে
পৃথিবীর দূরতম কোন এক মৃত সমুদ্রের সিঁড়ি বেয়ে
নিয়ে এল এক ঝলক হৃৎপিণ্ডের রক্ত উপহার।

সে রক্ত তোমার এবং সে রক্ত আমার
আমাদের পিতামহ এখনও জীবিত কিনা রক্ত-কণিকায়,
হে যুবক, সূর্যকে জিজ্ঞাসা করো। বৃদ্ধ পিতামহ
অক্ষয় বটের মত বেঁচে আছেন শিকড়ে শিকড়ে
জীবনের আদিম উল্লাসে আর নিবিষ্ট প্রত্যয়ে কিংবা
প্রত্যয়বিহীন এক মৃত নগরীতে।

না, সূর্যের পরমায়ু অন্তরীক্ষে আমাদের আত্মার গভীরে
চেয়ে ছাখো, লেখা আছে—লেখা আছে লবণাক্ত সমুদ্রের স্মৃতির বিস্তারে
বহুশত দূরগামী পণ্যবাহী জাহাজের ভিড়— অসংখ্য মাস্তুল আর আকাশের গান
ছাখো, সে জাহাজখানি ডুবে গেল আলিঙ্গনে বনরাজিনীলা
তীরের নারীর চোখে, দুচোখের কালো সাক্ষী রেখে,
তার নামও। সেই মৃত সমুদ্রের বরফের সিঁড়ি বেয়ে
একবার নেমে যাও যদি,

অতি পরিচিত স্বরে শুনতে পাবে গান এক, গান এক ক্লান্ত নাবিকের :
শতাব্দীরা জমে গেছে বরফের পাখার শুশ্রূষা
অগণিত মৃতস্তূপ, নির্বিকল্প শবের চিৎকার
নরকের দ্বার খোলো, হে প্রহরী, কালের প্রহরী
ওখানে আগুন পাব দুদণ্ড অন্তত,
নরকের আগুনেই সেঁকে নিয়ে এ দেহটা ফের
চাঙা হয়ে উঠব কাল, দাও খুলে নরকের দ্বার।
অথচ ফিরতেও হবে, অধীর প্রতীক্ষা বুকে শীতের জমিনে
প্রেয়সী দাঁড়িয়ে আছে উর্ধ্বচোখে ধানকাটা মাঠে
মৃত শতাব্দীরা যেন শত বাহু মেলে আসে উত্তরের হিমগর্ভ হাওয়া
ওখানে আগুন নিয়ে ফিরে যেতে হবে কিংবা শরীরে উত্তাপ
পীড়নে সঞ্চয় করে দুবাহুর আলিঙ্গনে মৃত প্রেয়সীকে ফিরে পাব।

গ্রীক ট্র্যাজেডির এক দিগ্বিজয়ী নায়কের মুখ
কপালে ক্লান্তির চিহ্ন অহরহ যুদ্ধবিজয়ের
পরে সে ঝলসানো দেহ অতিকষ্টে টানতে টানতে বের হয়ে এল
গত শতাব্দীর ক্ষীণ দাহশেষ ধোঁয়ার পর্দাটা

টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে ধানকাটা মাঠের কিনারে
অবসন্ন কণ্ঠে ডাকল প্রেয়সীর নাম ধরে
হাহাকার শোক তাকে তুলে নিল আদিগন্ত মাঠের নির্জন।

আগামী ফসলে চাষী চোখ রগড়ে চেয়ে দেখবে মাঠে
করুণ ধানের শিষে ফলে আছে মুঠো মুঠো সোনা রং সূর্যের অঙ্কুর ॥

রাবণ। গোপাল ভৌমিক

আমাদের লোভী মন নিরন্তর খোঁজে
স্বর্ণলঙ্কা হোক না তা যতই সুদূর ;
তুমি তার অধীশ্বর হয়েও তো মজে
রইলে না সে আনন্দে ; মায়াবী নূপুর
শুনে ছুটে গেলে পেতে ভুবনবাঞ্ছিতা।
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তুমি লঙ্কেশ্বর
দাঁড়ালে গভীর বনে যেথা ছিল সীতা,
মনসিজ সাধনার মায়াবী সম্বর।

সে কাননবাসিনীকে এনে স্বর্ণপুরে
শান্তি কই ? সব পুড়ে হয় ছারখার ;
বীরপুত্র মরে রণে, ভাই যায় দূরে,
মৃত্যুতে অটল তবু মানোনিকো হার।

লুব্ধ মন, ভীরু ইচ্ছা শশকের মত
অজেয় পৌরুষ দেখে হয় শ্রদ্ধানত।

মেঘনাদ। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিদ্যুৎ চমকালে তার দাম্ভিক শরীর দেখা যাবে ;
ততক্ষণ জয়ধ্বনি বন্ধ থাক্, কেননা পুরানো
বিশ্বাসে যায়না দেখা যাকে আমি বজ্রের স্বভাবে
নিনাদিত পেতে চাই ; যেন ওই টেবিলে সাজানো

পাতাগুলি পুড়ে যায়, আর্তনাদে শ্রবণবধির।
ঘরের দেয়ালে সব ভীষণ মমতা পিছু ডাকে,
তুমি নেমে এলে যুদ্ধে, মুখোমুখী, মেঘনাদ বীর
চেয়ে দেখি মৃত্যু কত তমোহীন প্রাপ্তি হয়ে থাকে
তোমার চরিত্র তুমি শব্দ দিয়ে স্পষ্ট ভেঙে গেছ
হে মধুসূদন! যেন জানে চতুর্দশপদাবলী
একা রাম সত্য নয়; বুঝি তাই দৃশ্যকে নিয়েছ
দ্বিতীয় পশ্চাৎপটে।— যেখানে রাবণ মহাবলী
কবিতার প্রতিভায় চিরদিন সম্মত বিরাট;

একশো বছর পরে আজো যার নির্ভীক ললাট॥

শ্রীমধুসূদন। সুশীল রায়

প্রার্থনা পূরণ করো।— যেন চতুর্দশপদী-পদে
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এনে রাখতে পারি। কবতক্ষ যদি
ক্ষীণতোয়া তবু ধন্য সান্নিধ্যের সুবর্ণ সম্পদে,
আমাকে কৃতার্থ করো— হতে দাও শীর্ণ শাখানদী।
ছোট শাখানদী আমি, হয়ে আছি ক্ষীণ নম্রস্রোতা,
কল্লোল বাজেনা গানে, তরঙ্গেও না বাজে গর্জন।
শতধারা নিয়ে আসে পুণ্যতোয়া—কে দেখেছে কোথা?
কার ঘরে নিত্য এসে দেখা দেয় শ্রীমধুসূদন?

নিবিড় অরণ্য মাঝে একাকী রয়েছি মাথা হেঁট,
জল অপর্যাপ্ত, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করি তাই—
এনেছি তোমার জন্যে বহুকষ্টে সামান্য সনেট
শতবর্ষ আগে যার জ্বেলেছ নতুন রোশনাই।
তোমার কথায় বলি, অন্য কথা কোথা পাব খুঁজে—
নমি আমি, নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে।

'কৃত্তিবাস'এর সৌজন্যে

আর-একটি শতবার্ষিক : রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির বছরে আমরা আর-একটি শতবর্ষপূর্তি-উৎসব পালনে উদ্যত হয়েছি। মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম প্রকাশের পর শত বর্ষ গত হল। ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে এই কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

কাব্যটির প্রথম শতবার্ষিক-উৎসব পালন উপলক্ষ্যে ধ্রুপদীর এই সংখ্যা—মাঘ ১৩৬৭ : জানুয়ারি ১৯৬১— বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হল।

এইসঙ্গে মধুসূদনের জন্মোৎসবও উদ্‌যাপন করা হল, এই মাসেই তাঁর জন্ম। ১২৩০ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি—তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন তাঁর মৃত্যু, তার পরেও অনেক বৎসর গত হয়েছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার বা তাঁকে স্মরণে রাখবার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করতে পারিনি। কিন্তু একবার দেশবাসী তাঁর কথা মনে করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর বছর-পনেরো পরে। ১৮৮৮ সালে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময়ে। শ্বেতপাথরের স্তম্ভের গায়ে খোদিত আছে—

This tomb is erected in the year 1888
by his grateful and admiring
COUNTRYMEN

মধুসূদনের মৃত্যুর পর এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে বছর-পনেরো দেরি হওয়ার হিসাব করে একসময়ে আমরা সেকালের মানুষকে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেকালের মানুষেরা তবুও সামান্য দেরি করেছিলেন। একালের আমরা তাঁদের ছাড়িয়েছি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, পনেরো বছর নয়, কুড়ি বৎসর গত হল, তাঁর জন্মশতবার্ষিক পালনের জন্যে চতুর্দিকে আয়োজন-উদ্যোগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিতাভস্মের উপর কোনো স্মৃতিস্তম্ভ আমরা নির্মাণ করতে পারিনি। সেকালের মানুষেরা এ জন্যে অবশ্যই আমাদের ধিক্কার দিচ্ছেন।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহটি সংস্কারের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্য হয়েছে। এজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের বাসগৃহটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডের গৃহটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা আমাদের জাতীয়কর্তব্য, জাতীয়-সরকারের কর্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "সুপবন বহিতেছে, জাতীয়-পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ— শ্রীমধুসূদন"। সে কথা এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত।

১৯৫৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে বাংলাদেশের নবীন প্রবীণ সর্বশ্রেণীর সাহিত্যিকবৃন্দের উদ্যোগে এই গৃহে মধুসূদনের জন্মোৎসব পালিত হয়। সেই স্মরণ-সভায় এই গৃহটি সংরক্ষণের বিষয়ে সকলে সমবেতভাবে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন। এই গৃহে অবস্থান-কালে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' সহ অন্যান্য কাব্য-নাটকাদি রচনা করে গৃহটির বিশেষ মর্যাদা রচনা করেছেন— এই গৃহ রক্ষার পক্ষে এইসব যুক্তি দেখিয়ে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এই গৃহে রচিত হবে 'মধুচক্র'; স্থানীয় সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র হবে এই গৃহ, এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে, গবেষণার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে, দেশবিদেশ থেকে কবি-সাহিত্যিকেরা এই কলকাতা শহরে এলে এখানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। আমরা পুনরায় তাই প্রস্তাবটি এখানে পেশ করলাম। আমাদের ইচ্ছা, সকলের সমবেত চেষ্টায় এই গৃহ সত্যই যেন রচিত হয় 'মধুচক্র'

গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে আমরা এই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে রাখলাম।

সুশীল রায়

কাব্যকথা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

পৌষ সংখ্যার পর

আচার্য অভিনব গুপ্ত কাশ্মীরীয় শৈব প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা— সুতরাং তাঁহার মতবাদের সহিত ভগবান ভর্তৃহরির মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষণীয়। যাহা হউক, এই দার্শনিক তত্ত্বালোচনা হইতে আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাউক। কবির সেই প্রাতিভ শক্তি যখন কোনও কারণে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তবে তাহাই অর্থদৃষ্টি ও শব্দ-সৃষ্টিরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে—ইহাই আমাদের বক্তব্য। অভিনবগুপ্তও তাঁহার লোচনব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ইহাই অতি সংক্ষেপে বলিতে চাহিয়াছেন—"ক্রমাৎ প্রখ্যোপাখ্যাপ্রসরসুভগং ভাসয়তি তৎ।" —এই প্রখ্যা (বা অর্থজ্ঞান) এবং উপাখ্যা (বা শব্দ-প্রয়োগ)— কিছু বিভিন্ন তত্ত্ব নহে— একই অদ্বিতীয় প্রতিভা বা বাক্-তত্ত্বের বিবর্তনপ্রক্রিয়ার স্তরভেদ মাত্র—"in the womb of the Supreme Word or the Highest Universal, after its seeming self-division or self-multiplication, there appears an infinite number of eternal *Ka'as (-Saktis,* potencies) or universals *(apara-samanyas)* —a hierarchy of ideas— each of which has its appropriate name and thought through which it is revealed." অতএব কবির প্রতিভা যখন বিবর্তিত হইতে থাকে তখন তাহা পরিণামে বৈখরী বাক্‌রূপ ধারণ করে— এবং তাহাই কাব্য। এই মতবাদ যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই, তবে বিশুদ্ধ শব্দকেই কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না; কেননা, তাহা প্রতিভারই স্থূল বিবর্তন মাত্র, এবং প্রতিভার মধ্যেই তাহা অর্থজ্ঞান ও সূক্ষ্ম পশ্যন্তী বাক্‌রূপে গূঢ়ভাবে বিরাজমান। সুতরাং প্রতিভাই যখন কাব্যবীজ এবং প্রতিভাই স্থূল শব্দাকারে কাব্যের বাঙ্ময় বিগ্রহ, তখন সেই কাব্যের শোভাহেতু অন্য কি

আর কল্পনা করা যাইতে পারে ?—কিছুই নহে। কেননা, যাহা প্রতিভার স্বরূপান্তর্গত নহে এমন কোনও বাহ্য পদার্থ কাব্যের বাঙ্ময় বিগ্রহের মধ্যে স্থানলাভ করিতেই পারে না। অতএব আপাতদৃষ্টিতে যে সকল ধর্মকে গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতি সংজ্ঞার দ্বারা পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে, সে-সকল যদি কবির বিবর্তনশীল প্রতিভারই অন্তরঙ্গ স্বরূপ ধর্ম হইয়া থাকে, তবে কাব্যবিগ্রহ হইতে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একান্তই অযৌক্তিক। কাব্যের বীজভূত প্রতিভা যেমন অখণ্ড এবং নির্বিভাগ, সেইরূপ কাব্যের বাঙ্ময় বিগ্রহও তুল্যভাবেই অখণ্ড ও নির্বিভাগ— তাহাকে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব, abstraction বা অপোদ্ধার-বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নহে। এবং এই প্রতিভা যেহেতু দৈবাধীন, ঐশী ক্ষমতা, অলৌকিক সারস্বত তত্ত্ব, সুতরাং কবির সচেতন সৃষ্টিক্ষমতার ইহা অতীত। সেই দৈবী সম্পৎ কবিকে শুদ্ধমাত্র আত্মপ্রকাশের medium বা আধার রূপে বরণ করিয়া থাকে— কবি শুধু যন্ত্রমাত্র। আচার্য আনন্দবর্ধন সেইজন্য বলিয়াছেন—

> সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্।
> অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি পরিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্ ॥

আবার—

> প্রত্যয়ন্তাং বাচো নিমিতবিবিধার্থামৃতরসা
> ন সাদঃ কর্তব্যঃ কবিভিরনবদ্যে স্ববিষয়ে।
> পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্তু সুকবেঃ
> সরস্বত্যেবৈষা ঘটয়তি যথেষ্টং ভগবতী ॥ - ধ্বন্যালোক ৩.১৭

আচার্য আনন্দবর্ধন ও তাঁহার ভাষ্যকার আচার্য অভিনবগুপ্তের প্রতিভা সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী মনে রাখিলে, ধ্বন্যালোকের কয়েকটি মতবাদ সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে। ধ্বনিকার অলংকারকে কাব্যের শোভাহেতু ধর্মরূপে নির্দেশ করেন নাই— তাঁহার মতে প্রকৃত অলঙ্কার 'অপৃথগ্‌যত্ন নির্বর্ত্ত্য'। কেননা, যেসকল সামগ্রী 'প্রতিভানির্বর্ত্তিত' সেইগুলিই কাব্যের স্বরূপান্তর্গত, আর সকলই কাব্যদেহের সহিত অসংলগ্ন। অবশ্য তিনি মাত্র পরক্ষণেই কাব্যে অলঙ্কারবিনিবেশনের কতকগুলি পদ্ধতি কবির পক্ষে অবশ্য পালনীয় রূপে নির্দেশ করিয়াছেন—

এষা চাস্য বিনিবেশনে সমীক্ষা—

> বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন।
> কালে চ গ্রহণ-ত্যাগৌ নাতিনির্বহণৈষিতা॥
> নির্ব্যূঢ়াবপি চাঙ্গত্বে যত্নেন প্রত্যবেক্ষণম্।
> রূপকাদেরলঙ্কারবর্গস্যাঙ্গত্বসাধনম্॥

—ইহাতে মনে হইতে পারে যে, আনন্দবর্ধনও অলংকারসমূহকে কাব্য-দেহ হইতে পৃথক্ বিশ্লেষযোগ্য কতকগুলি উপাদানরূপে মনে করিতেন, এবং অলংকার নির্বাচন বিষয়ে কবির সচেতন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিও যেন আনন্দবর্ধন স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। যদি ধ্বনিকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তব হইত, তবে তাঁহার প্রতিপাদিত প্রতিভাতত্ত্বের সহিত অলংকার নির্বাচন প্রসঙ্গে উপরিউক্ত নির্দেশের অবশ্যই বিরোধ দুষ্পরিহার্য্য হইয়াউচিত। কিন্তু ধ্বনিকারও এই স্থলে উর্ধ্বতম, পরমতম বা absolute দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই সকল নির্দেশ দিতেছেন না। শিষ্য-ব্যুৎপাদনের উদ্দেশ্যে আপেক্ষিক দৃষ্টি বা relative viewpoint আশ্রয় করিয়া অপোদ্ধারবুদ্ধির সাহায্যে কাব্যদেহ হইতে আপাততঃ অলংকারগুলিকে বিশ্লেষযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। এই কথাই আচায কুন্তকও অতি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন—

> অলঙ্কৃতিরলঙ্কার্যমপোদ্ধৃত্য বিবেচ্যতে।
> তদুপায়তয়া তত্ত্বং সালঙ্কারস্য কাব্যতা॥—বক্রোক্তি° ১.৬

আচার্য আনন্দবর্ধন যে কাব্যগোচর শব্দের বাচ্য লক্ষ্য ব্যঙ্গ্যরূপে ত্রিবিধ অর্থের অস্তিত্ব সাধন করিয়াছেন, তাহাও সেই অপোদ্ধার বুদ্ধিরই ফল। কেননা, কাব্য যেহেতু শব্দাত্মক, এবং সেই শব্দের সহিত অর্থ যখন অবিচ্ছেদ্য রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তখন প্রতিভানির্বর্তিত নির্বিভাগ শব্দ ও অর্থের শ্রেণীভেদ কল্পনা একান্তই অসম্ভব হওয়া সমীচীন। অতএব তিনি যখন কাব্যের বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপে প্রধানতঃ দুইটি অর্থভাগ কল্পনা করিয়া প্রতীয়মান অর্থকেই কাব্যের আত্মা রূপে নির্দেশ করেন, তখন তিনি তাঁহার প্রবর্তিত কাব্যনয়ের মূলীভূত প্রতিভাবিষয়ক প্রতিজ্ঞাবাক্যেরই (premises) বিরোধিতাচরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিরোধও যে বাস্তববিরোধ নহে, আপাতবিরোধ মাত্র, তাহা অভিনবগুপ্তপাদাচার্য তাঁহার লোচন ব্যাখ্যায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদন

করিয়াছেন—"স এক এবার্থো দ্বিশাখতয়া বিবেকিভির্বিভাগবুদ্ধ্যা বিভজ্যতে।" আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত লৌকিক ব্যবহারদশা অতিক্রম করিতে না পারিব, ততক্ষণ পর্যন্ত কাব্যের ঐরূপ বিভাগকল্পনা আশ্রয় করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; যেমন ব্রহ্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে, সেইরূপ কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে, এই ভেদজ্ঞান এবং নানাত্ববোধ অবিদ্যাদশায় অপরিহার্য। ব্যবহারদশা যখন আমরা অতিক্রম করিব তখন এইসকল আপাতপ্রতীয়মান নানা-প্রভেদপ্রভিন্ন প্রপঞ্চ যেমন অদ্বিতীয় চিদানন্দঘন পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে, সেইরূপ কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে পরম-উপলব্ধি যখন আমরা লাভ করিব তখন কাব্যের অখণ্ড বাঙ্ময় বিগ্রহের মধ্যে শব্দ ও অর্থের বিভাগকল্পনা, গুণ-অলংকার রীতি বৃত্তি প্রভৃতি ভেদ কল্পনা সকলই তিরোহিত হইয়া যাইবে। সেই কাব্যাস্বাদের পরমস্তরে উপনীত হইতে হইলে সহৃদয়কেও কবির ন্যায়ই প্রতিভাসম্পন্ন হইতে হইবে—একদিকে যেমন কাব্যসৃষ্টির প্রতি কবির 'কারয়িত্রী প্রতিভা'ই পরমহেতু, অন্যদিকে সহৃদয়ের চরম কাব্যাস্বাদের পক্ষে 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা' অপরিহার্য। দুই প্রান্তেই নির্বিভাগ অখণ্ড বিশুদ্ধ উপলব্ধি—স্থূল শব্দার্থ বিভাগ তিরোহিত, শাস্ত্র সেখানে মূক, সকল আলোচনা সেখানে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত। উপনিষদে যেমন ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তজ্জলান্ শান্তমিত্যুপাসীত," সেইরূপ কাব্যের পরমোপলব্ধি যাঁহার ঘটিযাছে, সেই আদর্শ সহৃদয় সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—

কবেরভিপ্রায়মশব্দগোচরং
স্ফুরন্তমার্দ্রেষু পদেষু কেবলম্।
বদদ্ভিরঙ্গৈঃ স্ফুটরোমবিক্রিয়ৈ-
র্জনস্য তূষ্ণীম্ভবতোহয়মঞ্জলিঃ॥

৭.

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, প্রতিভাই কাব্যের হেতু এবং শব্দই (এখানে 'শব্দ' বলিতে কবির প্রাতিভপ্রেরণা প্রকাশের যাহা কিছু সহায়ক, তাহাকেই ব্যাপকভাবে নির্দেশ করা হইতেছে) কাব্য। সুতরাং সেই বীজরূপিণী প্রতিভাকে কুসুমিত লতা বা আকাশচুম্বী বনস্পতিরূপে প্রকাশের জন্য শব্দই কবির একমাত্র আশ্রয়ণীয়। সেইজন্য কাব্যের বাঙ্ময়

বিগ্রহের প্রতি অবহেলা কবির পক্ষে একান্ত অনুচিত। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সেইজন্য বলিয়াছেন—

বাচি যত্নস্তু কর্ত্তব্যো নাট্যস্যৈষা তনুঃ স্মৃতা।
অঙ্গ-নৈপথ্য-সত্ত্বানি বাক্যার্থং ব্যঞ্জয়ন্তি হি ॥

অপিচ—বাঙ্ময়ানীহ শাস্ত্রাণি বাঙ্‌নিষ্ঠানি তথৈব চ।
তস্মাদ্ বাচঃ পরং নাস্তি বাগ্‌ঘি সর্বস্য কারণম্ ॥"

কাব্যসৃষ্টি যখন সার্থক, তখন প্রতিটি শব্দ আম্নায়বচনের মত অপ্রকম্প্য। কোনও পদকেই পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। কেননা, সেই পদ এবং মাত্র সেই পদটিই মূলীভূত প্রাতিভ প্রেরণার বিবর্তন, পদান্তরের বিগ্রহপরিগ্রহ তখন তাহার পক্ষে অসম্ভব। আচার্য্য আনন্দবর্ধন নিম্নোদ্ধৃত ধ্বনিকারিকাটিতে এই তত্ত্বটিই প্রকাশ করিয়াছেন—

উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যত্তচ্চারুত্বং প্রকাশয়ন্।
শব্দো ব্যঞ্জকতাং বিভ্রদ্ধন্যুক্তেৰ্বিষয়ীভবেৎ ॥

কবির শব্দপ্রয়োগ যখন চরম প্রকর্ষদশা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহার সারস্বত সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে— ইহাই 'শব্দপাক' রূপে কাব্যজ্ঞসমাজে পরিগণিত হইয়া থাকে—

যৎপদানি ত্যজন্ত্যেব পরিবৃত্তিসহিষ্ণুতাম্।
তং শব্দশাস্ত্রনিষ্ণাতাঃ শব্দপাকং প্রচক্ষতে ॥
আবাপোদ্ধারণে তাবদ্ যাবদ্দোলায়তে মনঃ।
পদানাং স্থাপিতে স্থৈর্য্যে হন্ত সিদ্ধা সরস্বতী ॥"

এক্ষণে, সে কোন্ অনির্বচনীয় প্রক্রিয়া যাহাতে কবির হৃদয়ে বিক্ষুব্ধ প্রতিভা আপনার প্রকাশের উপযোগী শব্দরাজি আপনি চয়ন করিয়া বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হয়, প্রতিভাদেবীর সেই 'পদসঞ্চার' কবির হৃদয়কন্দরে কিভাবে প্রথম ধ্বনিত হইতে থাকে, তাহা অতি গূঢ় গহন রহস্য। এই প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত ফরাসী কবি পল্ ভালেরি'র *Les Pas* শীর্ষক রূপক-কবিতাটি উদ্ধারযোগ্য—

Tes pas, enfants de mon silence,
Saintement, lentement placés
Vers le lit de ma vigilence
Procèdent muets et glacés.

Personne pure, ombre divine,
Qu'ils sont doux, tes pas retenus !
A l'habitant de mes pensées
La nourriture d'un baiser,

Ne hate pas cet acte tendre,
Douceur d'être et de n'être pas,
Car j'ai vécu de vous attendre,
Et mon cœur n'était que vos pas.

এই প্রতীকী কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একজন মনীষী ইংরেজ সমালোচক যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

At a first glance this might seem to be more than an account of the poet waiting for his mistress who is coming to him. But if this is right, the poet speaks in an oblique and stilted way. Why is his bed "le lit de ma vigilence" as if it were an abstraction? Who is "l'habitant de mes pensées", and why are his beloved's steps "enfants de mon silence"? In so careful a writer as Valéry such phrases are not used without reason. The answer, clear soon enough, is that the steps belong not to a human mistress but to poetry, the poetic impulse, on which the poet waits. Then the phrases fall into their place. The steps are "enfants de mon silence" because the new sense of creative power has been matured in a time of inactivity; "le lit de ma vigilence" is the waiting expectant self who will receive the visitant; " l' habitant de mes pensées" is the creative self which dwells among thoughts. The poem gives the mood of concentrated, confident, joyful expectation before creative activity begins. The symbols are entirely consistent and harmonious. This waiting for poetry is like waiting

for a mistress, is wating for a mistress. Shakespeare classes the lover and the poet together; Valéry makes them one. The mood of the expectant poet is that of the expectant lover. . . . ."

কবির হৃদয়কুঞ্জে প্রতিভার প্রথম পদসঞ্চার এবং আপনার অবাঙ্-মনসগোচর স্বরূপকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাণীবিগ্রহরূপে প্রকাশের দুজ্ঞেয় প্রক্রিয়া—যাহা ভারতীয় আচার্য্যগণ কাব্যসৃষ্টির গূঢ় রহস্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাই কি উদ্ধৃত রূপক-কবিতাটিতেও বর্ণিত হয় নাই ?

পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে অনেক মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে গিয়েছে। এজন্যে আমরা লেখকমহাশয় ও পাঠকবর্গের নিকট লজ্জিত।—স. ধ্রু.

অমৃতনায়ক

আনন্দ বাগচী

সামনে থেকে সরে যাও প্রিয়বন্ধু, প্রিয়তমা নারী,
যৌবন মায়াবী বড়, দর্পণে দুয়ার ভ্রম হয়,
এসো না নিকটে কেউ সুলোচনা, স্বপ্নের কেয়ারী
-করা ফুলবনে আজ ভ্রমরের নিমন্ত্রণ নয়।
এসো না প্রণয়চিহ্নে অঙ্গ ভরে, ছাড়ো দ্বার, যাব
অস্ত্রাগারে, কোন্‌খানে মৃত্যুমুখী অস্ত্রাগার আছে
হয়তো আমার রক্তে অবচেতনার অন্ধকারে
যেখানে পাশবপাশ মুক্ত হতে নিজেকে হারাব।
প্রতিদিন প্রতিরাত্রে নিষ্ফল সমুদ্র বুকে নাচে,
তরঙ্গ উন্মুক্ত করে চলে যাব, ইন্দ্রপতনের শব্দ হবে,
যজ্ঞাগার জতুগৃহ অগ্নিময় প্রস্তরে প্রস্তরে,
সংসারের তৈলচিত্র সরে যা'ও আপন গৌরবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারে স্বর্ণলঙ্কা জ্বলে
গুরুগুরু মেঘনাদ, দেবদূত যায় নি বিফলে।

প্রতিবিম্ব

তরুণ সান্যাল

প্রতিবিম্ব, ছ্যাখো ঐ নির্জন ব্যথার শিখাগুলি,
দূরের নক্ষত্র হতে রেখেছ দাহিকা অঙ্গরাগে,
ভস্মশেষ চিহ্নগুলি আমি নিত্য চিত্রে গড়ে তুলি
এই মুখে শ্লথ দেহে কেলাসিত রেখারুদ্ধ দাগে।
আরও কিছুদিন বেঁচে, ভালোবেসে, মুছে, ভালোবেসে,
নদীর কল্লোল হতে কিছু হাসি মুখে এঁকে যাব,
যে তীর্যক রৌদ্র, ঘেরা দেয়ালে বয়স হয়ে মেশে,
আরও কিছুক্ষণ পরে, সে রুপায় চিকুর বানাব।

মৃত্তিকা আমার মুখে, লোনাস্বাদে, গন্ধে ঘূর্ণিধূলা,
এমন মধ্যাহ্ন একা স্তব্ধ বীথি প্রান্তরে, শয়নে,
তটিনীরা নিদ্রা যায়, দূরে হীরা বালুবেলাকুলা
তৃষ্ণাগুলি নৃত্যপরা, স্মৃতি, দুঃখ নিঃশব্দ বয়নে,
কিছু ফুল হাতে রাখি, কিছু তার পিষ্ট আর্দ্র ছাপ
প্রতিবিম্ব, বীথিকারা রাখে নষ্ট ফুলের বিলাপ॥

ক্ষমা

দিলীপ রায়

দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে
শান্ত জনবিরল হ্রদের ধারে
একটি নিভৃত পান্থশালায় বসলাম শীতের নীল সন্ধ্যায়,
ধুমায়িত চায়ের পেয়ালার সামনে। চুমুকে চুমুকে চা
আর গল্পে গল্পে রাত্রি গাঢ় হল ;
বিকেলে ঘুম থেকে উঠে আশ্চর্য মনে হয়েছিল, কারণ
এক আশ্চর্য স্বপ্নের রাজত্বে ভ্রমণ করছিলাম
ভাষাহীন অব্যক্ত যন্ত্রণায়।

দ্রুত জানলাটা খুলে বাইরে এলাম একবুক নিশ্বাস নিতে
হাস্যমুখরা সুন্দরী তরুণী সখী
মধুর সংগীতের মত উচ্চরবে সঙ্গিনীকে ডাকছে সংকেতে
সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে : পট্টবাস পরিহিত প্রতিমার অপরূপ প্রতীক।

লজ্জায় লাল একটি লোক অবনত,
হয়তো সে লোভলোচনে জরীপ করতে চেয়েছিল
নবযৌবনে বিকশিত রমণীর অসমতল অবয়ব,
বিনিময়ে পেয়েছে সে হঠাৎ রোষে জ্ব'লে ওঠা কটাক্ষের তীব্র তিরস্কার।
অপরাধ ? ক্ষমা করবে নিশ্চয় সুন্দরী মৃদু কৌতুকে ॥

শৈশব

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

তুমি আসলে বাতাস আবার বাজাবে নূপুর,
শুকনো পাতার শরীরে করতালি,
শুকনো ডালে যৌবন-উল্লাস—
তুমি আসলে ভাঙা বুকে আবার জোড়াতালি
দিতে পারব, তোমাকে খুলে আমার বুকে আসন।
তোমার জন্য সুরক্ষিত গোপন এক সিঁড়ি
তুমি উঠতে পারবে সুনির্ভয়ে,
তোমার হাতেই আছে ঘরের চাবি,
আমি শুধু তোমার ঘরে দুয়ার আগলায়ে॥

ইতিমধ্যে অনেক দেশ বাড়ি ঘুরে এলাম,
অনেক মাটি অনেক ঘর অনেক মন ছুঁলাম,
তোমার মত একটিও মন দেখতে পেলাম না।
তোমাকে আমি বহু ঋতুর সলাজ রঞ্জনে
দেখেছি, হাতে ছুঁয়েছি বুক ভরে, মনে-মনে
বুঝেছি শুধু মনের পাখি ছুঁতে পেলাম না।

তুমি এসো যখন খুশি, আমি প্রতীক্ষিত ভালোবাসা,
আমি আবার স্নিগ্ধ হব তোমার হাসিমুখে।

শোনপাংশু

কমলেশ চক্রবর্তী

আমার মায়ার খেলা অন্ধকার, হে রূপবিতান,
কামনা যুবক জানে ফিরে আসে ঘন সে তমসা।
তোমার গগন ব'লে ভুল ক'রে ঘরের চাঁদোয়া
দেখেছি বিমর্ষ রোদে, ডেকেছিলে দারুণ দুপুরে।

তবে কি অশান্ত বন মর্মরিত কথার বাগানে
শব্দের মাঝে যে সুতো, শুঁয়োপোকা বাসনা মৃত্যুর,
এ দুই নৃত্যের মত কোমরের উত্তাপে মানুষ:
তোমার নিপুণ ক্ষমা অলজ্জিত আমারে লভেছে।

নির্ভার আলোক দেখে গন্ধবর্ণে পেয়েছি প্রবাদ:
ঘরের জানালা গ্যাখে দক্ষিণের গোলাপলতিকা,
সহাস্য কৌতুকে হানে বিষণ্ণতা ওথেলো তোমার,
কৃপণ, কৃপণ বড় সুকুমার কামুক যুবক।

কে রচে কাব্যের আলো তবে মায়াখেলায় তোমার
আমার অধুনা ক্লান্ত ভুলেছিল প্রণয়ী কুমারী
যে দেখে অচেনা চোখে অথবা সে উদাস হৃদয়
মদন ছাড়ে কি তাকে যদি আসে রক্তগোলাপ।

তোমার আকাশ হোক প্রতিশ্রুত ক্ষণিক রচনা,
এসো হে নিবিড় তুমি অন্ধকার এ-রূপবিতানে
মৃত্যুর মতন ধীর আলিঙ্গনে তীব্র বিতৃষ্ণা;
বিভায় ভাসাক তরী আমি নেব স্বপ্নের তোমাকে॥

সন্ধিপত্র

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আমাদের চতুর্দিকে অন্তরঙ্গ আগ্নেয় পরিধি।
শোণিতাক্ত কারুকার্যে গড়ে তুলি গাঢ় উপবন,
রক্তের প্রবাহে নীল শোচনীয় অন্ধকার নদী
অনিবার্য অগ্নিদাহে ছয় ঋতু জ্বলে সারাক্ষণ।

প্রত্যহের পুরোভাগে যাকে দেখি চক্ষের সম্মুখে
তারই প্রতিবিম্বে আমি চূর্ণ করি রক্তের নদীর
প্রতিটি স্বগত ঢেউ: সূর্যাস্তের সমারোহ বুকে
ফিরে যাই অন্ধকারে, অন্ধকার আমার শরীর।

যে বাতাসে আন্দোলিত তাল শাল তমালের বন
ধ্বংসের শিয়রে তার সমাচার মূঢ় ঝঞ্ঝাবাতে
অবিচল। প্রতিষ্ঠাকে প্রকাশেই করেছি বর্জন,
সন্ধিলগ্নে তাকে পাই আশ্বিনের জ্যোৎস্নাভরা রাতে।

সে দৃশ্যের অন্তরালে দৃশ্যপুঞ্জ জ্বলে অবিরাম,
পড়শির নিন্দাবাদ গাত্রদাহ কলকণ্ঠ-স্তুতি
সমার্থক উদ্দেশ্যকে সবিনয়ে জানায় প্রণাম,
অন্তিমে প্রস্তুত আমি; কালান্তক আমার প্রস্তুতি।

অতঃপর আচম্বিতে প্রতারিত পথিকের মত
বিহ্বল বিনষ্ট চিত্ত পরিণামে বিচূর্ণ বিশ্বাসে
প্রত্যহের দায়ভাগে সাময়িক সিংহাসনচ্যুত
সম্রাটের দাক্ষিণ্যকে ফিরে পাই যার সহবাসে
তারই নগ্ন দেহকান্তি অন্ধকারে জ্বলে ধীরে ধীরে
নিমেষে বিলুপ্ত আমি জ্বরতপ্ত মাংসের শিবিরে।

তথাপি যে মূল্যবোধে অগ্নিদগ্ধ যৌবনের পাখি
নীড় চায়, তাকে কোন স্বস্তিবাক্যে ফিরাব সন্ধ্যায়!
কিংবা আমি জলে উঠব আকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ একাকী
শুরু হবে প্রথাসিদ্ধ নিরাশক্ত প্রাগুক্ত অধ্যায়।
অন্বিষ্ট নীতি বা নেতি পরিহার্য ভেবে অতঃপর
কোন গাঢ়তম মন্ত্রে অভিষিক্ত হবে স্বয়ংবর।

অজ্ঞাত সে ইতিহাস। অনির্বাণ আগ্নেয় পরিধি।
সর্বস্ব অর্জনে রিক্ত ক্ষণিকের অবিকল সুখে
বিধাতার ধৃষ্টতায় চূর্ণ করে শৃঙ্খলিত বিধি
স্বরচিত সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলি তোমার সম্মুখে॥

মুছে যাবে

মঞ্জুলিকা দাশ

নিষ্করুণ দিনগুলো অসহ্য ব্যর্থতা নিয়ে জেগে আছে শিয়রে আমার।
কার যেন আগমনী-সংগীতের সুরে সুরে রক্তে বাজে সদাক্লান্ত এই হাহাকার।
এই পরাভব-জ্বালা— প্রতিশ্রুত, প্রেমে-অঙ্গীকার
জানে, জীবনের জ্বালা জানে ; মরণের পরে জানবে শান্তির আধার।

দুঃখময়, অথচ শান্তির মত স্মৃতি জানবে সব।
হারাবে না, হারাবে না— বলেছিল সেই কতদিন আগে আনন্দিত পূর্বরাগে
আরব্ধ উৎসব!
সেই কতদিন আগে, কত মাস আগে, কত রাত্রি, অযুত নিযুত কোটি
বরষ বরষ!

স্মৃতি : কেবলই এগিয়ে যাই শিক্ষকের ক্ষীণায়ু শিখার শান্ত সান্নিধ্যে নিবিড়,
পিছনে পারি না হাঁটতে ব্যথা আনন্দের গানে ;
অতচ দুঃসহ জ্বালা অস্তিত্বের অগোচরে কে আমাকে টেনে নেয়
শীতল আত্মার কাছে বৈদ্যুতিক টানে!

এইসব সম্মোহনী আমি জানি— ক্ষণিক, ক্ষণিক, ভস্মঅবশেষ-অগ্নি,
বৃথা যজ্ঞে আয়োজন!
মুছে যাবে এই জন্মে, জন্মান্তরে জাতিস্মর দুঃখের স্মরণ!

আলোর স্বপ্ন

বংশীধারী দাস

অন্তত এই টবের টুকরো সীমায়
খুঁজে ফিরি আজো আলোর স্বপ্ন, সুরভি ;
বহুপ্রযত্নে জল দিই গাছে,
হয়তো কখনো হেসে ওঠে লাল দোপাটি।

ব্যস্ত পায়েই উধাও সকাল, সন্ধ্যা ;
তবুও কখন বিকেল, সোনার বিকেল
ধুলোর ধোঁয়ার নগরেও দেখি
হঠাৎ মায়াবী আলোর ওড়না ওড়ায়।

ছুটির দুপুর উন্মন মৃদু হাওয়ায় ;
চমকিত হই হঠাৎ চুড়ির ধ্বনিতে,
সেই মুহূর্তে সময়ের সীমা
পার হয়ে শুনি আলোকিত এক ছন্দ।

প্রতিটি দিবস শত সংগ্রাম মিছিলে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তবু এখনো,
শ্রীমতী তোমার দেহতটে ঝরে
ক্ষণিক আলোর মুগ্ধ স্বপ্ন, সুরভি।

রসাভাস

শিবশম্ভু পাল

কোথাও পাব না শান্তি—রাত্রি চন্দ্র অথবা নদীতে।
কতবার বৃষ্টি ঝরে অন্তরঙ্গে ; চতুর্দিক স্থির।
প্রবল অবাধ্য ফোটে শিরায় শিরায়। রমণীর
ত্বকের মসৃণ অগ্নি জ্বলে যায় বিলোল ভঙ্গীতে।
আমি কি প্রবীণ কোনো শাস্ত্রীর মতন সুকঠিন
লৌহপিণ্ড বনে গেছি : প্রাণদণ্ড নির্বিকার দেখি ;
কত রক্ত শুকিয়েছে মধ্যভূমিতলে! হারাবে কি
সেইসব উজ্জ্বলতা, প্রিয়মুখবিভাসিত দিন!

প্রশান্তি কে দেবে বুকে শূন্যসীমা বালির ভিতর,
অপরূপ বিপর্যয়ে দেহময় আত্মা সচকিত,
ভিতর সংসারদেশ ভেঙেচুরে জ্যোতিষ্কখচিত
আকাশের স্পর্শ পাবে? চন্দ্র উঠবে কামনামন্থর?
সে তুমি বিরাজ করো, রজতাভ, ভরে দাও ঘর।
বারোটি প্রথম দিন মাসে মাসে আরক্ত চিহ্নিত!

ছবি

শোভন সোম

'হাতে খানিক সময় নিয়ে যে-কোনো দিন বিকেল বেলা এসো
আমি তোমায় দেখাবো সব ছবি।'

'সময় খানিক ছিল আমার মুঠোর মধ্যে, তবু আমন্ত্রণ
রাখতে পারিনি যে,
মাপ কোরো তাই।
ছবি আমার বুকের ভিতর, চোখের মধ্যে, যেন আমার নখে
ঘুরে বেড়ায় ওরা—

বর্ণ ওদের কারো বা ম্লান, আবছা ধুলোর প্রলেপ কারো উপর—
মুছতে ভীষণ ভয়;
ধুলোর প্রলেপ মুছে দিলেই ওরা আবার বেরিয়ে আসবে, তখন
ওদের চেনা রঙে-রেখায় স্মৃতি আমার বড় তীব্র কাঁটা—
ছবি দেখতে দারুণ ভয় পাই।

সময় খানিক আছে আমার মুঠোর মধ্যে, যাই না তবু কোথাও
আরো নতুন ছবি যদি বুকের ভিতর দখল দাবি করে।'

সিঁড়ি

মানস রায়চৌধুরী

এক

আমায় প্রণয় বুঝি ঝড়ের সন্ধ্যার আগে উদ্ভিজের স্তব্ধ আলোড়ন ?

মর্মরে বাঁধানো জল, চিরকাল সান্ধ্য রক্তিমতা,
কোনও এক রমণীর আঁচলে রেশমী অহংকার।
আমি তার খুব কাছে কোনো দিন যাব না, বয়স
স্তম্ভের বিশাল নীচে দাঁড়াবে রুগ্নতা যেন, একটি মুহূর্ত
তারকার রশ্মিপাতে নীলিমায় অলক্ষিত ক্ষণিক উদ্ভাস।

তুমি আরো উঁচু হয়ে ছোঁবে দীর্ঘ রাত্রির মন্দির
আমার দু হাত যাবে স্বপ্নে ভেসে—তোমার বুকের অধিকার
দিয়েছিলে কিশোরবেলার সাদা দেওয়ালের পাশে অনায়াসে
আজ মনে পড়ে গেল। শরীরী মালিন্য নামে জলের গভীরে
স্রোতে পরিশ্রুত গন্ধ, ফুলের নির্যাস রাখো বাঁদামী খোঁপায়…

নগ্ন বুকে স্মৃতিভার স্পষ্ট ফিরে আসে !

দুই

এক যুগ কেটে যেত তোমার বালিশে মাথা রেখে
স্মৃতিস্তম্ভে জোনাকীর নীল আলো, অনেক আগের প্রস্তাবনা :
ঘুম থেকে উঠে আমরা চলে যাব আরেক নদীর স্রোতে বেঁকে
অভিমান নয়। দিনরাত্রি সবই চোখের অতীত ছুঁতে চায়…
ছুঁতে চাই অন্ধকার। অদেহী মাটির স্পর্শ ধরা তো যাবে না
অথচ নিজের কাছে সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রাত্রির শৈবাল
ঢেকে রাখে ঠাণ্ডা জল, ভিতরে নামার ডাক শুনতে পেয়েছিলে
আমি সব বুঝতে পারি অন্ধকার, কণ্ঠস্বর আজন্মের চেনা।

পাহাড়ে নামাও সন্ধ্যা। বিকেলবেলার আলো স্মৃতির বাতাসে দুঃখময়
পিছনে তাকানো যেন জলভরা চোখের নির্মিত ইতিহাস
কাকে তুমি সঙ্গে নেবে ভেবেছিলে, আমি আছি তবু কি হবে না
মাঝরাতে ছুটে যাওয়া—আলিঙ্গন প্রান্তখোলা অদেখা খাদের!

তিন

চিনতে পারোনি তাই শরীরের ব্যবধান বিস্তৃত প্রাচীর মনে হল
রক্তের প্রতীক কেন ধরে রেখেছিলে দীর্ঘ শাড়ীর আঁচলে
রাঙানো অধর আমি কোনো দিন চাইবো না—অনিয়ত এলে
মনে পড়ে যেত সব, সময় সমুদ্র নাকি ব্রীজের তলার ঘোলাজল?

ভুলে যাওয়া কষ্টকর? আজ ভাবি ভীষণ সহজ।
করবীর নীচু ডালে ফুলগুলি হঠাৎ পীতাভ অভিমান
তারপর ঝরে গেল শব্দহীন। কেউ জানলোনা, এক, দুপুরের হাওয়া
দরজায় কড়া নেড়ে বলেছিল: ঘুমিও না, সমস্ত হারাবে একে একে।

আমি কিছু শুনিইনি। তা না হলে পায়ের পাতার মৃদুগতি
ঠিক শোনা যেত, আজ হাহাকার বাগানের সব চেয়ে উঁচু
পাকুর গাছের ডালে শব্দ তোলে— অদূরে দাঁড়িয়ে
কিছুই বোঝোনা যেন, মেঘে মেঘে দুজনেরই ঢের বেলা গেল।

চার

তবে কি পায়ের তলে নুয়ে পড়ি শেষে!

ঈশ্বরী, রাজার মেয়ে, যেরূপে তোমাকে দেখি তাতেই আমার
সব রক্ত ফিরে আসে। তুমি শুধু দাঁড়াও বুকের মাঝখানে
তোমার সম্মুখে রাখি আমৃত্যু নিশ্বাস
নাও তার উষ্ণ স্রোত— স্নায়ুর অন্ধতা যেন ছিঁড়ে নিতে চায়
স্ফটিক দুবাহু ঘেরা শেষ অন্তরাল,
আমাকে ফেরাবে? তুমি যাই হও, জানি
সংকল্প তোমার মানবীর।

পাঁচ

মিলন মৃত্যুর হাত ছুঁয়ে থাকে সারা দিনমান
পাহাড় পেরিয়ে এসে তোমার সান্নিধ্য পাবো, এমনি তীব্র আশা
তুমি ভেঙে দিয়ে খুব অনায়াসে উঠে গেলে। দূরের পাষাণ
গম্বুজে সম্রাট বুঝি ডেকেছিল তোমাকে মহিষী।

আমি মিলনের বুক ফিরে পাই অনেক বেলায়
যখন পাখীরা নামে ঝর্না পেরিয়ে সাদা উপত্যকায়
দীর্ঘ চুল এলো করে কে এক প্রাচীন মহীয়সী
রমণীর হাতছানি আমাদের নিয়ে যাবে মাঠ, বনভূমি
সমুদ্রের অন্য পারে— তুমি কেন অনাহূত এসেছিলে স্মৃতি···

দুপুর পেরোলে সব অচেনা সিঁড়ির ধাপ, থমকে দাঁড়াই কাকে দেখে ?

সোনা-পাগল

পরিচয় গুপ্ত

সোনা-পাগল একটি মানুষ
আমি দেখেছি
কেমন অবোধ শিশুর মত
তাল তাল সোনা নিয়ে
লোফালুফি করে,
খুশির ঝোঁকে মদ খায়
আর সেরা অবাস্তব স্বপ্ন দেখে!

লক্ষ্মী বৌ তার
ছায়ার মত পাশে পাশে ঘোরে
একটু আদর
কিংবা পুরুষালি রসিকতা,
কিন্তু ওখানেই ট্রাজেডী;
মানুষটা বলে—
তোমার ওই মাংসপিণ্ডগুলো
সোনা হলে
আমি আরও কটি শেয়ার কিনতাম!

বৌটা বিষ খেল।
আঁচল ভাঙা চিরকুট বললে—
অঙ্গ আমার সোনা নয়,
হৃদয়টা ছিল
তামাম সোনায় গড়া—

লোভী পুরুষটা কান পেতে শোনে
মৃত্যু-ঘন-উষ্ণতায়
সোনার তালটা
হাহাকার ক'রে গ'লে যাচ্ছে!

যখন যেদিকে যাই

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যখন যেদিকে যাই, দেখি
মানুষের মুখগুলি অন্তহীন শবযাত্রার
কুয়াসার কান্নায় আবৃত।

কোথাও একটি মুখ নেই বসুমতীর আশ্রিত
পাথর প্রতিমা ক'রবে যেই শিল্প ; ভ্রষ্ট পিতৃপুরুষের পাপে
প্রেমের রক্তাক্ত দেহ কাঁধে নিয়ে মানবচৈতন্য আজ
সর্বত্র ছ'ফুট জমি মাপে।

মাটি খুঁড়ে পিপাসার জল নয়, কবর বানায়
পৃথিবীর অসহায় বিংশশতাব্দীর ষাট দশকের যিশু ;
পক্বকেশ লোলচর্ম দন্তহীন দশমাসের শিশু
জননীর গর্ভ ছিঁড়ে তবু দেখে চারদেয়ালে ভোরবেলার অন্ধকার মুখ।

যখন যেদিকে যাই, মানুষের সমাজের কঠিন অসুখ
ত্রিনয়ন বিদ্ধ করে। দশদিকের ক্রুশবিদ্ধ উন্মাদের অন্তিম শিয়রে
মাটি নদী মন আজ ক্লান্ত, হত ঈশ্বরের ছোঁয়াচে প্লেগের মত জ্বরে॥

'মাইকেল-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী' সম্বন্ধে

ধ্রুপদী-সম্পাদক সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

ধ্রুপদী পত্রিকার 'মেঘনাদবধ কাব্য' শতবর্ষপূর্তি [মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারী ১৯৬১] সংখ্যাটি আমার এবং আশা করি সেইসঙ্গে বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পরম পরিতৃপ্তির কারণ হয়েছে। এই মহামূল্য সংখ্যাটির জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি। এই সংখ্যাটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ এর 'মাইকেল-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী' বিভাগটি। দুঃখের বিষয় উক্ত বিভাগটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয় নি। আমি মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে একটি বইযের নাম করতে পারি, যদিও বইটির মুল্য এবং পত্রসংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। সেটির বিবরণ—

চতুর্দশপদী ও পত্রাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমধুসূদনের জীবনদর্শন। লেখক বশীরলাল আলহেলাল। মুর্শিদাবাদ হাউস, জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত। দাম আট আনা।

মধুসূদন-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর তালিকায় বইটি নিঃসন্দেহে অপাংক্তেয় নয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক বাংলা কাব্যের নাম উপরের তালিকা থেকে বাদ পড়লে তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

৪।২।১৯৬১

শ্রীজগন্নাথ ঘোষ
পঞ্চম বর্ষ বাংলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উক্ত তালিকার সংকলক প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এ রকম তালিকা সম্পূর্ণ করা 'কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব'। পাঁচ জনের সহযোগিতা তিনি প্রার্থনা করেছেন। পত্রলেখকের এই সহযোগিতার জন্য সংকলকের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

মুদ্রিত তালিকায় কনক মুখোপাধ্যায় স্থলে কনক বন্দ্যোপাধ্যায় হবে।—ধ্রু. স.

একা এবং কয়েকজন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশক। দাম দুটাকা।

এলিয়ট ইয়েট্স্ শেলী কিংবা ব্লেকও নয়, (ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ তো নয়ই) এমনকি বদ্লেয়ার-মালার্মে-র‍্যাঁবোও নয়, ছাব্বিশ বছর বয়সের রুধির-বমনোন্মুখ তরুণ ইংরেজ কবি (যার নাম জলের অক্ষরে লেখা, সেই দুর্ভাগ্যতম কবি) কীটসের অমর কবিতাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য-প্রত্যয়ের ভাবভূমি। কীট্স্, বলা চলে, তাঁর আরাধ্যতম কবি। অন্যদিকে তাঁর কবিতার বাস্তভূমি রবীন্দ্রসন্নিহিতও নয়, বরং 'সাতটি তারার তিমিরে'র আশ্চর্য জীবনানুভবের কবি জীবনানন্দের কাব্য-প্রস্থতির সান্নবর্তী। কিন্তু আবেগের কৌলিন্যে এবং বলিষ্ঠ প্রোচ্চারে (কখনো কখনো শাণিত তির্যক ভঙ্গিতে) তিনি এক স্বতন্ত্র উপনিবেশের স্রষ্টা। বর্তমান দশকের প্রথম পাঁচ জন কবির নাম-তালিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামের উপস্থিতি সম্পর্কে বর্তমান আলোচক নিঃসংশয়। এবং তাঁর প্রথম কাব্য-সংকলন 'একা এবং কয়েকজন' সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় একটি স্মরণীয় সংযোজন।

কল্লোলকালীন সাহংকার আত্মঘোষণায় কবিতার যদিও বা স্বল্পতম আয়োজন ছিল, যুদ্ধকালীন আত্ম-ধিক্কারে তা লুপ্ত হয়ে কবিতার অপমৃত্যুকেই ডেকে এনেছিল। রবীন্দ্র-তিরোধানে এবং যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় কবিতা সম্পর্কে চলেছিল এক অভাবিতপূর্ব ভ্রান্তিবিলাস। পঞ্চাশের সন্নিহিত সময়ই সেই কাব্যবৈকল্যের ক্রান্তিকাল। কবিতার নবজন্ম-পতাকা পঞ্চাশের মাটিতেই প্রোথিত। উত্তরকালীন কবিতায় আর আত্মঘোষণা নয়, আত্ম-ধিক্কারও নয়, আত্মসমীক্ষা, বলা চলে, আত্ম-সংস্থতা। অবশ্য যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং জীবনানন্দ সেই ভ্রান্তিবিলসিত জগৎ থেকে মুক্ত। পঞ্চাশের কবিদের যাত্রা এইখান থেকেই শুরু। কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উত্তরাধিকার একালের অনেকের পক্ষে, বিশেষত বাংলা কবিতার পক্ষে, শ্লাঘনীয় হবে।

কবিতায় দুর্বোধ্যতা এবং অস্পষ্টতার বরফ গলতে আরম্ভ করেছে উনিশ শো পঞ্চাশের পর থেকে। দুরূহ ভাবকল্পনার কণ্টকশয্যা থেকে কবিতাকে

মুক্ত করবার দায়িত্ব পঞ্চাশোত্তর কবিরা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ব্যক্তিতন্ময়তার (subjectivityর) সঙ্গে বস্তুতন্ময়তার (objectivityর) সার্থক সমাহার ঘটিয়ে বহু সুস্থ মহৎ কবিতা রচনা করেছেন এবং কবিতা-পাঠের আসরে বহু জনসমাগম ঘটিয়েছেন। যাঁরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। কিন্তু তাঁর পথ কষ্টসাধ্য। কষ্টসাধ্য এই জন্যে যে, ব্যক্তিতন্ময়তা ও বস্তুতন্ময়তার সামান্যতম ভারসাম্যের বিচ্যুতি যেখানে কবিতার সিদ্ধি ক্ষুন্ন করতে পারত, সেখানে তিনি আশ্চর্য-নৈপুণ্যে তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা 'বিবৃতি-মূলক' সুতরাং 'ব্যঞ্জনাধর্মী নয়'—এই অবিবেচনা-প্রসূত অশ্রদ্ধেয় উক্তি আলোচ্য কবির ক্ষেত্রে শুধু অচলই নয়, অসংগত এবং তাঁর কবিতার রসাস্বাদনের পরিপন্থী। বস্তুমাত্রই সু-কবিতার ভিত্তিভূমি রচনা করতে পারে। কিন্তু বস্তুত্তীর্ণতায় মহৎ কবিতার সিদ্ধি। 'একা এবং কয়েকজন' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার এই সিদ্ধি বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে এই কাব্য-গ্রন্থের মিনতি, তামসিক, এক ঘুমের পর, ঘর, সাপ, একা, উপলব্ধি, দুই হৃদয়, একটি অনুভব, রাত্রি, সহজ— কবিতাগুলির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তিশালী কবি। তাই কোনো কবিতায় সামান্যতম দুর্বলতা পাঠককে বিচলিত করে।

> বাঁচাতে পারবে না তাকে উনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু
> দোষ নেই দায়ে পড়ে যদি বা ভজনা করে যীশু।
>
> —বিবৃতি

ইত্যাকার পংক্তি অন্য কোনো কবির রচনা হলে আমরা এতখানি ব্যথিত হতাম না। পংক্তিগুলি, নিঃসন্দেহে, বেদনার্দ্র। কিন্তু বিষয়কে উত্তীর্ণ হতে পারে নি বলেই রসোত্তীর্ণতার বিচারে বেদনাদায়ক। সুখের বিষয়, অনুরূপ দৃষ্টান্ত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে অবিরল নয়।

ব্যক্তিতন্ময় কবিতায় ব্যক্তিত্বকে (poetic personality) খুঁজি। সেই ব্যক্তিত্ব যত ঋজু এবং প্রখর হবে, কবিতা ততই পাবে হৃদয়স্পর্শী গভীরতা এবং অনিবার্য তীক্ষ্ণতা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল সেই প্রখর ব্যক্তিত্ব, যাকে অনেকেই নাটকীয় সংলাপমূলক বিবৃতি

বলে ভুল করেছেন। এই দশকের বিশিষ্ট অনেক কবির কবিতায় ব্যক্তিত্বের এই ঋজুতা এবং প্রখরতা দুর্লভ। তাই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার পাঠকমাত্রই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে প্রত্যাশাবান। কিন্তু ভয় হয়, পাছে কবি-ব্যক্তিত্বের এই ঋজুতা ভবিষ্যতে নিতান্ত নিরাবরণ স্পষ্ট ভাষণের সুলভ পরিণতি লাভ করে। অবশ্য কবি স্বয়ং তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের প্রতি সমান আস্থাশীল। অন্তত 'সহজ' কবিতাটি তার সাক্ষ্য। এই কবিতাটিকে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা রূপে চিহ্নিত করা যায়।

আধুনিক কালের এক শ্রেণীর উগ্র সমালোচক নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থের উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় হযতো সমাজবোধ আবিষ্কার করতেও পারেন। কিন্তু তাকে সমাজবোধ না বলে জীবনবোধ বলাই সমীচীন। 'ঝর্নাকে' কবিতায় কবি মৃত বাউলের মুখে মরণাহত হাসির নাম রেখেছেন 'বাঁচা'— জানি না, এর চেয়ে বর্তমান জীবনের রূঢ়তর উপমা আর কি হতে পারে। সেই সঙ্গে আছে বিষণ্ণ প্রাণের এক অপরাজেয় দৃঢ়তা। এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠের রুদ্ধশ্বাস প্রার্থনা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যাযের কবিতা কোন ধাতব ফ্রেমে-বাঁধা একেকটি তৈল-চিত্রের মত। তার প্রত্যেকটি তুলির টান বলিষ্ঠ, গভীর, অথচ সুসংহত। এবং প্রতিটি রেখায় কবিব্যক্তিত্ব স্পষ্ট। বিস্মিত হই, তাঁর কবিতার নাযিকা নেই, কবিতাই তাঁর নায়িকা। সেই নায়িকা তাঁর আরাধ্যা বৈদেহী মূর্তি তো নয়ই, ঠিক সঙ্গিনীও নয়। শরীরিণী এক আদিম নারী-সত্তা। তাকে ঘিরেই কবিতা নায়িকার দেহ ধারণ করেছে। এই কাব্যগ্রন্থে পরিবেশিত কবিতাগুলিকে রঙের কৌলিন্যেও অনুবাদ করা চলে। কোনো কবিতার রং রক্তিম, কোনোটি আবার শীতের সন্ধ্যার মত ধূসর। অর্থাৎ যৌবন এবং বিষণ্ণতা। বর্তমান নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের করুণ বিষণ্ণতা যৌবনকে বিদ্ধ করেছে। সেই বিধ্বস্ত কিন্তু ঋজু যৌবনের দূরান্বয়ী অপরাজেয় প্রত্যয়ে অধিকাংশ কবিতাই দীপ্তোজ্জ্বল। কবির ঝোঁক স্বভাবতই তীব্রতা তথা তীক্ষ্ণতার দিকে। উপমা এবং চিত্রকল্প-চয়নও তাঁর কবিব্যক্তিত্বের স্বভাবানুগ। তীক্ষ্ণ অথচ নতুন উপমা-চিত্রকল্প বক্তব্যকে পাঠকচিত্তে অনায়াস-স্থাপনে সহায়তা করেছে। কবি যে বিভিন্ন মেজাজের রচনায় সিদ্ধহস্ত, এই কাব্যগ্রন্থে তারও প্রমাণ অবিরল।

অপরপক্ষে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাচন-বিন্যাস তির্যক। তির্যক, সেই হেতু শাণিত। এবং প্রশংসনীয়। বক্তব্যটিকে পাঠকচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দৌত্যকর্মে, বলা চলে, তিনি 'চতুরের ভূমিকা' গ্রহণ করেছেন। তাঁর বাক্‌চাতুর্য আশ্চর্য-কুশল শব্দ-সমবায়ী প্রয়োগ-প্রযত্নেরই অভিজ্ঞান।

ফণিভূষণ আচার্য

সম্পাদকের কথা

রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাটি আমরা পুনরায় পড়লাম। সে-পুরস্কারে আমাদের আনন্দ আছে, কিন্তু বর্তমানকালে সাহিত্যের ব্যাপারে যেসব পুরস্কার চলেছে সেই জিনিসটায় আমাদের আপত্তি। যদিও যে-কোনো কাজের জন্যে মানুষমাত্রেই স্বীকৃতি পেতে চায়, পুরস্কার কামনা করে। কিন্তু পুরস্কারের মত নগদ-বিদায়ই যে সাহিত্যের একমাত্র স্বীকৃতি নয়— এ খেয়াল অনেকের থাকে না বলেই আমাদের এই আপত্তি।

বর্তমানে সাহিত্যের জন্যে নানারকম পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। কেননা, অনেকেই 'ভারতীরে ছাড়ি' এই বেলা 'লক্ষ্মীর উপাসনা' আরম্ভ করেছেন। এবং তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত লাভ কারও কারও অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে সাহিত্যের।

নগদ-বিদায়ের কাঙাল যাঁরা তাঁদের স্বভাবটাও কাঙাল। সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট ক'রে সাহিত্যিকের সম্ভ্রম ধূলিসাৎ ক'রে তাঁরা দ্বারে দ্বারে ঘুরে পুরস্কার পাওয়ার চেষ্টায় রত। তাতে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য লোককে বঞ্চিত হতে হয়— যদিও এ-বঞ্চনাটা কিছু না। কিন্তু আসল কথা এই— অযোগ্য এবং অসাহিত্যিকরা পুরস্কার লাভ করায় জনসাধারণের ধারণা হয় যে, পুরস্কৃত গ্রন্থকার নিশ্চয়ই সাহিত্যিক, এবং পুরস্কৃত গ্রন্থ অবশ্যই সাহিত্য।—এইখানেই ভয়। যতই মোটা ও মজবুত হোক, যে-কোনো রচনাই যে সাহিত্যপদবাচ্য নয়— তার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যে-পুরস্কারের সঙ্গে 'টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার' আছে, বিশেষ করে সেই পুরস্কার বেশি মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই আমাদের আপত্তি। গুণীরা কেউ-কেউ পাচ্ছেন, এইটুকুই যা সান্ত্বনা ; কিন্তু অগুণীরাও যে পাচ্ছেন এইখানেই আতঙ্ক।

কিছুদিন আগে একজন প্রকৃত গুণীর ভাগ্যে ছিকে ছিঁড়েছিল। তিনি পুরস্কার লাভ করেছেন খবর পেয়ে তাঁকে লিখি—

প্রাইজের ভীষণ বিরোধী
সুখী হই গুণী পায় যদি।
হোক সে রবীন্দ্রস্মৃতি, হোক অকাদামী—
ক্ষুরে তার নমামি নমামি।

আমাদের মনের এই বিরোধী-ভাবের কারণ এই যে, কেউই 'রাজকণ্ঠের মালা'র লোভে এই পুরস্কার প্রার্থনা করেন না, অনেকেরই লোভ 'দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণা'র প্রতি।

আরও কারণ এই যে, সাহিত্যিকদের সকলকে আবেদনকারীর পর্যায়ে নামানো হয়েছে—ফর্ম ভর্তি করে বই দাখিল করার নিয়ম কোনো কোনো 'পুরস্কারে'র রীতি।

এইসব ব্যাপারের জন্যে পুরস্কার জিনিসটাই একটা অবজ্ঞার জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো গুণী ব্যক্তি পুরস্কৃত হলে তাঁকে বাধ্য হয়ে তাই লজ্জিত হতে হচ্ছে— আমরা লক্ষ্য করেছি।

এইসব লজ্জা ও ক্ষোভের মধ্যে আমরা একটু আনন্দ জানাবার সুযোগ পেয়েছি। বাংলাদেশের একজন প্রকৃত কবি এবার ভারতরাষ্ট্রের কাছ থেকে সম্মান লাভ করেছেন। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৬১ সালের প্রজাতন্ত্রদিবসে 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করলেন।

অনেকদিন আগে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল-পুরস্কার পেলে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লাস করে উঠেছিলেন—

বাঙালি আজ গানের রাজা
বাঙালি নহে খর্ব।

আমরাও ঐ কথার প্রতিধ্বনি করে উঠতে পারি এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বলতে পারি ভারত'কবিসভার মাঝে তোমার করি গর্ব'।

সুশীল রায়

আধুনিক কবিতার সপক্ষে

অম্বুজ বসু

বছরশেষে সাপ একবার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ওই খোলস, যা এতদিন তার অঙ্গীভূত ছিল, আবরণ ছিল— কালক্রমে তা যখন জীর্ণ হয়ে নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে গেল তখন শরীর সেই ভার-স্বরূপ আবর্জনা ত্যাগ করতে দ্বিধা করল না।

কবিতা সম্পর্কেও ওই কথা। এ যুগে যা কবিতা, যা কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ, তাই হয়তো পরের যুগে অবশ্যপরিহার্য আবর্জনা-স্বরূপ। সাপের প্রাণের চেয়ে যদি তার খোলসটার উপর দরদ বেশি হয় তবে কৃত্রিম উপায়ে খোলসটিকে রক্ষা করাও যায় হয়তো, কিন্তু ভিতরের প্রাণীটিকে বাঁচানো যায় না। কালিদাসের যুগের অভিনব সৃষ্টি মেঘদূতের মত কাব্য এযুগেও হয়তো লেখা যায়, কিন্তু তাতে প্রাণ থাকে না।

তাই কবিতায় যুগ ও রীতিকে আমরা স্বীকার করি। যাঁরা বলেন, কবিতায় 'আধুনিক-অনাধুনিকে দ্বন্দ্ব অর্থহীন; বিচারের যদি কিছু থাকে, সে হচ্ছে কবিতা-অকবিতার', তাঁদের বক্তব্যের অর্থ তাই আমরা বুঝতে পারিনে। যা কবিতাই নয় তার আবার আধুনিক-প্রাচীন কি? কবিতা হলে তবেই না সেই প্রশ্ন? যা রূপের দিক থেকে কবিতা হয়েছে তাকেই যুগের দিক থেকে বিচার করে দেখতে হবে আধুনিক হয়েছে কি না— এই তো আমরা বুঝি।

প্রতিটি যুগের একটা রূপ আছে, সমস্যা আছে, সংকেত আছে। রাজ্য ঐশ্বর্য নারীকে ভোগ করতে যে আদিম মানুষ পশুর মত কাড়াকাড়ি মারামারি করেছে, জড়শক্তির প্রকাশকে ভয় করে পূজা করেছে দেবতা-জ্ঞানে, সেই স্থূল বর্বর বহির্মুখী জীবনের আদিম মহাকাব্যে আধুনিক জীবনের কোনো সমস্যা কোনো উৎকণ্ঠা কোনো চরিত্রই প্রকাশ পেত না। কেন যে স্বাস্থ্যবান স্বাভাবিক ভদ্র ও সম্পদশালী 'রিচার্ড কোডি' নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে দেন, কেন যে 'আট বছর আগের একদিনে'র নায়ক অশ্বত্থের ডালে

আত্মহত্যা করে তা ব্যাস বাল্মীকি হোমরের জানার কথা নয়। কিন্তু আমরা তো দেখছি নিউইয়র্কের স্বর্গচুম্বী হর্ম্যবাতায়ন থেকে কোটিপতিকে অকারণ যন্ত্রণায় লাফিয়ে পড়তে, ঐশ্বর্যময় জীবনের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য দুঃসহ লেগেছে ব'লে। ওল্ড টেস্টামেণ্টের মানুষ দাঁতের বদলে দাঁত নিয়েছে, চোখের বদলে চোখ; অথচ আমরা তো দেখেছি কলকাতার পথে পথে পঞ্চাশের মন্বন্তরে লোক কাতারে কাতারে মরেছে, অথচ কাঁচের জানলা ভেঙে হোটেল-রেস্তোরাঁ লুঠ করেনি।—এই রুগ্ন নীতিজ্ঞানের নিদারুণ তাৎপর্য কি ভবভূতি-ভার্জিলেরা অনুভব করতেন?

সেইজন্যই যাঁরা ব'লেন, সাহিত্যে যা শাশ্বত তাই আধুনিক— আমরা তাঁদের ব্যঙ্গ করি। যাঁদের বক্তব্য, চিরাচরিত বিষয়বস্তুর আধুনিক উপস্থাপন-কৌশলই আধুনিক কবিতা— আমরা তাঁদের কাব্যবোধকে করুণা করি। আমরা তাকেই আধুনিক কবি বলি যা এযুগের বিশেষ চরিত্র-লক্ষণে আক্রান্ত হয়ে, এ যুগের বিশেষ ভাবকল্পনা সংকট ও সমস্যাকে রূপায়িত করেও যুগান্তরে বেঁচে থাকার সামর্থ্য রাখে।—যা গতযুগের জীর্ণ-চূর্ণ-বিলুপ্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে নেই, যা-কিছু বর্তমানের কবিতার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন সেইসব পুরনো ভাব-প্রকরণ ত্যাগ ক'রে নির্মোকমুক্ত বিষধরের মত উদ্যত উদ্ধত হয়ে আছে।

এখন অবশ্য কবিতার ক্রান্তিকাল। পুরনো খোলস খুলছে বটে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে খসে পড়েনি। তাই আধুনিকতার পরিপূর্ণ রূপটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নে। কিছু কিছু পুরনো প্রসঙ্গ প্রযুক্তি মিশে রয়েছে আধুনিক ভাবনা-কল্পনার সঙ্গে। নূতনের স্বরূপটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে নজরে পড়ছে। সুতরাং অতীতে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছিল এখনও যদি তাই বলা হয় তবে তা আমাদের অন্ধতা।

কথাটা উঠছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আমরা জানি রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে নানা পর্যায় আছে। অবস্থাবিশেষে তিনি বারবার আধুনিক কাব্যরীতি অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন তবু আজও এই বিংশশতাব্দীর সপ্তমদশকে যদি সেই স্ব-বিরোধী উদ্ধৃতিটির পুনরুক্তি করতে হয় যে 'রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই' তবে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তা আমাদের অগভীর সমীক্ষারই সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ বলতে তাঁর বিশ্বাস জীবনবোধ শিল্পদৃষ্টি অধ্যাত্মচিন্তা— সব

মিলিয়ে যে কবি-ব্যক্তিত্বটিকে বুঝি তার মধ্যে কালানুক্রমিক বিকাশ আছে কিন্তু কোনো বৈপ্লবিক রূপান্তর বা গুরুতর ভাববৈপরীত্য নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক— এমন উক্তি অর্থহীন। আধুনিক কবিতা যে প্রকাশপদ্ধতিসর্বস্ব— এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে এই উক্তির জন্ম।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের ও আধুনিক বাঙালি কবিদের জীবনদৃষ্টির গুরুতর মৌল পার্থক্য রয়েছে। চুম্বকে বলা চলে, আধুনিক কবি অধ্যাত্ম-বিশ্বাসবর্জিত, ঈশ্বরের শুভঙ্করত্ব, চাই-কি অস্তিত্বে আস্থাহীন, জৈবধর্মবাদী, বস্তুনির্ভর, ইতিহাসচেতন, বিজ্ঞান অর্থনীতি রাজনীতি ও সমাজনীতির উপর আস্থাশীল, সর্বোপরি অধিকতর মানবমুখী।

বিষয়বস্তুর চিরন্তনত্বের কথা বলতে গিয়ে জনৈক আলোচক আধুনিক কবিতায় দেহবাদের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য শৃঙ্গারশতক থেকে গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতি থেকে বিদ্যাসুন্দর— দেহ ও দেহজ কামনা ঘিরেই রচিত হয়েছে বহুসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম আমলের কবিতা 'কড়ি ও কোমলে'ও দেহ তার জৈবধর্ম নিয়েই সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এতেই কি বিষয়বস্তুর অবিনশ্বরত্ব নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? লিরিক কাব্যের আগে কবিরা ছিলেন সামাজিক মানুষ, সমাজগত চিন্তাকেই তাঁরা কাব্যরূপ দিতেন। কবিতায় ব্যক্তিলক্ষণ— অর্থাৎ কবির একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা অনুভূতি— তাতে থাকত কি? প্রাচীন কবিদের বর্ণনা ও উপস্থাপন-রীতিতে পার্থক্য ছিল, কিন্তু চিন্তাধারায় কোনও পার্থক্য থাকত না। অথচ আধুনিককালে মোহিতলালের দেহবাদকে কেউ গোবিন্দদাসের দেহবাদ বলে ভুল করবেন না, সুধীন্দ্র দত্তের চিন্তাধারার সঙ্গে ওঁদের কারো মিল নেই। বুদ্ধদেব বসু আবার এঁদের সবার থেকে শতেক যোজন তফাতে হাঁটেন।

শব্দ দিয়ে কবিতা তৈরি হয়, সুতরাং সব কবিতাই এক—এ কথা বলাও যা, আর দেহবাদ আগেও ছিল বর্তমানেও আছে— এ কথা বলাও তাই। কারণ প্রেম-সম্পর্কিত ধারণার মত দেহবাদও আত্মনিষ্ঠ ভাবনা— ব্যক্তিভেদে তার রূপভেদ হয়, হওয়া সম্ভব। আর, যখন সেই ভেদ দেখা যাচ্ছে তখন তাকে অস্বীকার করা আর চাঁদের জ্যোৎস্না বিদ্যুতের দ্যুতি হীরামণির আভা আর প্রদীপের দীপ্তিকে এক বলা নিতান্ত অদ্বৈতবাদীর পক্ষেই সম্ভব।

কবিতা অবশ্যই বিষয়সর্বস্ব নয়। কবির ভাবকল্পনার রূপায়ণই কবিতা, সেই কল্পনার পাঠকহৃদয়ে অনুকম্পন-ক্ষমতাই কবিতা। যা অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে পারল না তা কবিতাই নয়। কিন্তু সঞ্চারিত হলে তা কবিতা হিসাবে গণ্য হবে বটে, আধুনিক কবিতা বলে গণ্য হবে কি? নৈব নৈব চ। ভালো কবিতাই যদি আধুনিক কবিতা হত তবে বহু ভালো কবিই আধুনিক কবি বলে গণ্য হতেন।

সুতরাং আধুনিক কবিতা হতে গেলে তার বিষয়বস্তুকে আধুনিক হতে হবে, প্রকরণও আধুনিক হওয়া চাই, উপরন্তু তা কবিতা হবে। আধুনিক বিষয়বস্তু আসবে কবির যুগচেতন মন এবং একান্ত স্বকীয় দৃষ্টিকোণের সহযোগে। না হলে যা সৃষ্ট হবে তা আধুনিকতার ভান— শব্দের ছলাকলা, ভিনদেশী আঙ্গিকের অনুকরণে যার সৃষ্টি। সেই ভানের মুখোশ খুলে ফেলার সাহস ও ক্ষমতা থাকা চাই আধুনিক কবিতার পাঠক ও সমালোচকের। কিন্তু এইসব পরগাছা কবিতা সনাক্ত করতে গিয়ে ভালো কবিতার মুণ্ডচ্ছেদ করা না হয় যেন! সেই সম্ভাবনা দেখেছি বলেই আমাদের এই নিবন্ধ রচনা।

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে সর্বজনীন অভিযোগ এর দুর্বোধ্যতা। সেই দুর্বোধ্যতার উপর কঠোর হতে গিয়ে একজন আলোচক এমন কথা পর্যন্ত লিখেছেন, 'যেখানে তাঁর [জীবনানন্দের] রচনা দুর্বোধ বা অসংলগ্ন, আমাদের বিশ্বাস, সেখানে তাঁর চিত্ত বিভ্রান্ত, অনুভব অগভীর।'

দুর্বোধ্যতা অবশ্যই কোনো গুণ নয়। কিন্তু দেশেবিদেশে সব প্রগতিশীল সাহিত্যেই আধুনিক কালে দুর্বোধ কবিতা যখন দেখা যাচ্ছে তখন তার হেতুও রয়েছে নিশ্চয়ই। দুর্বোধ্যতা কবিতায় এসেছে দু ভাবে।—

প্রথমতঃ, ভাবসংহতির জন্য প্রতীক-সংকেত এবং স্মরণ (allusion)-এর প্রয়োগে; যাতে ঐ সংকেতের অর্থ জানা থাকলেই কবিতার অর্থবোধ সম্ভব, নতুবা নয়। এ যুগে মহাকাব্যের বিষয়কে সংহত করতে হয় সনেটের মত ছোট্ট লিরিকে। করা যায় আধুনিক প্রকরণের কৌশলে। একটা গোটা উপন্যাসকে টি. এস. এলিয়ট ছোট একটি কবিতার মধ্যে পুরে দিয়েছিলেন। একালে এ ছাড়া উপায়ই বা কি আছে? তাই পাঠককেও পরিশীলিত হতে হবে লেখকের মতই; যাতে ঐসব প্রতীক এবং স্মরণ তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ স্যুররিয়ালিস্ট কবিতা। এ জাতের কবিতা স্বতঃই দুর্বোধ্য। এঁরা বলেন, বুঝবার জন্যে কবিতা নয়। মনের উপর বুদ্ধির শাসন লোপ ক'রে দিয়ে মগ্নচেতনার কবিতা লিখবেন এঁরা। অর্থ সন্ধান না করে শুধু শব্দের সংগীত দিয়ে, বিচিত্র রূপকল্পের গাঁথুনি দিয়ে এক বিচিত্র কবিতা রচনা করেছেন, কারণ তার ভিতরেই আপাত-অর্থহীন এক গভীর অর্থ ধরা পড়বে —এঁদের আশা। রোগী যখন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে তার কি অর্থ কিছু থাকে? তবু কে বলতে পারে তার অর্থ নেই। কারণ তখনই তার অবচেতন সত্তা কথা বলছে। এই ভাবে বুদ্ধিকে লুপ্ত করে মগ্নচেতনার স্বয়ংক্রিয়তায় স্যুররিয়ালিস্ট কবিতা লেখা হয়।

সুতরাং কবিতা দুর্বোধ্য হলেই নির্বিচারে কবিকে দোষারোপ করা অসহৃদয়তা। কবিতা সম্পর্কে পুরনো ধারণাটা পালটাতে হবে যে, ভালো কবিতা মাত্রই সহজবোধ্য। প্রাচীনকালের ছেলেভুলানো ছড়ার কি কোনো অর্থ ছিল? তবু তা কবিতা। নইলে মানুষের স্মৃতিতে হাজার বছর ধরে তা বাঁচত না। রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের ছড়াগুলো এবং 'সে' বইটার কি অর্থ আছে কোনো? তবু তা সাহিত্য। এই রকমই অনেক 'দুর্বোধ্য' স্যুররিয়ালিস্ট কবিতাও কবিতা। জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থটিও সাহিত্য গ্রন্থ। তার স্যুররিয়ালিস্ট কবিতাগুলি সার্থক হয়েছে কিনা তা আমাদের আলোচ্য নয়, কিন্তু এ কথা বলতে পারি সেগুলি কবির 'চিত্তবিভ্রান্তি'-জনিত নয়।

প্রতিটি যুগের অসংখ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে কালজয়ী হয় মুষ্টিমেয়। অসার্থক সৃষ্টি-অপসৃষ্টিই দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। তাই সত্যকারের যুগচেতন কবিতা চিনতে হলে দৃষ্টির একটু স্বচ্ছতা চাই, সমকালীন সংক্ষোভ ও আন্দোলন থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে স্রোতের গতিটিকে চেনা দরকার। দেশবিদেশের কবিতার গতির সঙ্গে মিলিয়ে নিজের সাহিত্যকে দেখলেই বোঝা যায় এদেশের কবিরা কোন্ পথে চলেছেন। তখন কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা ও সংস্কার দূর হয়ে রসনির্ণয়-ক্ষমতা নির্বাধ হতে পারে।

বাস্তিল

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

চারদিক বিসারিত বাস্তিল-দুর্গের অবরোধ।
পৈশাচিক জঘন্যতা অভ্যন্তর আনাচে-কানাচে
ঘৃণ্য পরিস্থিতি, লুপ্ত পদাহত স্বাধিকার-বোধ।
রোদ্দুরের আলো-আভা নিরুত্তেজ থমকিয়ে আছে।
অস্থিমজ্জামেদসহ ক্ষীণপ্রাণ—স্বল্পায়ু সমিধ
নিরবধি নৈরাশ্য ও প্রপীড়নে মুমূর্ষু অধুনা,
আকাশ আড়াল করে স্ফীত দুর্গ— উৎগ্রীব উদ্ভিদ
পল্লবে কণ্টকাকীর্ণ, নেই বন্ধুজনের দেখাশুনা।

উপরতলার লোক—যেন প্রস্তরনিমিত মাটি
হৃদয়বিহীন, অবরুদ্ধ ঘাঁটি—নিশ্চিহ্ন প্রয়াণ
রেখে—শঠতায় শৌর্যে কদর্য কৌশলে পরিপাটি
টিপে ধরে অবজ্ঞাত অধস্তন মানুষের প্রাণ।

বাস্তিলবিধ্বস্তব্রত-উদ্‌যাপনে হে দৃপ্ত নায়ক
নিস্পন্দ নির্বীর্য কেন? প্রস্তুত শাণিত রাখো নখ।

ওই রাস্তা ধ'রে কেউ হেঁটে যেত

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওই রাস্তা ধ'রে কেউ হেঁটে যেত! সহজিয়া আলো চতুর্দিকে,
ঝিলিমিলি বাবলাবন, চিত্রার্পিত বট দূর দিগন্তে! আমার
মনে পড়েছে আমার দশদিকে দুপুর ক্লান্ত নীলিমা, সে তার
বুকের গহন থেকে জ্বালিয়েছে দীর্ঘ বিসর্পিল শিখাটিকে।
স্বপ্নভারাতুর ওই রাস্তা ধ'রে কেউ হেঁটে যেত। কেউ আরও
সুদূর নীলিমা বুকে ব'য়ে তার সুপ্তি তার শিথিল মায়ার
স্তব্ধতা পুঞ্জিত ক'রে হেঁটে যেত লক্ষ্যহারা দিগন্তসীমায়:
ঝিলিমিলি বাবলাবন, স্বপ্ন চিত্রার্পিত, আর সহজিয়া আলো।

শুনেছি পথের শেষে নদী ছিল। হাওয়ার মুখেই সব কথা
জেনে ওই পথে সব বিকেলবেলার শান্তি ছড়িয়ে যেন কে
হেঁটে গিয়েছিল: তার বুকের গহনে নিশিপদ্ম, তার চোখে
আরও ঢের রাত্রি! সব লুকিয়ে সে সারা দেহে বিপুল স্তব্ধতা
দীপ্ত করেছিল— ওই রাস্তা ওই সহজিয়া দীর্ঘ বিসর্পিল
রাস্তা ধ'রে। মনে পড়েছে আমার দশদিকে দুপুর ক্লান্তনীল!

স্পর্শ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সাবধান, কুকুর আছে। যদি আসো তস্করের মত
পাঁচীল ডিঙিয়ে, রাত্রে, খিড়কিপথে, কৃষ্ণপূর্ণিমায়—
প্রাসাদ-হায়েনায় ছিঁড়বে টুঁটি, মুখে মারবে শত শত
থাবা, যা তোমায় চিনে সশঙ্ক কুক্কুটও মেরে যায়।
স্পর্ধাও কোরো না ঢুকবে খালিহাতে, যুযুধান প্রাণ—
আমার স্পর্শের ভিক্ষা পায় ওরা, তাই ভালোবাসে।
আজন্ম বিরহজ্বালা বুকে ক'রে তুমি মূর্তিমান
নও; তুমি জানি, কবি, শঙ্কাতুর প্রেমের আভাসে।

এই নগ্ন জিহ্বা, এই তরবারিসম ক্ষুরধার
দেহের দ্যোতনা ক্ষিপ্রহাতে পারি চূর্ণ ক'রে দিতে
তুমি জানো; নিষ্পলক ব্যাধির মতন প্রেমভার
তোমার, নিশীথপথে। দান্তে কি সংগীতে
ছুঁতে পেরেছেন স্বর্গ? পেয়েছেন কেউ কি ঈশ্বরে
স্পর্শছাড়া? স্পর্শ ছাড়া কিছু নেই ঘরে।

অভিজ্ঞান

শিপ্রা ঘোষ

তোমাকে স্মরণ করে কবিতা লিখিনি বহুদিন।
বালির রোদ্দুর-ওড়া ঘরছাড়া বাউল আকাশ
জানালায় চিত্রিত টব ক্যামেলিয়া : স্বচ্ছ ব্যবধান,
উজ্জ্বল সবুজ দিন ভেনাসের সুতীক্ষ্ণ চিবুক।

ল্যাভেণ্ডার-গুচ্ছে ভরা এইসব অন্তরঙ্গ দূর—
মসৃণ চিক্কণ দিন ভিজে পায়ে শান্তিনিকেতন
-পরিক্রমা : পাখির বুকের মত নরম নিশ্বাস :
হিজলের ম্লান কান্না জারুলের অস্ফুট আভাস।

কোনো কিছু স্বপ্ন নয় : অন্ধ নয় এপ্রিলের স্বচ্ছন্দ রোদ্দুর,
তোমার মাথার চুল! বাদামী রঙের চুল, বিস্তীর্ণ আকাশ,
কফি কিংবা সিগারেট : ফোঁটা ফোঁটা পাতাঝরা অসুস্থ বাতাস ;
স্ট্রবেরির লাল গন্ধ : সবুজ আতপ্ত রুক্ষ ঘাস।
শ্রান্ত বুক ছলছল : করুণ কান্নার বোবা ভাষা,
সাদা শাড়ি এলোখোপা বন্যচুল ম্লান তপস্বিনী—
ওডিকোলোনের গন্ধ, ক্যাথিড্রেল হাওয়ার সোনাটা ;

তোমাকে স্মরণ করে বহুদিন কবিতা লিখিনি॥

কবি

সুশান্ত বসু

কে তুমি গভীর বিপুল অন্ধকারে
পদাবলী গড়ো, পদাবলী ভাঙো একা ?
দু চোখে আমার তৃষ্ণার সরোবরে—
কে তুমি উদাস বাউল তাকালে ফিরে ?

তৃষ্ণা নামক সরোবরে কোন্ ভাষা
খুঁজে পেলে ওহে বাউল, কি পেলে দেখা-
আমি তো জানিনি, বিপুল অন্ধকারে
পদাবলী তুমি গড়েছ রাত্রিদিন !

আমার ঘরের অর্গল ভেঙে দিয়ে
সরোবরে তুমি ফোটালে পদ্মকলি ;
চারিদিকে দেখি অসীম নিখিলে আমি,
একি তৃপ্তির শিখা হয়ে জ্বলি কবি !

পালাবদলের এই পারানির কড়ি
বুক ভেঙে তুমি দিলে যে জলাঞ্জলি ;
আমি বাঁচি এই বিশাল বিশ্বে আমি—
তুমি কি নিঃস্ব, ভাঙো-গড়ো পদাবলী !

আশ্চর্য নীলের শেষে

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

হৃদয় ঘনিষ্ঠ হলে যৌবন সোনার প্রতিমা।
ও-রূপের শেষ নেই; অফুরন্ত; তৃপ্তি নেই যত করো পান
পরস্পর পাশাপাশি শান্তি আনে, সমুদ্রের গীতিগুঞ্জ-বাণী;
ওই হাত ধরে যাব উভয়ের কল্পনার পথে
যতদূর দৃষ্টি যাবে— অক্লান্ত হাওয়ারা সঙ্গী শুধু,
নীলকণ্ঠী বনরাজি আমলকি ছায়ারঙ্গ পথে,
যে আলো একান্ত, হাসি, সারণির সুনির্মল ধারা
-মুখরিত; প্রেমিক খুঁজেছে পথ, কেননা সমুদ্রে যাবে
সমুদ্র আশ্চর্য নীল, জানবে বন্ধু তারও শেষে নীল
দিগন্ত ডেকেছে কাছে, যে দিগন্ত প্রেমের নিখিল॥

উৎসমুখ

নন্দদুলাল সরকার

যাস্ নে, স্রোতের নৌকো দূরে কুয়াশায়, অন্ধ, শোন্ ওরে
ভোরের কন্যার প্রেমে মিছে কান্না ঝরালি, বকুল
বান্ধব-সন্নিধ-ধুলো, চন্দনের প্রলেপে আকুল
আঙিনায় পেশীর তরঙ্গ ভেঙে ক্লান্ত দেহভরে
দাঁড়ালে ক্ষণিক, দ্যাখ, শোকের হীরের ফোঁটা প্রস্ফুটিত সুচরিত্র ভোরে

দারুণ তৃষ্ণার কথা কোথায় বলবি, সুবদন
ওরে ও উৎসের মুখ, বন্ধ রাখ, শেষ অন্ধকারে
ভূমিষ্ঠ আলোর কান্না উদ্ভিন্ন তৃপ্তির শীর্ষে স্পর্ধিত যখন
হাহাকার, কোন্ পাত্রে ধরে রাখবি, অমিয় গরলে
তুই থাক অন্ধকারে, শোকে সুখে, বিপুল বিভ্রমে।

শেষ অন্ধকারে হাসলে আদিম আলোর কান্না, ক্রমে
মৃদু মৃদু স্রোতের নৌকার পাড়ি উন্মোচিত হলে
ওরে ও উৎসের মুখ, তুই থাক নিরালোক তীর্থের দুর্গমে॥

মনেতে মেঘের শব্দ

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমলগ্নে তুমি তো গিয়েছ ডেকে,
যন্ত্রণামাঠে বুনেও গিয়েছ সুখী, সুখী শ্যামধান।
আমি সে ধানের সবুজ আবেগ মেখে,
মনের সরোদে মীড়ময়ী সুরে বাজিয়েছি কল্যাণ।

অথচ তোমার তখন পাইনি দেখা,
মুগ্ধ সময় অতিক্রান্ত তুমি-আছ-অনুভবে।
সুখ তো জেনেছি আজ কান্নাকে শেখা,
সেই কান্নাই শোনাব আবেগ মূর্চ্ছনালীন স্তবে।

শৈশবী ধানে যৌবন এল হেমন্ত তার হাতে,
স্পর্শন দিয়ে আলিঙ্গনেতে তুলে নিয়ে গেল ঘরে।
প্রপালক মাঠ কান্নানিবিড় শিশির-ঝরানো রাতে,
সেই কান্নাই প্রতিধ্বনিত আজ আকাশের স্বরে।

আজকে আষাঢ়ে হারাওনি তুমি, এই কথা উপলব্ধ,
আকাশে বৃষ্টি, তবু সান্ত্বনা, মনেতে মেঘের শব্দ।

অনুভবের এক ঋতু

আশিস সান্যাল

একটি আলোর পাশে তুমি আজ নিষ্প্রভ শীতল
করুণ হাওয়ায় ক্লান্ত। আদিগন্ত অন্ধকার কৃতঘ্ন তুষারে
যেন স্থির প্রতিহত ভয়াল বেদনা।
স্বাদহীন সময়ের অবনত বিষাদের ঘরে
অবিরাম অভিশপ্ত। হে মমতা, বলে দাও তবে
প্রণতি হারিয়ে কেন দেহহীন বিক্ষত উপমা?

কেন আজ মধ্য-বেলা হারায়েছো কূল?
একটি পাখির শব্দে কেন সব সীমারেখা ভুলে
গাঙুরের নীল জলে ভাসায়েছ ভেলা?

বিদ্রূপে আহত বক্ষ। স্নেহরিক্ত নীরবতা ছুঁয়ে
অস্থির কঠিন রাত্রে মেঘকণ্ঠ বাজায়েছো তুমি।
ব্যর্থতায় প্রসারিত স্থির পটভূমি
দু হাতে খণ্ডিত করে কেন আজ স্নেহময়ী হয়েছ আঁধার?
বলে দাও কেন তুমি প্রস্ফুটিত এই মধ্যবেলা
গাঙুরের নীল জলে ভাসায়েছো আনন্দ তোমার।

সেদিন দু হাতে ফুল মনে পড়ে দিয়েছিলে তুমি
বলেছিলে ভালবেসে, 'প্রদীপ্ত নবীন
প্রণত প্রেমিক অর্ঘ্য অন্তহীন শাশ্বত প্রহরে
অমলিন, মনে রেখো এ আমার বিনীত প্রার্থনা।'
সেই থেকে শুভ্রতার উজ্জ্বল আভাসে
রেখেছি বিমুগ্ধ করে তরঙ্গিত ঘনিষ্ঠ সীমায়
মুখশ্রীমথিত দৃশ্য। এঁকেছি অক্ষরে
অবাক উজ্জ্বল ছবি শোণিতে আমার।

তবু কেন, হে মমতা, অনির্দিষ্ট অন্ধকার জলে
নিভৃত আলোর পাশে, আত্মঘাতী হয়েছ অঙ্গার ?

অথচ তোমার নামে আজো এক দীপশিখা জেলে
প্রতিষ্ঠা করেছি রাজ্য, একক আমার।
সূর্যোদয় প্রতিদিন প্রতিষ্ঠ সোনার
উজ্জ্বলতা এনে দেয়। সমৃদ্ধ প্রহরে
ভাঙি ব্যাপ্ত ধূসরতা। হে মমতা, আনন্দ অপার
দীপ্ত হই অন্য এক ছায়াঘন প্রান্তরের ঘাসে।

স উবাচ

পিনাকীনন্দন চৌধুরী

(নিপুণ শিল্পীর মত চায়ে ঠোঁট তোমার কপোলে চোখ রেখে,
—উল্টোটাই স্বাভাবিক ছিল)
বলল সে, "জানো লতা, তোমার হৃদয়ে মন মেখে
('শরীরে শরীর' এই শব্দ দুটো আশ্চর্য গোপনে সরে গেল ইঁদুরের মত দ্রুত।)
ঋতুরঙ্গে মেতে উঠতে হাওয়ার মতন ইচ্ছে করে।"
(চম্‌কে উঠলে না তো কই? দেখলেনা তোমার দেওয়ালে
ঋজু, দীর্ঘ, লম্বমান ছায়া! পুনর্বসু উজ্জ্বল আকাশে!
অমৃতপানের তৃপ্তি নিখুঁত অভ্যাসে
শেষ করে মৃদু শব্দে নামাল পেয়ালা।)
আবার সে বলে উঠল সমুদ্রের স্বরে,
"আমার রক্তের কোষে হেসে উঠলে যন্ত্রণায় তুমি
সংহত আদিম মন্ত্রে: ঋষিকণ্ঠে আনন্দের স্পষ্ট উচ্চারণে।"
(অনুক্ত উপমা এই: রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি
যেন এর অনশ্বর উজ্জ্বল হৃদয়
শিল্পিত ক্ষতের চিহ্নে পৃথিবীর কত কাছাকাছি।
'হায় সজনি, এ-কূল ও-কূল দুকূল ভেসে যায় বুঝি এই বার।'
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতন ও-দুটি শরীর
সুমসৃণ শিল্পে রত
স্বর্গ আর নরকের বিমিশ্র আঙ্গিকে।
অতঃপর, অভ্যস্ত সহজ ভঙ্গি
সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল— সিংহাসনে ওঠার গৌরবে।
আর তুমি! শরীরী উদ্‌বর্তে সাময়িক তাপ নিয়ে
রয়ে গেলে দোতালার বারান্দার অনন্ত গভীরে।
বিস্রস্ত শয্যায় জ্বলে অনির্বাণ আগুনের প্রেত।
জনান্তিকে বললে সে—অস্ফুট চীৎকারে—
"অথচ প্রেমের জন্যে প্রয়োজন অন্য এক স্বাদ।"

কোনো বন্ধুকে পত্রোত্তর

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দৃশ্যত সুখেই আছি, বন্ধু, তোর বিনীত ঈর্ষায়
আপাতত ভুল নেই। সুখী আমি খুব সুখী, আমি
পেশাদারী কর্মকাণ্ড ঘণ্টাকয় বিরক্ত দ্বিধায়
উড়িয়ে সুখ্যাতি পাই (গূঢ়সূত্র কিঞ্চিৎ প্রণামী…
মনিবের নামে কটি তুষ্টিবাক্য দ্বিতীয়পুরুষে)
গৃহস্থ দেয়াল দৃঢ়, ঊর্ধ্বতন উভয় কর্তৃও
কর্মক্ষম বর্তমান, কৃতদার যন্ত্রণার তুষে
অদ্যাপি আক্রান্ত নই (সম্ভবত পাত্রীপক্ষ সন্ধানী যদিও)।

দৃশ্যত সুখেই আছি স্বহিতব্রতের পরিধিতে,
আহারে শয়নে স্বপ্নে শুদ্ধ গৃহপালিত বালক
অনিশ্চিত অমসৃণ উচ্চাশার ঘোরানো সিঁড়িতে
সতর্কিত অনাগ্রহ, কাব্যে রুচি পদবাচ্য শিল্পের আলোক
ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি।
তবু বন্ধু, বুঝি না কখন
বড়ই দরিদ্র লাগে স্বকল্পিত স্বর্গের বুজরুকি;
দেশ-কাল-পাত্র কাঁপে, শিহরিত ভূলোক-দ্যুলোক
সক্রুত দেয়াল ভেঙে ছুঁতে যাই চিরন্তন অতিকায় প্রাবৃট অশোক
মুহূর্তে ফিরেও আসি— ব্যর্থ ক্ষুব্ধ লুণ্ঠিত অসুখী!

কণ্টকের প্রেমী

কুমুদ ভট্টাচার্য

আর ফুল দেখব না কাঁটাকে বলেছি জনান্তিকে।
বেদনায় বিদ্ধ ক'রে উর্ধ্বে তুলে নিয়েছে কখন,
এসেছে বুকের কাছে। স্বপ্ন দূরে দূরে স'রে যায়।
পুষ্পপ্রীতি হারালাম কুণ্ঠাহীন কণ্টকের প্রেমে।

তৃষ্ণা সারা আকাশের। তৃষ্ণা যুগযুগান্তবিস্তৃত।
আর, স্বল্পায়ত ক্ষেত্রে এই স্বল্পকালস্থায়ী স্থিতি।
এখানে কি এত তৃষ্ণা দিতে হয় একটি হৃদয়ে!
সে তৃষ্ণা যে মিটবে না, সে কথা বুঝতে ছিল বাকি।

বোঝা গেল দিনে দিনে। সব ফাঁকি ক্রমে পড়ে ধরা।
নীলাকাশ মেঘে ঢাকে। রক্তচ্ছটা কালো হয়ে যায়।
সোনা মাটি কাদা হয়। বারিবিন্দু ধূমে পরিণত।
প্রত্যুষের পুষ্প থেকে ঝ'রে যায় প্রদোষ-প্রত্যাশা।

কাঁটাগুলি তবু থাকে। আমি তাই কণ্টকের প্রেমী।
আর ফুল দেখব না কাঁটাকে বলেছি জনান্তিকে।

সমুদ্রনায়ক

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের শীষের মত কাঁপছিলে
বাত্যাক্ষুব্ধ সৈকতে। নিরন্তর দুরন্ত ঢেউ
ভয় দেখায় তোমাকে সমুদ্র সুন্দর।
তুমি কাঁপছিলে ঢেউয়ের দাপটে
ঢেউ জড়াতে চাইছিল তোমায়
ঢেউ প্রচণ্ড দৈত্য হয়ে এল
ঢেউ মনোহর নাগর হয়ে এল
ঢেউ দু হাত বাড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল
তোমার পায়ে উত্তেজনায়।
ভয় পেলে এবং সরে এলে পায়ে পায়ে
কাঁটাগাছ লুব্ধ দাঁতে কেড়ে নিল শাড়ী
নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল দেহ।
দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁপছিলে তুমি
কণ্টকিত দেহে; নগ্ন উরসে
লজ্জা কেঁপে পালিয়ে গেল দূরে।
কাঁটা তোমাকে ছিঁড়েছে কাল রাত্রেই
রাত কদর্য ছিল
হাওয়ারা উষ্ণ ছিল
ছানিপড়া অন্ধকারে
ভূমিকম্পে টলছিল তোমার ঘর, শয্যা, মশারি।
তোমার রাত কালকের অরণ্যছায়া
নেকড়ের লুব্ধ থাবা
ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে তোমার শরীর।
ভয়াবহ রাত ছিল কাল
গরিলার উল্লাস, দাপাদাপিতে
পাশব রাত্রির বিলাস ছিটকে পড়েছে চারদিকে

তোমার বুকের আগ্নেয়পাহাড়ের বিস্ফোরণে
এবং লাভাস্রোতের গলিত উৎসারে।

সমুদ্র জলদস্বরে আবৃত্তি করছে মহাজীবনের স্তোত্র
সমুদ্র আদিপুরুষ, সমুদ্র নীলকণ্ঠ শিব।
সমুদ্র দু হাত বাড়িয়ে এল
তোমাকে অপাঙ্গে ভিজিয়ে
আছড়ে পড়ছে তার ফেনার কুসুম।
তোমাকে ডাকছে সমুদ্রপুরুষ
চিতাবাঘ, অরণ্য, অন্ধকার, রোমশ গরিলা–
মুছে গেল তারা যেমন কাঁচের উপরে
হিমানী লীন হয়ে যায়।

তারপর সমুদ্র নামে এক নায়কের
আলিঙ্গনে তলিয়ে গেলে তুমি।

শুধু পটে লিখা

হেনা হালদার

তুমি কি কেবলি ছবি? কাঁচ-ঢাকা টেবিলের 'পরে
অচল ঘড়ির মত? সময়ের বহতা অন্তরে
কাটো না আঁচড়? তুমি ঈর্ষা-ভয়-হাসা-কাঁদা-প্রেমে
আলোড়িত মন নও! তুমি ছবি শুধু বাঁধা ফ্রেমে?
অথচ তোমার দৃষ্টি মৃত নয়। সেখানে অমৃত
এখনো রেখেছ ধরে। আজো তার তৃষ্ণা মেটেনি তো!
তুমি যদি ছবি তবে এখনো দুর্বার আকর্ষণ
ঠোঁটের ধনুকে করে অন্তহীন কী মোহ বর্ষণ!
বিক্ষত রাত্রির বুকে আমি এক শরবিদ্ধ-পাখী—
কোথায় পালাব বল? পার হতে স্মৃতির সীমা কি
পেরেছি কখনো?
তবু লোকে বলে ছবি শুধু ছবি
তুমি তার বেশি নও।
এই মন কেন মধুলোভী
ভৃঙ্গ হয়ে যেতে চায়— তুমি এক কাগজের ফুল
নৈঃশব্দের বৃত্তে বাঁধা।
রূপে-রঙে-আবেগে আকুল
এবং উন্মুখ হবে, নিঃশেষিত যন্ত্রণায় মন।
ব্যর্থতার পারে তুমি কী নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতন!

চৈত্রের প্রার্থনা

সুনীল বসু

আপাতত কাছে থাকো, গবাক্ষে জ্বলুক চাঁদ
মধুরাত্রি তোমার সান্নিধ্যে স্বর্গ হোক, আমি
ধন্য হই ঈপ্সিতার আকস্মিক স্বেচ্ছা-পদপাতে
স্বপ্ন আবির্ভাবে। যৌবন চিতাগ্নি হত, মন মরুভূমি—
অকস্মাৎ তুমি না এলে, অদৃষ্ট আমার ভস্ম হত
অবিশ্রান্ত অভিশাপে ; এখন সায়াহ্ন যেন
স্বর্ণমন্দির আকাশে, নক্ষত্রেরা স্ফুলিঙ্গ-কণিকা
অরণ্যে পিকের কুহর, জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড
তোমার স্পর্শের উজ্জ্বল অঙ্গারে, তোমার বাস্তব
অস্তিত্বের প্রলোভনে। কাছে এসো, আরো কাছে, বসো
পালঙ্কের একপাশে, সলজ্জিত জ্বলুক ঝাপসা সেজ—
নারীর নির্লজ্জ রূপ দেখি রক্তের উত্তেজিত আস্বাদে
রাত্রির নির্জনে। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে
আবির্ভূত হোক, আলোড়িত হোক নৃত্যের নিশ্বাস
বাসনার বর্বর বাতাস, ক্রমান্বয়ে ইতস্তত:
উপস্থিত অন্ধকারে প্রবিষ্ট দু জনে করি কোন—
আশ্লেষের তড়িৎ সঞ্চারে স্বর্গসুখ আবিষ্কার।
কাছে থাকো, হে যক্ষিণী, জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ডখানি ধরো করতলে
আমি রাখি করস্পর্শ তোমার আননে
কপোলে ললাটে চিকুরের মসৃণ প্রপাতে।
রক্ত আমার তৃপ্ত হোক, দৃষ্টি ধুয়ে যাক—
আনন্দের ক্ষরিত বৃষ্টিতে, মিলনের চিত্রপট
রাখা থাক্ স্মরণের জাদুঘরে
ধন্য হোক মুহূর্তের পুষ্পাধার ॥

খ্যাতি

সুশীল রায়

"হঠাৎ কী করে খ্যাত হওয়া যায়, বলতে পারেন?"

শুনে, গালে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলাম পন্থাটা।
অনেক পথের, কথা ভাবলাম— কংক্রিটের, পিচে-ঢালা,
কিংবা কাদা-ভরা, দাগকাটা গোরুগাড়ির চাকায়,
ধুধু-মাঠে ধানক্ষেতে। খুঁজে খুঁজে না পেয়ে শেষটায়
বৃহৎ অরণ্যে ঢুকে পড়লাম— তেমন পথের
আছে কিনা কোনো চিহ্ন সেই লতাগুল্মের মিছিলে।
কোথাও কিছু না পেয়ে, চোখে কিছু না পড়ায়, শেষে
দর্শনের দিকে তাকালাম; পেয়ে বৃহদারণ্যক
শ্লোকে শ্লোকে তন্নতন্ন খুঁজলাম পথের নিশানা।
নিশানা অবশ্য আছে, কিন্তু যেন শ্লোকের ল-ফলা
বর্জনের জন্যে প্রতি ছত্রে ছত্রে কঠোর আদেশ—
শোক চাই; সেই সঙ্গে চাই দুঃখ দুঃসহ দারুণ,
চাই তাপ, চাই কষ্ট, চাই কৃচ্ছ্র সাধনা ভীষণ।
ছত্রে ছত্রে শ্লোকে শ্লোকে লেখা যেন নির্মম চাহিদা।

অকস্মাৎ অবিলম্বে হাতে-নাতে হাতের নাগালে
প্রমাণ পেলেম যেই, তাকে ডেকে দেখালেম, ছাখো—

একটি শালুক ফুল ফুটেছিল রাঙা টুকটুকে,
জলে ছায়া ফেলেছিল— আশ্চর্য সুন্দর লাল ছায়া।
শান্তশিষ্ট ফুল যেই হাতছানি দিয়ে দিল ডাক
অমনি খ্যাতির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।
অবশ্য চুকিয়ে নিল দাম তার কড়ায়-গণ্ডায়।
কাকদ্বীপ। নিরাপদ স্থির শান্ত সুন্দর এলাকা
নিশ্চিন্ত আরামে দিন কেটে যায় গ্রাম্য মানুষের।

বিপিনবিহারী বেরা, তস্য প্রতিবেশী কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোড়ই-
চাহিদা কিছুই নেই নিত্য দিন-গুজরান ছাড়া,
খ্যাতিতে ছিল না মতি, তবু খ্যাতি এসে গেল ঘরে।
উনিশ-শ-আটান্নর সেপ্টেম্বর উনিশ তারিখে
হঠাৎ দুজনে পেয়ে গেল বড়-বড় হেডলাইন।

"কী ক'রে ঘটল তা শুনি! দেখি দেখি, কী ক'রে কী ক'রে!"

ওদের দুইটি মেয়ে কচি কচি পা ফেলে পা ফেলে
ইস্কুলে যাচ্ছিল, পথে রাঙা পাপড়ির ডাক শুনে
থমকে দাঁড়াল, ধীরে একে-একে এক-পা দু-পা করে
ক্রমে ক্রমে নামল ঢালু পাড়টুকু, নেমে গেল জলে—
হাঁটুজলে মাজাজলে বুকজলে—ও রে, ও রে, ও রে—
ডুবজলে নেমে গেল। অমনি আচম্বিতে
শিরীষের ডাল থেকে কালো কালো কাক এক ঝাঁক
ভয়ার্ত চীৎকার তুলল. উড়ল দিগ্বিদিকে।

খবর পেয়েই ছুটে এসেছিল জলার কিনারে
বিপিনবিহারী বেরা, তস্য প্রতিবেশী কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোড়ই।
ওরা তো জানত না খ্যাতি পাবে, তার দিতে হবে দাম—
খবরের কাগজের পাতা খুলে তাকে দেখালাম।

চীনা কবিতা। দিলীপ দত্ত। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। দেড় টাকা।

চীন-সভ্যতা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। শুধুমাত্র প্রাচীন বললে সম্ভবত কিছু বলা হয় না, যদি-না সেই সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের গোচরে থাকে। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে সেই সভ্যতার অন্তর্নিহিত রূপটি এবং তার ধারাবাহিক পরিণতির ইতিহাস আমাদের স্মরণে রাখা অবশ্যকর্তব্য। চীন সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতার, ক্ষেত্রে সেই অনুধাবনযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হল প্রকাশভঙ্গির স্বল্প সংযত রূপটি। লেখকরা লিখেছেন কম, পাঠকদের ভাবিয়েছেন বেশি। প্রাচীনকালের সেই সংযত বাচনভঙ্গির ধারাটি আধুনিক চীনাসাহিত্যে আজও প্রবহমান। এর আগে অনুবাদকের হাতে তা আনন্দের সঙ্গে পাঠযোগ্যও হয়েছে; কিন্তু বর্তমান চীনা কবিতা সংকলন -গ্রন্থের অনুবাদক দিলীপ দত্তই বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে রাখবার চেষ্টা করলেন। বোধ হয় বললাম এই কারণে যে, প্রায়সই মূল কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, তবু প্রকাশক যখন বলেন "খৃষ্টপূর্ব্ব কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত চীনা কবিতার স্বয়ংসম্পূর্ণ সংকলন ইতিপূর্বে বাংলায় হয়নি। বাংলা কবিতার পক্ষে এই শিক্ষণীয় সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করলেন দিলীপ দত্ত" তখন ধরে নিতেই হয় এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কবিরাই চীনের প্রতিনিধিস্থানীয়।

গ্রন্থটিতে মোট আটত্রিশটি কবিতার অনুবাদ আছে। তার মধ্যে অতি-প্রাচীনতার কারণে কয়েকজন কবির নাম অজ্ঞাত। অনুবাদকের ভাষার প্রসাদগুণের কারণে কবিতার স্বর উপলব্ধির কিছুমাত্র অসুবিধে পাঠকের হয় না। সত্যি বলতে গেলে দিলীপবাবু অনেক সময়ই আমাদের ভুলিয়ে দিতে পেরেছেন যে আমরা অনুবাদ পড়ছি। এই কৃতিত্বের জন্য দিলীপবাবু প্রতিটি বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। দু-একটি উদাহরণ দিই—

> চুংজু দোহাই তোমার
> বাড়ীতে ঢুকে আমাদের গোলাপ গাছগুলো
> নষ্ট কোরোনা।

গোলাপের কথা ভাবছি না,
কিন্তু মা-বাবাকে ডরাই,
তোমায় খুব ভালবাসি চুংজু,
কিন্তু মা-বাবা কি বলবেন।
সত্যি আমার বড্ড ভয় করে।

—লেখক অজ্ঞাত : খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক

অথবা

গ্রাম থেকে এলে
বল-না সেখানকার খবর!
যখন এলে, সাদা জানালার তলায়
কৃষ্ণকলি ফুটেছিল কী?

—ওয়েঙ্গ ওয়েই : অষ্টম শতক

এবং

ভয় পেওনা
উঠুক ঝড়
আসুক বৃষ্টি
তার পর
জগৎটা তো আমাদেরই।

—টিয়েন চিয়েন : আধুনিক

গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ সুরুচির পরিচায়ক।

সিদ্ধার্থ সেন

মনের আকাশ। সঞ্জয়। প্রকাশক দেবকুমার বসু। দুই টাকা।

পদক্ষেপ। অতীন্দ্র রায়চৌধুরী। প্রকাশক নীহারকণা রায়চৌধুরী। দুই টাকা।

রোম্যান্টিক কবিতা। উৎপল মিত্র। ভাগীরথী সাহিত্য সংসদ। এক টাকা।

জীবনের জয়গান। উমাপদ ঝা। প্রকাশক উমাপদ ঝা। দুই টাকা।

আমাদের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ-চারটির কবিরা প্রায় সকলেই সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। ইতিপূর্বে এঁদের কারও লেখা বিশেষ চোখে পড়েছে বলে মনে করতে পারছি নে। তাঁদের নিভৃত কাব্যসাধনাকে গ্রন্থাকারে পেয়ে একদিকে যেমন নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে খুশী হয়েছি, অন্যদিকে তাঁদের অনেকেরই আধুনিক বাংলা কবিতার বহমান ধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখে তেমনি ব্যথিতও হয়েছি। 'মনের আকাশ এর লেখক সঞ্জয় যখন লেখেন—

কতজন আসে যায় পৃথিবীর এই ধূলি মাটিতে
শ্বাস লয় জরা গন্ধ পুরাতন রুগ্ন হাওয়াতে
রেখে যায় আরো ক্লিন্ন পীড়াময় বিষাক্ত বাতাস
তার সন্তানসন্ততি তরে।

তখন সেই আবহাওয়ায় পাঠকের শুধু নিশ্বাস নিতেই কষ্ট হয় না, কবিতার অতিব্যবহৃত 'তরে' 'লয়ে' শব্দসম্ভারে রীতিমত পীড়িত হতে হয়। অথচ কবি আন্তরিক, রচনাও বক্তব্যহীন নয়। দুঃখ এই যে, যতখানি প্রাণরস ও বোধিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলে পদ্য কবিতা হয়ে ওঠে, সঞ্জয় অনেক ক্ষেত্রেই তার সীমারেখা ছাড়াতে পারেনি।

'পদক্ষেপে'র কবি অতীন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর কাব্যগ্রন্থটির আগে তাঁর নিজের কবিতা এবং কবিতা কি, সেই সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করে পাঠককে তাঁর মানসিকতা বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থে যদি তা স্পষ্ট না হয়ে থাকে তবে সামনের সেই চার পাতা গদ্যরচনায় কি তা স্পষ্ট হবে? অথচ বিস্ময় এই যে, কাব্যগ্রন্থটির কবির মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল। তাঁর ভাষা পরিশীলিত, দেখবার চোখও তাঁর আছে। কয়েকটি সার্থক কবিতাও তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু 'নিরীশ্বরে বৈদগ্ধ্য বিলাসী' হয়ে তিনি তাঁর সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন। যখন তিনি লেখেন—

শতেক রাধার বিরহ ধ্বংসস্তূপের 'পরে
ফোটাবে হাজার যুগের ব্যথায় গোলাপ ফুল;

মরণের সাজি সেই ফুলে উঠে যদিও ভরে,
নীলাক্ষি, আজি বুঝেছি মৃত্যু বিরাট ভুল।

তখন তাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু তাঁকেই যখন 'নির্জনের নীড়' কবিতায় জীবনানন্দের অক্ষম অনুসরণ করতে দেখি তখন দুঃখ হয়। কাব্যগ্রন্থটির কয়েকটি কবিতা তিনি গ্রামীণ ভাষায় রচনা করেছেন যা শুধু শ্রুতিকটুই নয়, গ্রন্থটির মূল সুরের অনুধাবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

উৎপল মিত্র বয়সে তরুণ। তাঁর সেই তারুণ্য 'রোম্যাণ্টিক কবিতা'র সর্বত্র প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে আছে। লেখকের একটি যথার্থ কবিমন আছে। কিন্তু সেই মনকে যদি আরও মার্জিত করে প্রকাশ করতেন তা হলে খুশি হতাম। তিনি যখন লেখেন—

তুমি শুধু চলে গেছো বলে
তোমার স্মৃতি আমার হৃদয়-আকাশে
বেদনা হয়ে ভেঙে পড়ে।

তখন ভালো লাগে ; কিন্তু এটুকু পরে যখন সেই একই কবিতায় লেখেন—

তোমার ছবিটি কাঁপে আমার নিঃশ্বাসে
হ্যাংগিং ব্রিজের মতো।

তখন বিরক্তিকর উপমার আকস্মিকতায় মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কবি আর-একটু সংযত ও উপমা-ব্যবহারে তার-একটু যথার্থ হলে তাঁর রচনা আমাদের আনন্দের কারণ হত। সেটা বয়সের শুশ্রূষাসাপেক্ষ। কবির সেই ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের আগ্রহ রইল। বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদে বিশেষ অমনোযোগ লক্ষ্য করা গেল।

উমাপদ ঝা প্রাচীন ঐতিহ্যের কবি। বিবাহ, মহাপ্রলয়, নবসংস্কৃতি, রাজমিস্ত্রী, ইত্যাকার নানা বিষয়ে তিনি পদ্যরচনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর 'জীবনের জয়গানে' কোনো বিশেষ সুর বা বক্তব্য সম্ভবত ইচ্ছে করেই রাখেননি। বক্তব্য উপস্থাপনে তিনি তাই কোনো কলাকৌশল বা আঙ্গিকগত পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রায় একই আঙ্গিকের আশ্রয়ে তিনি গ্রন্থটির প্রায় কবিতাগুলি রচনা করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাঠে আমরা উৎসাহিত হতে পারিনি। গ্রন্থটির আয়তন অনুসারে মূল্য বেশি মনে হল।

প্রতুল চৌধুরী

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অতুলচন্দ্র গুপ্ত পরিণতবয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন।

অতুলচন্দ্র গুপ্তের পরলোকগমনে বঙ্গসমাজের যে স্থান শূন্য হল তা পূরণ হওয়া শক্ত। সহসা এমন-একটি আসন কেউ লাভ করেন না। অতুলচন্দ্র তাঁর দীর্ঘজীবনের শ্রম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দ্বারা এই আসন অর্জন করেছিলেন। এ আসন অভিভাবকের আসন। দল মত ইত্যাদি বিষয়ে সমাজে যেমন পার্থক্য আছে, সাহিত্যেও আছে। এ জিনিস স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি বিশেষ একটি দলের বা বিশেষ একটি মতের প্রতিনিধিত্ব কখনো করেন নি, কখনো এমন-কারও মুখপাত্রও তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সকলের। এই জন্যেই তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়। একটি পরিবারের অভিভাবকের স্থান যেমন, বঙ্গসমাজে তাঁর স্থান ছিল তেমনি।

ধ্রুপদীর এক বছর পূর্ণ হল। পত্রিকাটি প্রকাশ আরম্ভ হলে অনেকে আমাদের নিরুৎসাহ করেছিলেন, কবিতার মাসিক পত্রিকা চালানো যাবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সেসব কথায় আমরা বিচলিত হই নি এমন কথা বলব না, কোনো কোনো সময়ে উৎসাহ দমে যায় নি— এমন দাবিও আমাদের নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটা বছর পার হল। এর জন্যে কৃতিত্ব কারও একার নয়— সমবেত ভাবে আমাদের সকলের। যাঁরা এর সঙ্গে নানা ভাবে সহ-যোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে এজন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই একটি বছরের মধ্যে অনেকগুলি দুঃখের সংবাদ জানাতে হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় যেমন অতুলচন্দ্রের কথা বলা হল, পূর্বের কয়েকটি সংখ্যায় তেমনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী রাজশেখর বসুর কথা জানাতে হয়েছে। ধ্রুপদীর জীবনের একটি বছরকে এই জন্যে আমরা দুঃখের বছরও বলব। কিন্তু, সেই সঙ্গে এ কথাও ভাবব যে, এঁদের সকলেই বিভিন্ন দিকের ছিলেন পথপ্রদর্শক ; আমরা যদি তাঁদের জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করে অগ্রসর হতে পারি তা হলে সেটি হবে আনন্দের কথা।

কেউ কেউ বলেন, কবিতা পড়ার রেওয়াজ উঠে গিয়েছে। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে সে জন্যে পাঠকেরা দায়ী নন। তাঁরা পাঠের উপযোগী কবিতা পেলেও তা পাঠ করবেন না এমন শপথ তাঁরা করেন নি। তাঁদের যদি তেমন কবিতার জোগান আমরা দিতে না পারি তা হলে সে দোষ আমাদের। ধ্রুপদীর ইচ্ছা— ক্রমশ ধ্রুপদী কবিতা-পাঠের উৎসাহ যেন সঞ্চার করতে পারে। এই ইচ্ছাপূরণের জন্যে ধ্রুপদী বর্তমানকালের কবিদের সহযোগিতা পাবে— এ বিশ্বাস তার আছে। এ বিশ্বাস সহসা তার আসে নি, তার এক-বছরের জীবনের ছোট অভিজ্ঞতা থেকেই এই বৃহৎ বিশ্বাস সে অর্জন করতে পেরেছে। ধ্রুপদীর নিজের লাভ এইটুকুই।

সুশীল রায়